# কাব্য-মালঞ্চ

# কাব্য-মালঞ্চ

আবদুল কাদির
ও
রেজাউল করীম
সম্পাদিত

নূর লাইব্রেরী
১২।১, সারেঙ্গ লেন, কলিকাতা

# বাঙ্গালা সাহিত্য ও মুসলমান

বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে বাঙ্গালী মুসলমানের দানের পরিমাণ নিতান্ত তুচ্ছ নয়। আজিকার যুগের বাঙ্গালী মুসলমান তাহার পূর্ব্বপুরুষগণের যে সকল কীর্ত্তিকলাপের জন্য গর্ব্ব অনুভব করে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্য তাহাদের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান। এদেশে মুসলিম প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠিত হইবার কিছুদিন পরেই বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি মুসলিম শাসকগণের দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছিল। তাঁহারা নানাভাবে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন। বহু কবি, লেখক ও শিল্পী অকৃত্রিম ভাবে বাঙ্গালা ভাষার সেবা করিয়া তাহার বহু নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের অমর অবদানের কিছু কিছু নিদর্শন আজিও লুপ্ত হয় নাই। প্রাচীন পুথি ও স্মৃতিরক্ষার কোনও রূপ বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অবলম্বন করা হয় নাই বলিয়া মুসলিম কবিদের নিদর্শনসমূহ বহুলাংশে নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সেগুলি উদ্ধারের আশা অতি অল্প। তবুও সমস্ত নিদর্শন একেবারে নষ্ট হয় নাই। এ বিষয়ে আমাদের প্রত্নতত্ত্ববিদগণের একটা দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে। তাঁহারা চেষ্টা করিলে অনেক লুপ্ত সম্পদ জগতের আলোক দেখিতে পাইবে। এই সম্পর্কে পরম শ্রদ্ধেয় মুনশী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ সাহেবের অপরিসীম সাধনা ও পরিশ্রমের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বস্তুতঃ প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মুসলমানের বিপুল অবদানের সম্যক্ পরিচয় পাইতে হইলে তাঁহার আশ্রয় গ্রহণ ব্যতীত উপায়ন্তর নাই। এ সত্য সর্ব্বজন স্বীকৃত।

অধুনা বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যের কয়েকটি প্রামাণিক গ্রন্থ লিখিত হইয়াছে ; যথা ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেনের 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য', ডাঃ সুকুমার সেন প্রণীত 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস'। তদ্ব্যতীত অনেক লেখক প্রাচীন পুঁথি সংগ্রহ করিয়া এবং সেগুলিকে পুস্তকাকারে প্রকাশিত

করিয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসের এক গৌরবময় যুগ আবিষ্কার করিয়াছেন। কিন্তু কেবলমাত্র মুসলিম কবিগণের প্রতিনিধিমূলক কবিতার নিদর্শন সম্বলিত কোন সংগ্রহপুস্তক এতাবৎ প্রকাশিত হয় নাই। সমগ্র পুঁথি সাহিত্য এক বিরাট ব্যাপার। ব্যাপক ভাবে তাঁহা পাঠ করিবার আগ্রহ ও সময় অনেকের হয়ত হইবে না। কিন্তু কিছু কিছু কবিতা পাঠ করা প্রত্যেক সাহিত্যামোদীর কর্ত্তব্য। সেই প্রাচীন যুগ হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত যে সমস্ত কবি ও শিল্পী আবির্ভূত হইয়া বাঙ্গালা সাহিত্যের সেবা করিয়াছেন, তাঁহাদের কতক-গুলি সুনির্ব্বাচিত কবিতার একত্র সমষ্টিমূলক একখানা সঞ্চয়ন-গ্রন্থের অভাব অনেকেই অনুভব করিতেছিলেন। সেই অভাব মোচনের উদ্দেশ্যে এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল। বন্ধুবর আবদুল কাদির সাহেব বাঙ্গালা সাহিত্য বিশেষ করিয়া প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্য রাখেন। তাঁহার সাহায্য ব্যতীত এই কষ্টসাধ্য গ্রন্থ হয়ত সঙ্কলিত হইত না।

আরবী, ফারসী ও উর্দ্দু সাহিত্যে এই ধরণের চয়নিকা গ্রন্থের অভাব নাই। "কেতাবুল আগানী" নামক বিরাট সংগ্রহ গ্রন্থখানি আরবী সাহিত্যের এক অমূল্য সম্পদ। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের খ্যাতনামা অধ্যাপক ডাক্তার মহম্মদ ইসহাক "সোখনরওয়ানে ইরান" নামে একখানি ফারসী কবিতার সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন। উর্দ্দু ভাষায়ও এই ধরণের কয়েকটি গ্রন্থ আছে। কিন্তু বাঙ্গালী মুসল-মান কবিগণের রচিত কবিতাবলীর কোন সংগ্রহপুস্তক এ পর্য্যন্ত প্রকাশিত হয় নাই। তাই আমরা আজ বাঙ্গালী সাহিত্য-সেবীদিগকে এই গ্রন্থখানি উপহার দিলাম। এই গ্রন্থে উল্লিখিত কবিগণের পরিচয় বন্ধুবর আবদুল কাদির সাহেব পূর্ব্বেই দিয়াছেন।

কীট্‌স্ বলিয়াছেন, "A thing of beauty is a joy for ever"—যাহা সুন্দর তাহা চির আনন্দের আধার। কবি কীট্‌সের এই অমর বাণী যে কত সত্য তাহা আলোচ্য সঙ্কলনের কবিতাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে। সত্যকারের কবি সুন্দরের চির পূজারী। কবি যেখানে সুন্দরের সন্ধান পান, সেখান হইতে তাহা সযত্নে আহরণ

করেন। কবির জগৎ চির সুন্দরের জগৎ। তিনি সর্ব্বত্র দেখেন সুন্দরের লীলাময় বৈচিত্র্য। তিনি সর্ব্বক্ষণ সুন্দরকে লইয়া মাতিয়া থাকেন। এবং এই সুন্দরের অভিব্যক্তিই তাঁহার কাব্যের মধ্যে বিচিত্র ভাবে পরিস্ফুট হইয়া থাকে। এই সঙ্কলন গ্রন্থে প্রাচীন কালের ও বর্ত্তমান যুগের যে সকল কবির কাব্যাংশ প্রদত্ত হইয়াছে, তাঁহাদের কবিতায় সৌন্দর্য্যের সমাহার দেখিয়া পাঠকগণ মুগ্ধ হইবেন। কীটস্, শেলী, ওয়ার্ডস্-ওর্থের মতই তাঁহাদের সৌন্দর্য্য জ্ঞানের অপূর্ব্ব পরিচয় পাওয়া যাইবে।

সঙ্কলিত কবিতাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে যে, "শিল্পের জন্য শিল্প" এই নীতিকে মুসলমান কবিগণ বহুলাংশে মানিয়া চলিয়াছেন। এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-বোধ ও কাব্য-চেতনা তাঁহাদিগকে অহরহ প্রেরণা দিয়াছে। তাহারই প্রভাবে তাঁহারা প্রতি বিষয়টিকে নিখুঁত ভাবে বর্ণনা করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। আপনার আনন্দে পাগল হইয়া পাখী যেমন গান গাহে, ফুল যেমন ফুটে, নদী যেমন ছুটে, ঠিক তেমনি এই সঙ্কলনে এমন সব কবিতার সন্ধান পাওয়া যাইবে, যাহা আপনার আনন্দে, আপনার বেগে আপনি অতি স্বাভাবিক ভাবে প্রকাশিত হইয়াছে। কোথাও কৃত্রিমতা নাই, কষ্ট কল্পনা নাই, সহজ চলার ছন্দে কোন বাধা নাই। কবিতাগুলি যেন একটা স্বাভাবিক আবেগে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সৌন্দর্য্য ও প্রকাশ সামর্থ্যে বহু কবিতা বিশেষ ভাবে মাধুর্য্য মণ্ডিত হইয়া উঠিয়াছে। বহু কবিতার মধ্যে তত্ত্বালোচনাও আছে। সেগুলি আধ্যাত্মিক কবিতার পর্য্যায়ভুক্ত। শেখ মদন বাউলের কবিতাগুলির প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যাইবে, কত গভীর আধ্যাত্মিক তত্ত্ব ইহার মধ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। "তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই।" —মুক্তি-তত্ত্বের এমন নিগূঢ় বাণী কয় জন দিতে পারিয়াছেন?

প্রকৃতির চারিদিকে যে অপর্য্যাপ্ত সৌন্দর্য্য ছড়ান আছে, কবি তাহা অকৃপণ হস্তে গ্রহণ করিয়া কবিতার মালা গাঁথিয়াছেন। তাঁহাদের বর্ণিত এই সৌন্দর্য্য কোথাও কোথাও সীমা ছাড়িয়া অসীমে চলিয়া গিয়াছে। ইহা অনস্বীকার্য্য যে, ইন্দ্রিয়-পরতন্ত্রতা (Sensuousness) সৌন্দর্য্য পূজার অপরিহার্য্য অঙ্গ। কবির মনের উপর বাহ্য প্রকৃতির ছাপ থাকিবেই। কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-

পরতন্ত্রতার মধ্যেও একটা শালীনতার আবরণ দেখা যাইবে, যাহা কীট্‌স্‌ ও সুইনবার্ণের মধ্যে নাই বলিলেও চলে।

সঙ্কলনের কবিতাগুলি বাঙ্গালা দেশের মুসলিম সংস্কৃতির অমর অবদান স্বরূপ। মধ্য যুগ হইতে বর্ত্তমান যুগ পর্য্যন্ত মুসলিম কবিগণ কাব্যালোচনা দ্বারা বাঙ্গালা সাহিত্যে ও ভাষার উপর মুসলিম মানসিকতার যে একটা স্থায়ী ছাপ দিতে পারিয়াছেন, এই কবিতাগুলি তাহার উৎকৃষ্ট প্রমাণ। আমরা আশা করি, হিন্দু-মুস্‌লিম সংস্কৃতি সমন্বয়ের সাধকগণ মুসলিম কবি ও সাহিত্যিকগণের এই অমর অবদানের কথা অগ্রাহ্য করিবেন না। বরং এগুলিকে সমন্বয়ের প্রধান উপাদান রূপে গ্রহণ করিবেন।

ইহা অবিসম্বাদিতরূপে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাঙ্গালা ভাষা ও সাহিত্যে মুসলমানের দান অসামান্য। মধ্য যুগের মুসলমানগণ ভাবিতেই পারেন নাই যে, এদেশে বাস করিয়া আরব দেশের খোর্ম্মা-খেজুর, অথবা আফগানিস্থানের পেস্তা-বাদামের গান গাহিলে তবেই ইস্‌লাম বিশুদ্ধ ও অবিকৃত হইয়া থাকিবে। তাঁহারা এদেশের মাটির সহিত নিবিড় ভাবে সংযোগ স্থাপন করিয়াছিলেন; এবং এদেশের আদর্শ গ্রহণ করিয়া এদেশের ভাবে তন্ময় হইয়া এদেশের মাটির উপযোগী বিষয় এদেশের উপমা দিয়া এদেশের ভাষাতেই লিখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা আরবের মরুভূমি, ইরাণের দ্রাক্ষাকুঞ্জ, বাসরার গোলাপ বাগিচার কথা ভাবেন নাই। তাঁহারা বুলবুলের কণ্ঠ শুনেন নাই। এদেশের নদ-নদীর তীরে, এদেশের লতা-গুল্মের নীচে, এদেশের কোকিল, শ্যামা, ফিঙ্গে, দোয়েলের গান শুনিয়াছেন। এবং তাহাদেরকে লইয়া কবিতা লিখিয়াছেন। তাঁহারা সোহরাব-রুস্তম, জামসেদ, আফ্‌রাসিয়াব, দরায়ুস, কায়খোস্‌রু, লায়লী-মজনু, শিরি ফরহাদের গল্প অপেক্ষা এদেশের রাম-লক্ষ্মণ, সীতা-দ্রৌপদী, রাধা-কৃষ্ণের কাহিনীই বেশী জানিতেন। সুতরাং তাঁহারা কাব্যের রসদ এই সব কাহিনী হইতেই অধিক সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাই রাধা-কৃষ্ণের প্রেমলীলার মধ্যবর্ত্তিতায় তাঁহারা ইস্‌লামী আধ্যাত্মিকতা প্রচার করিয়া প্রচুর আনন্দ পাইতেন। এরূপ করিলে যে "কাফের" হইয়া যাইবেন, এ চিন্তা তাঁহাদের মনে জাগে নাই। সেই জন্য বঙ্গের

মুসলিম কবিগণ বৈষ্ণব-সঙ্গীতও অগ্রাহ্য করেন নাই। এই বৈষ্ণব-সঙ্গীতকে ইস্লামের জারক রসে জারিত করিয়া নূতন রূপ দিয়াছিলেন। ইস্লামী আদর্শের সহিত হিন্দুদের আদর্শের এমন সমন্বয়ের উদাহরণ অন্য কোথাও পাওয়া যায় না। এই পুস্তকে প্রাচীন যুগের মুসলিম কবিগণের যে সব কবিতা সন্নিবেশিত হইল, তাহার মধ্যে সমন্বয়ের আভাষ দেখিয়া পাঠকগণ স্তম্ভিত হইবেন। ইউরোপ খৃষ্টান ধর্ম্ম গ্রহণ করিলেও তথাকার কবি ও শিল্পীগণ প্যাগান যুগের ভাব, আদর্শ ও উপমা পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই। পিউরিট্যানগণ সাহিত্য হইতে প্যাগান ভাব দূর করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন; কিন্তু তাহা সফল হয় নাই। মধ্য যুগ ত কোন ছার, ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রখ্যাতনামা কবি (যেমন শেলী, কীটস, স্কট) প্যাগান যুগের কবিতার মধ্যে একেবারে ডুবিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা প্যাগান যুগের কাহিনী হইতে যে রত্ন উদ্ধার করিলেন, তাহাকেই নিজেদের প্রতিভা বলে অপরূপ ভাবে প্রকাশ করিলেন। প্যাগান যুগকে বাদ দিলে তাঁহাদের মৌলিক সৌন্দর্য্য আদৌ থাকিত কিনা সন্দেহ।

বাঙ্গালা দেশের মুসলিম কবিগণ হিন্দুদের উপমা, রূপক কথা ও কাহিনীকে একেবারে বাদ দেন নাই। এজন্য আজ তাঁহাদিগকে নিন্দা করিলে চলিবে না। তাঁহারা আমাদের জন্য এমন সরস, সুমধুর ও প্রাণদায়িনী কবিতা রাখিয়া গিয়াছেন যাহার জন্য তাঁহারা আমাদের চির শ্রদ্ধার পাত্র হইয়া রহিবেন। আমরা আজ তাঁহাদের গৌরবে গৌরবান্বিত।

ইংরাজ যুগের প্রথম দিকে বাঙ্গালী মুসলমানগণ তত আগ্রহের সহিত বাঙ্গালা সাহিত্যালোচনা করেন নাই। কিন্তু সাময়িক জড়তা কাটিয়া গেলে আবার তাঁহারা সাহিত্য চর্চ্চায় মনোনিবেশ করিলেন; এবং নূতন নূতন সাহিত্য-সৃষ্টি করিতে উদযোগী হইলেন। নবাবী আমলে ব্যাপকভাবে মুসলমানগণ বাঙ্গালা সাহিত্যের চর্চ্চা করিতেন। আজ গবেষকগণের পরিশ্রমের ফলে সেগুলির আংশিক উদ্ধার হইয়াছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেন মুসলিম কবিগণের অমর অবদানের কথা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছেন। চণ্ডীদাস, বিদ্যাপতি, কৃত্তিবাস ও কাশীরাম

দাসের কথা আমরা বিশেষ ভাবে জানি। সেই যুগে মুসলমানদের মধ্যে এমন বহু কবি ও শিল্পী আবির্ভূত হইয়াছিলেন যাঁহারা সমান কৃতিত্বের সহিত বহুবিধ কবিতা লিখিয়াছিলেন। তাঁহারা বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, কৃত্তিবাস, কাশীরাম দাস প্রভৃতি হইতে কোন অংশে কম ছিলেন না। রস, কাব্যগ্রাহিতা, ভাব ও ছন্দ সার্থক যে কবিতার শ্রেষ্ঠ উপাদান তাহার নিদর্শন মুসলিম কবিগণের মধ্যে পাওয়া যাইবে।

বিরাট পুঁথি সাহিত্য বহুদিন অবধি অবহেলিত হইয়া পড়িয়াছিল। আশার কথা এক্ষণে এদিকে অনেক সাহিত্যামোদীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে। এই পুঁথি রত্নের খনি। ইহার মধ্যে বাজে বিষয় যে নাই তাহা বলি না। কিন্তু ডুবিতে জানিলে রত্নের সন্ধানও পাওয়া যাইবে। আধুনিক যুগে বহু মুসলমান কবি আবির্ভূত হইয়াছেন। তাঁহারা বিশেষ করিয়া কাজী নজরুল ইস্‌লাম সাহিত্য ক্ষেত্রে যে দান করিয়াছেন তাহা বাঙ্গালার গৌরব ও সমৃদ্ধি বৃদ্ধি করিয়াছে। এই গ্রন্থে বর্ত্তমান যুগের মুসলিম কবিদেরও প্রতিনিধিমূলক কবিতা সংগৃহীত হইল। পরিশেষে নিবেদন এই যে, এই সংগ্রহের ব্যাপারে বন্ধুবর আবদুল কাদির সাহেব কষ্ট স্বীকার না করিলে এই গ্রন্থ হয়ত পৃথিবীর আলোক দেখিতে পাইত না। এজন্য তিনি সকলের ধন্যবাদের পাত্র।

রেজাউল করীম

# সুচীপত্র

| লেখক | বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|
| ৭৫। দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী | | ... | |
| | স্বপন | | ১৩৪ |
| | পল্লীশ্রী | ... | ১৩৫ |
| ৭৬। জসীমউদ্দীন | | | |
| | রূপাই | ... | ১৩৬ |
| | গ্রামের দাঙ্গা | ... | ১৩৭ |
| | রঙিলা নায়ের মাঝি | ... | ১৪০ |
| | গহিন্ গাঙের নাইয়া | ... | ১৪০ |
| ৭৭। সাজেদা খাতুন—তোমার দান | | ... | ১৪১ |
| ৭৮। বন্দে আলি মিয়া | | | |
| | মিলন | ... | ১৪২ |
| | কল্মিলতা | ... | ১৪২ |
| ৭৯। দিদারুল আলম—চির-চপল | | ... | ১৪৩ |
| ৮০। হুমায়ুন কবির | | | |
| | অযোধ্যা | ... | ১৪৫ |
| | যাত্রা | ... | ১৪৫ |
| ৮১। সৈয়দ মোতাহের হোসেন চৌধুরী | | | |
| | কবি | ... | ১৪৮ |
| | উতলা রজনী | ... | ১৪৮ |
| ৮২। কাজী কাদের নওয়াজ | | | |
| | মাজার্-ই-সিরাজদ্দৌলা | ... | ১৪৯ |
| ৮৩। আবদুল কাদির | | | |
| | সনেট | ... | ১৫১ |
| | কোনো মেয়ের প্রতি | ... | ১৫২ |
| ৮৪। রেজাউল করীম—কুল্কাঠি-স্মরণে | | ... | ১৫৫ |
| ৮৫। মাহ্মুদা খাতুন সিদ্দিকা—আমরা | | ... | ১৫৬ |
| ৮৬। মহীউদ্দীন | | | |
| | কালের জোয়ার | ... | ১৫৭ |
| | আড়িয়ল বিল | | ১৫৮ |

| লেখক | বিষয় | | পৃষ্ঠা |
|---|---|---|---|

# বাঙলা কাব্যের ইতিহাস

## মুসলিম সাধনার ধারা

[ আবদুল কাদির ]

একাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রামাঞ পণ্ডিতের আবির্ভাব বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। বাঙলায় তখন বৌদ্ধধর্ম্মের নানা নূতন ব্যাখ্যা হইতেছে। রামাঞের শিষ্য ও উপশিষ্যগণ বিভিন্নভাবে সদ্ধর্ম্মের প্রচার করিতেছেন। ব্রাহ্মণ্যবাদের সহিত বৌদ্ধধর্ম্মের একটা সমঞ্জসীকরণের চেষ্টা রামাঞ পণ্ডিত করিলেন বটে; কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধনির্য্যাতনের মাত্রা কিছুমাত্র হ্রাস পাইল না। পুনরুত্থিত ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের রূঢ় দীপ্তির সম্মুখে বৌদ্ধরা কোনো প্রকারে অস্তিত্ব রক্ষা করিতে গিয়া একেবারে দিশেহারা হইয়া গেল। ঠিক এমনি সময়ে খ্রীষ্টীয় ১২০৩ অব্দে মোহাম্মদ-বিন্-বখ্‌তিয়ার খিলিজী বঙ্গদেশ অধিকার করিলেন। উদ্যত শাসন-দণ্ড হাতে তুর্কী মুসলমানের আগমনে ব্রাহ্মণের হিংসাপরায়ণতা একটু প্রশমিত হইবে ভাবিয়া অর্দ্ধমৃত বৌদ্ধের দল কিছুটা আশ্বস্ত হইল।

অবশ্য তুর্কী-বিজয়ের বহু পূর্ব্ব হইতেই বৈদেশিক মুসলমানেরা বাঙ্গালায় আসিয়া বসবাস করিতেছিলেন। তৎকালে যে সমস্ত 'মুর্শীদ' ও 'আউলিয়া' ধর্ম্ম-প্রচারের উদ্দেশ্যে এদেশে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ছিলেন সুফী-মতাবলম্বী। কাহারও কাহারও মতে, সুফীবাদের উৎপত্তিতে ভারতীয় দর্শন ও বেদান্ত অনেকখানি ক্রিয়া করিয়াছে। সেমিটিক আরবের আচারনিষ্ঠার বিরুদ্ধে পারস্যের আর্য্য-মনের প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ হয় 'প্রকৃত' সুফী-মতের উদ্ভব। ভারতবর্ষের "সর্ব্বংখল্বিদংব্রহ্ম"— এই মতবাদ বহু সুফীর জীবনে দিয়াছে আশ্চর্য্য প্রেরণা। সুফীতত্ত্বের মূলকথা হইতেছে নিঃস্বার্থ আত্মদান,—অর্থাৎ প্রেম। পৃথিবীর প্রায় সমস্ত মরমীয়ার ( mystic ) মতন সুফীও তাই প্রেমধর্ম্মী। অবশ্য যে-সমস্ত 'ফকীর' ও 'দরবেশ' এদেশে ইস্‌লাম প্রচার করিয়াছিলেন

তাঁহাদিগকে 'প্রেমযোগী' বলাই অধিকতর বাঞ্ছনীয়। তৎকালে বাঙ্গলার জনসাধারণের মধ্যে যে আচার-অনুষ্ঠান প্রচলিত ছিল, তাহাতে গুহ্য-তত্ত্বের নব্য-বাহক 'মারফৎ'-পন্থীর আবেদন উপেক্ষিত না হওয়াই স্বাভাবিক। সদ্ধর্ম্মী, সহজিয়া ও নাথপন্থীরাই তখন বঙ্গ-সমাজের বিপুল অংশ; তাহাদের মত-বিশ্বাস ও ধর্ম্মসাধন-প্রণালীর সহিত 'পীর'-পন্থীর পার্থক্য খুব বেশী ছিল না। বৌদ্ধের নির্ব্বাণবাদের সহিত সুফীর 'ফানাফিল্লাহ্‌র' সাদৃশ্য যথেষ্ট। সেইজন্য নাথযোগীর নিকট সুফীর 'তাসাউফ' যেমন হইয়াছে প্রশংসনীয়, তেমনই সদ্ধর্ম্মীর শূন্যবাদ বা মায়াবাদ করিয়াছে পীর-মুর্শীদদের মানস-জীবনে আশাতিরিক্ত প্রভাব বিস্তার।

বুদ্ধদেবের প্রধান শিষ্য ছিলেন শূদ্র-বংশীয় উপালি; তৎকালীন শূদ্র ও অন্ত্যজগণ উপালির বিনয়ধর্ম্ম প্রচারের ফলে দলে দলে বৌদ্ধমত গ্রহণ করিতে থাকে। বিকৃত-বৌদ্ধত্বের যুগে দেখা যায় যে, সেই শূদ্র ও অন্ত্যজের আরাধ্য দেবদেবীগণ বুদ্ধ বা ধর্ম্মের বেশ পরিয়া মঠে ও মন্দিরে পূজিত হইতেছেন। প্রথম যুগে যে ভক্তিমার্গ ছিল জ্ঞানপন্থী বৌদ্ধদিগের নিকট পরিত্যাজ্য, কালক্রমে সেই ভক্তিরই আবর্ত্তে পড়িয়া বৌদ্ধগণ হইল দেবোপাসক। সেজন্যই শেষ যুগে শঙ্করাচার্য্য-শিষ্যরা বৌদ্ধমন্দিরসমূহে বৌদ্ধমূর্ত্তির পরিবর্ত্তে অনায়াসে হিন্দু দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি স্থাপন করিতে সমর্থ হইলেন। অনার্য্যদের হাতে পড়িয়া এদেশে বৌদ্ধধর্ম্মের সমাধি এইরূপে রচিত হইল। নিম্নশ্রেণীর অন্ধভক্তি ও অলৌকিকতা-প্রীতি অস্বাভাবিকরূপে উগ্র বলিয়াই রামাঞি পণ্ডিতের সমসময়ে বৌদ্ধমতের নামে নানা উদ্ভট ধর্ম্মমার্গের উদ্ভব সম্ভব হইয়াছিল; এদেশের বহু-যত্ন-লালিত নানা কুসংস্কারের সঙ্গে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া সহজযান, মহাযান, হীনযান, বজ্রযান, মন্ত্রযান প্রভৃতি বিভিন্ন মার্গের মহিমা সপ্রমাণিত হইয়াছিল। রামাঞির 'শূণ্যপুরাণে' ধর্ম্মপূজাপদ্ধতি প্রচারিত হইল বটে; কিন্তু তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের পতন-পথ অপ্রশস্ত হইল না। তৎকালীন বাঙ্গালী মুসলমানদিগের জাগতিক ও আধ্যাত্মিক জীবনে এই ধর্ম্মপূজার প্রত্যক্ষ প্রভাব কতখানি সম্ভব হইয়াছিল, তাহার সাক্ষাৎ পরিচয় সাহিত্যে পাওয়া যায় না। তবে বৌদ্ধভাবাপন্ন নাথধর্ম্মের

সরাসরি রেখাপাত যে তাহাদের জীবনে বহুদিন অবশিষ্ট ছিল, ইহা প্রমাণের অপেক্ষা করে না। সেকালের শ্রাবকদিগের ন্যায় একাদশ শতাব্দীতে গ্রাম্য গায়েনরা নাথ-যতিগণের গৌরব-গাথা গাহিয়া বেড়াইত,—নাথগীতিকাগুলি তাহারই প্রকৃষ্ট নিদর্শন। পঞ্চদশ শতকের শেখ ফয়জুল্লাহ্ এবং ঊনবিংশ শতকের আবদুস্ শুকুর মাহ্মুদ এই নাথ-মহান্তগণেরই মাহাত্ম্য প্রচারক।

কাহারও কাহারও মতে, বর্ত্তমান হিন্দু সম্প্রদায়ের অন্তর্গত নাথ-গোত্রের লোকেরাই গোড়ায় নাথপন্থী ছিল,—ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের পুনরুত্থানের হট্টগোলে তাহারা হিন্দুসমাজে প্রবেশ লাভ করিয়াছে। এই নাথদিগকে যে কিছুকাল পূর্ব্বেও মৃত্যুর পর কবরস্থ করা হইত, ইহা দৃষ্টিমান মাত্রেই জানেন। অন্যপক্ষে, যে-সমস্ত নাথপন্থী ইস্লাম গ্রহণ করিয়াছিল, তাহারাই ভারতের বিরাট 'জোলা'-সম্প্রদায় গঠন করিয়াছে কিনা, তাহা অনুসন্ধান করা যাইতে পারে। হিন্দু 'যুগী' ও মুসলমান 'জোলা' বা তাঁতীদিগের জীবনযাত্রা-প্রণালী ও আচার-বিশ্বাস যাচাই করিলে এ-বিষয়ে বিস্তৃত তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে। যাহা হউক, এরূপ বিরাট্ একটা ধর্ম্মসম্প্রদায় আজ নিশ্চিহ্নপ্রায় হইয়া গেলেও তাহাদের ঐতিহ্যধারা একেবারে বিলুপ্ত হয় নাই। আজও বাঙ্গলায় গো-রক্ষাকারী গোরক্ষনাথের কথা স্মরণ করা হইয়া থাকে, এবং পশ্চিম-ভারতে গোরক্ষ-নাথের আখড়ায় মেলা-মানৎ চলে। বলা বাহুল্য যে, এই গোরক্ষনাথ জলন্ধরীর অলৌকিক যোগবল ও দেবদুর্লভ অনাসক্তির কাহিনীই কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন বাঙ্গলা সাহিত্যের মুসলমান আদিকবি শেখ ফয়জুল্লাহ্।

ফয়জুল্লাহ্ তাঁহার জন্মস্থান ও জীবিতকাল সম্বন্ধে নিজে কিছুই বলিয়া যান নাই। তাঁহার রচনারীতি ও বাক্‌বিন্যাস দেখিয়া তাঁহাকে পঞ্চদশ শতকের লোক বলিয়া অনেকে অনুমান করিয়া থাকেন। তাঁহার ভাষাভঙ্গী হইতে ইহাও অনুমিত হয় যে, তিনি ত্রিপুরা জেলায় জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

(১) প্রথমে আছিলা প্রভু না চিনি আপনা।
জে জন আছিল সঙ্গে, সে কৈল চেতনা॥

চৈতন্য পাইয়া দেখে আপন আকার।
আকার দেখিয়া তান্ 'জর্ম্মিল' বিকার ॥

(২) কাঞ্চুলি খসাইমু তোর খসাইমু কবরী
মীনের 'পুরীত্' আসি' জাইতে চাহ ফিরি ॥

(৩) 'জির্ভাত' কামড় দিয়া মাথা কৈল হেট।
না জানিয়া কৈলাম পাপ-বচন প্রকট ॥

(৪) হিয়া লড়খড় হৈল, বগুলার পাখী।
হাট্টর 'পানিত্' হৈল ঘোল-বর্ণ আঁখি ॥

(৫) 'আজিগা' না বুঝি ভাও, মৃদঙ্গে বিপরীত রাও,
নাটুয়া আসিছে কোন্ জন।

উপরোক্ত "জর্ম্মিল", "পুরীত্", "জির্ভাত", "পানিত্", "আজিগা" প্রভৃতি পদ ত্রিপুরা-অঞ্চলেই অত্যধিক ব্যবহৃত হইয়া থাকে। এ-ধরণের বহু প্রাদেশিক শব্দের প্রয়োগ দেখিয়া সন্দেহ হয় যে, পাটিকারার নিকটস্থ কোনো স্থানে কবি আবির্ভূত হইয়াছিলেন।

নাথগুরুগণের পুণ্য উপাখ্যান একাদশ শতাব্দী হইতেই সারা ভারতবর্ষে প্রচারলাভ করে। কবীন্দ্র দাসের নিকট হইতে সেই কালজয়ী কাহিনী শ্রবণ করিয়া ফয়জুল্লাহ্ তাহা "কাব্যে পরিণত" করেন। 'গোরক্ষ-বিজয়ে' আছে—

কবীন্দ্র বচন শুনি' ফয়জুল্লাএ ভাবিয়া।
মীননাথ গুরুর চরিত্র বুঝাইয়া ॥

ফয়জুল্লাহ্র এই "গোরক্ষ-বিজয় মীন-চেতন" পুরাকালে পালা-গীতরূপে গাওয়া হইত। ভীমদাস, শ্যামাদাস সেন প্রমুখ গায়েনরা এই পালাগান গাহিতে গিয়া স্বভাবতঃ নিজেদের নামেও কোথাও কোথাও ভণিতা দিতেন, এবং কাব্যের ভাব-কল্পনা ও গঠনরূপ অবিকৃত রাখিয়া কথার অদল-বদল করিতেন। সেজন্যই একই পুঁথিতে একাধিক কবির ভনিতা ও ভাষাভেদ দৃষ্ট হয়। এই কাব্যের বিষয়বস্তুর সঙ্গে বাঙ্গালার অশিক্ষিত জনসমাজ এত বেশী পরিচিত ছিল যে, ইহার বহু চরণ আজও কৃষকদের কণ্ঠে কণ্ঠে বিরাজ করিতেছে।

(১) প্রদীপ নিবিলে বাপু, কি করিব তেলে।

কি কাজ বান্ধিলে আইল্, জল না থাকিলে ॥
শিকড় কাটিলে তবে উপাড়য়ে গাছ।
বিনি-জলে শুনেছ কোথাতে জিয়ে মাছ ॥

(২) পুষ্কর্ণীতে পাণি নাই, পাড় কেন ডুবে।
বাসা-ঘরে ডিম্ব নাই, ছাও কেন উবে ॥
নগরে মনুষ্য নাই, ঘরে ঘরে চাল।
জঙ্গলে দোকান দিছে, খরিদ করে কাল ॥

(৩) কোন্ নালে আসে প্রাণ, কোন্ নালে রয়।
কেমন সংযোগে আত্মা পরিচয় হয় ॥
কোন্ ক্ষণে করে মন আমলে গমন।
কোথায় বৈসয়ে পঞ্চ তন্ত্রের আসন ॥

ত্রিপুরা, শ্রীহট্ট, ময়মনসিংহ প্রভৃতি জেলার যে কোনো গ্রামের যে কোনো মুসলমান চাষীর মুখে এ-ধরণের পদ আজও শুনিতে পাওয়া যায়। সৃষ্টিপত্তন ও সাধনতত্ত্ব সম্বন্ধে এই কাব্যের প্রসঙ্গ আমাদের নিকট দুর্ব্বোধ্য মনে হইলেও জনসাধারণ ইহার রস আস্বাদনে কোনোদিন ক্লান্তি বোধ করে নাই

ফয়জুল্লাহ্র 'গোরক্ষ-বিজয়ে' জটিল সৃষ্টিতত্ত্ব যে-ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে তাহাতে রামাঞ পণ্ডিতের 'শূন্যপুরাণের' প্রচুর প্রভাব বিদ্যমান। শূন্যপুরাণে আছে: মহাশূন্য-মধ্যে প্রভু একা ছিলেন; সেইখানে—'আপনি সৃজিল প্রভু আপনার কায়া'; সেই কায়া হইতে নিরঞ্জন জন্মিলেন; নিরঞ্জনের অর্দ্ধ-অঙ্গের ঘাম হইতে আদ্যাশক্তির জন্ম—আদ্যাশক্তির 'উদরে' ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর জন্মলাভ করিলেন। আর 'গোরক্ষ-বিজয়ে' আছে—

হুঙ্কারে জন্মিল ব্রহ্মা, বিষ্ণু হৈল মুখে।
আপনা আকার তবে রাখিলা সম্মুখে ॥
আদ্য অনাদ্য রূপে কৈলা নিরীক্ষণ।
ভাবের অনলে মর্ম্ম ঘর্ম্মিত তখন ॥
সেই ঘর্ম্মে পরমাত্মা হই' গেল যত।
সেই ঘর্ম্মে জনমিল মহামন্ত্র কত ॥

ভবানীদাসের 'ময়নামতির পুঁথি', ডাঃ গ্রিয়ার্সন্ প্রকাশিত 'মাণিকচন্দ্র রাজার গান', দুর্লভ মল্লিকের 'গোবিন্দচন্দ্রের গীত', আবদুস্ শুকুর মামুদের 'গোপীচান্দের সন্ন্যাস', শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র 'গোরক্ষ-বিজয়', শ্যামাদাস সেনের 'মীনচেতন' প্রভৃতি গাথা একই ধারাবাহিক কাহিনীর বিভিন্ন অংশ অবলম্বনে বিরচিত। ত্রিপুরা জেলার লালমাই পাহাড়ের একটি অংশের নাম ময়নামতী; রাজা মাণিকচন্দ্রের পত্নীর নামে উহার নামকরণ হইয়াছে। অদুনা-মুড়া ও পদুনা-মুড়া রাজা গোবিন্দচন্দ্রের স্ত্রী অদুনা ও পদুনার স্মৃতি বহন করিতেছে। ফয়জুল্লাহ্ নাথগুরু গোরক্ষনাথের অপরাজেয় চরিত্রশক্তির প্রশংসা পঞ্চমুখে প্রচার করিয়াছেন। আর রাজশাহীর কবি আবদুস্ শুকুর রাজা মাণিকচন্দ্রের পুত্র গোপীচান্দের ( গোবিন্দচন্দ্রের ) বিষয়-বৈরাগ্য ও যোগীবৃত্তির মহিমা উচ্চকণ্ঠে কীর্ত্তন করিয়াছেন। এই উভয় কবি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও নাথগুরু বা নাথ-রাজার মাহাত্ম্য প্রচারে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করেন নাই। মানব-মাহাত্ম্যের প্রতি এই অকুণ্ঠিত শ্রদ্ধাই ছিল তাঁহাদের কাব্যের উপজীব্য। ধ্যানধর্ম্মপরায়ণতা, ইন্দ্রিয়-সুখপরিহার এবং গুরুপদে সর্ব্বস্ব সমর্পণ, এই-ই ছিল সে-যুগের দুষ্কর জীবনাদর্শ। এবং সেকালের প্রায় সকল কাব্যেই এই প্রাণপ্রদ আদর্শ প্রচারিত হইয়াছে। সিদ্ধা হাড়িফা রাজা গোবিন্দচন্দ্রকে বলিতেছেন—

শোন বাছা গোপীচন্দ্র যোগের কাহিনী।
বাইল্-শুদ্ধ হইলে নৌকা না ছোঁয় সে পানি ॥
কাণ্ডারী থাকিতে কেন যাও অন্য বাটে।
বাহিয়া লাগাও নৌকা নিরঞ্জনের ঘাটে ॥
নিরঞ্জন-বদলে বাছা গুরু পরমানি।
গুরুকে চিনিলে বাছা নিরঞ্জনে চিনি।
সর্ব্বদেব হৈতে বাছা গুরুদেব বড়।
গুরু ভজ, জ্ঞান শিখ, মায়াজাল ছাড় ॥

—গোপীচান্দের সন্ন্যাস।

বলা অনাবশ্যক যে, এই অবিচলিত গুরুভক্তি ( পীর-পূজা ) অদ্যাবধি মুসলমান সমাজে সুপ্রচলিত।

এই কাব্যের ভাষা মাঝে মাঝে অত্যন্ত মর্ম্মস্পর্শী। সন্ন্যাস গ্রহণের প্রাকালে রাজা গোপীচন্দ্র তাঁহার রাণিদিগকে বলিতেছেন—

রাজা বলে, শুন রে অভাগী নারীজন।
নিশির স্বপন যেন নারীর যৌবন॥
আষাঢ়ে গর্জ্জয় গঙ্গা উথলে সাগর।
চৈত্র মাসেতে গঙ্গা দেয় বালুচর॥
ধন যৌবন যত জোয়ারের পানি।
আসিবার কালে দেখি, জাইতে না জানি॥
তুমিও জানিও রাণী, নারীর যৌবন।
রজনী-প্রভাতে মিথ্যা নিশির স্বপন॥

শেখ ফয়জুল্লাহ্‌র মতন আবদুস শুকুরের কাব্যেও আল্লাহ্-রসুলের কোনো 'বন্দনা' নাই। আবদুস শুকুরের গ্রন্থারম্ভে আছে—

প্রথমে বন্দিলুঁ সিদ্ধা ধর্ম্ম-নিরঞ্জন।
যাহা হৈতে হৈল যোগ পৃথিবী সৃজন॥

চৈতন্যদেবের জন্মের ( ১৪৮৬ খৃষ্টাব্দের ১৮ই ফেব্রুয়ারি ) পূর্ব্বে শেখ ফয়জুল্লাহ্ আবির্ভূত হইয়াছিলেন, মনে করা যাইতে পারে। কিন্তু কবি আবদুস শুকুরের আবির্ভাবকাল নিঃসন্দেহরূপে চৈতন্য-যুগের পরে। তাঁহার কাব্যের একস্থানে আছে—

নদীয়া নন্দ-নগরে জগন্নাথ মুনির ঘরে
নিজ নামে চৈতন্য সন্ন্যাসী।

চৈতন্য প্রভুর প্রাসাদে বারাণসীতে বৌদ্ধধর্ম্মের শেষ রশ্মিটুকু নির্ব্বাপিত হয়; এবং তৎকালীন নাথ-যোগীরা সহজ-পথের সন্ধান করিতে গিয়া বৈষ্ণব ও বাউলের দলে ভিড়িয়া পড়ে। শ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতে আছে—"সব বৌদ্ধ মিলি' করে কৃষ্ণ-সংকীর্ত্তন।" (মধ্যলীলা, ২২৭ পৃঃ।) ইহার বহু পরে, উক্ত মুসলমান কবি দেশখ্যাত নাথ-গুরুদের অমর কাহিনী হইতে কাব্য রচনার প্রেরণা লাভ করিলেন। আবদুস শুকুর রামপুরবোয়ালিয়ার অন্তর্গত সিন্দুরকুসুমী গ্রামে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—

আবদুল শুকুর নাম পিতায় রাখিল।
সুকুর মামুদ নাম কুলেতে ঘোষিল ॥

—শাহ্ মোহাম্মদ খানের পুত্র আবদুল্লাহ্‌কে "বিজয়" কাব্য রচনার পথ-প্রদর্শক বলা যাইতে পারে।॥ সম্ভবতঃ তাঁহার সমসময়ে অথবা অত্যল্পকাল পরে, মালাধর বসু ভাগবত অবলম্বনে রচনা করেন "শ্রীকৃষ্ণ-বিজয়" (১৪৭৩-১৪৮০ খৃষ্টাব্দে) এবং হজরৎ মোহাম্মদের আজগুবি জীবন-কথা অবলম্বনে জঈনুদ্দীন রচনা করেন "রসুল-বিজয়"। গৌড়েশ্বর শামসুদ্দীন ইউসুফ শাহ্ (১৪৭৪—১৪৮১ খৃঃ) কর্তৃক নিয়োজিত হইয়া মালাধর বসু তাঁহার অমর কাব্য সঙ্কলন করিয়াছিলেন। আর কবি জঈনুদ্দীন বলিয়াছেন যে, 'রাজরত্ন' ইউসুফ খানের আদেশে তাঁহার "রসুল-বিজয়" বিরচিত হয়। জঈনুদ্দীনের ভণিতায় আছে—

দানে ধর্ম্মে হরিশ্চন্দ্র মান্য গুরু সম ইন্দ্র
রাজরত্ন মহিমা প্রধান।
শ্রীযুত ইউসুফ খান আরতি কারণ জান
রচিলুম পাঁচালী সন্ধান ॥

উপরোক্ত ইউসুফ শাহ্ ও ইউসুফ খান্ এক ব্যক্তি কি না, তাহা ঐতিহাসিকগণ নির্দ্ধারণ করিবেন। পাঠান নবাবগণের পৃষ্ঠপোষণে কোনো মুসলমান কবি কাব্যচর্চ্চায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন কি না, ইহা আজও আবিষ্কৃত হয় নাই। কবি জৈনুদ্দীনের ব্যক্তিপরিচয় পরিজ্ঞাত হইলে এই বিষয়ে কথঞ্চিৎ আলোকপাত হইবে। হুসেন শাহের সময়ে (১৪৯৩ খৃঃ—১৫১৮ খৃঃ) বাঙ্গালাদেশে পীর-পূজার প্রচলন বৃদ্ধি পাওয়া স্বাভাবিক। কবি জঈনুদ্দীনের জীবনেও এই পীরভক্তি কম প্রবল ছিল না। তিনি তদীয় পীর শাহ্ মোহাম্মদ খানের 'পাদপদ্ম' বন্দনা করিয়া 'রসুল-বিজয়' প্রণয়ন করেন—

'রসুল-বিজয়' বাণী অমৃতের ধার।
শুনি' গুণিগণ-মনে আনন্দ অপার ॥
শান্ত দান্ত গুণবন্ত ধৈর্য্যবন্ত হৃদি।
শাহা মোহাম্মদ খান্ সর্ব্বগুণনিধি ॥

তাঁর পাদপদ্ম বন্দি' ধ্যানে ধরি' সার।
হীন জৈনুদ্দীন কহে পাঁচালী পয়ার ॥

সারিবিদ খাঁর ভণিতাযুক্ত 'রসুল-বিজয়' পুস্তকের একখানি পাণ্ডুলিপি পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য ইহা স্বীকার্য্য যে, শেখ চান্দের 'রসুল-বিজয়' কাব্যই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। এ-সমস্ত 'বিজয়-কাব্যের পশ্চাৎভূমি ছিল বঙ্গদেশ। হজরৎ মোহাম্মদের ঐতিহাসিক জীবনবৃত্ত এ-সমস্ত কাব্যে অদ্ভুত বিকৃতি লাভ করিয়াছে।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে কবি শেখ চান্দ আবির্ভূত হন বলিয়া অনুমিত হইয়া থাকে। তিনি তদীয় পীর হজরৎ মৌলানা শাহ্‌দৌলার "চরণ ধ্যান" করিয়া মালাধর বসুর "শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের" ভঙ্গীতে "রসুল-বিজয়" রচনায় আত্মনিয়োগ করেন। তাঁহার কাব্যের ভাষা স্থানে স্থানে বেশ বলিষ্ঠ। হজরৎ মোহাম্মদের মাতা আমিনার রূপ বর্ণনাচ্ছলে তিনি একস্থলে বলিতেছেন—

মৃগরাজ-মধ্য জিনি' কটি অতি ক্ষীণি।
উরুযুগ সুললিত রামরম্ভা জিনি' ॥

কবি শেখ চান্দ ত্রিপুরা জেলার অন্তর্গত পাটিকারা পরগণায় কালাতিপাত করিয়াছিলেন। তিনি "শাহাতুল্লা পীরের পুস্তক" নামে একখানি আধ্যাত্মিক কাব্যও প্রণয়ন করিয়াছিলেন। সিদ্ধপুরুষ শাহদৌলা ছিলেন কবির গুরু। কবি লিখিয়াছেন—

পরগণে পাটিকারায় গোঞ্জা অত্র সাল।
তালিম তলপ শিষ্য পণ্ডিত বিশাল ॥
পীর-ফকিরের পায় তালিম হইয়া।
কহিতে লাগিল শিষ্য আকিদা পুরিয়া ॥
তোমার চরণে পীর বিকাইলাম আহ্মি।
ভব তরিবারে জ্ঞান মোরে দেও তোহ্মি।
তোহ্মি যদি আমা প্রতি না কৈলে আদর।
আখেরে আল্লার আগে কি দিমু উত্তর ॥

ত্রিপুরার স্বনামখ্যাত কবি সৈয়দ মোহাম্মদ আকবর আনুমানিক ১৬৭৩ খৃষ্টাব্দে "জেবলমুল্লক-শামারোখ" রচনা করেন; তিনিও না কি

"শাহ্ দৌলার পুঁথি" লিখিয়াছিলেন। কিন্তু এই শাহ্‌দৌলা কে ? মোদ্দা কথা, সেকালের প্রায় কবিই কোন-না-কোন পীরের 'মুরীদ' ছিলেন।

* * * *

মোহাম্মদ আকবরের শতবর্ষ পূর্ব্বে আবির্ভূত হন কবি দৌলৎ উজীর বাহরাম খান্। তিনি "লায়লি মজনুঁ" কাব্যে তদীয় পীর শাহ্ আসাউদ্দীনের প্রশংসা কীর্ত্তন করিয়া গিয়াছেন—

বঙ্গদেশ মনোহর তার মধ্যে শোভাকর
নগর ফতেয়াবাদ নাম।
আছাউদ্দীন পীর নির্ম্মল শরীর ধীর
তথাতে বসতি অনুপাম॥

কবি বাহরাম খান্ নিজের পরিচয়-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে, সুলতান হুসেন শাহের "প্রধান উজীর" হামিদ খান্ তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ ছিলেন; তিনি অতি-প্রাকৃত ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন; তাঁহার অত্যধিক দয়াদাক্ষিণ্য দেখিয়া সুলতানের "ক্রোধ হৈল", সুলতান তাঁহার ধর্ম্মতেজ পরীক্ষার জন্য—

প্রথমে বাঘের জালে ফেলিলা, দেখিলা ভালে
ব্যাঘ্র দেখি' নামাইলা মাথা।
দ্বিতীয়ে বান্ধিয়ে শিলা সাগরেতে পরীক্ষিলা,
নামাজ পড়িলা সুখে তথা॥
তৃতীয়ে বান্ধিয়ে রাগে দিলেন্ত হস্তীর আগে,
গজে দেখি' সালাম করিলা।
চতুর্থে জতুর ঘরে রাখিলা হামিদ খাঁরে,
অনলে দহিয়া পরীক্ষিলা॥
পঞ্চমে খড়্গের ঘাতে পরীক্ষিলা নরনাথে,
খড়্গ ভাঙ্গি' হৈল খান্ খান্।
ষষ্ঠে হানিয়া শর পরীক্ষিলা নৃপবর,
অঙ্গে না লাগিল এক বাণ॥—ইত্যাদি।

এ-ধরণের 'কেরামতি' পড়িয়া একালের পাঠক কৌতুক বোধ করিবেন, সন্দেহ নাই। কিন্তু বাহরাম খানের কাব্যে প্রকৃত কবিত্বের

নিদর্শনও বেশ আছে। তাঁহার "লায়লী-মজনুঁ" এক মধুর প্রেমকাব্য। প্রেমোন্মাদ মজনুঁ প্রেয়সী লায়লীর বিরহে একদা চন্দ্রকে উদ্দেশ করিয়া হৃদয়গ্রাহী ভাষায় বলিতেছেন—

বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ॥
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে একবার তাহার মরণ॥
বিরহী জনের মন সদায় সশঙ্ক।
তেকারণে রহিলেক শশাঙ্কে কলঙ্ক॥

সেকালে এরূপ বাক্‌কৌশল বাস্তবিকই শ্লাঘার বিষয়। মনে হয়, কবি বাহরাম খাঁই বৈদেশিক ভাবানুসরণে কাব্যানুশীলনের প্রথম পথ-প্রদর্শক।

কবি বাহরাম তাঁহার কাব্যের উপকরণ ফারসী-সাহিত্য হইতে কতখানি গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা বিচার্য্য। যাহা হউক, এই কাব্যখানিতে যে গ্রাম্যতা-বর্জ্জিত ভব্য-রুচির পরিচয় আছে, তাহা ষোড়শ শতকের বাংলা কাব্যে বিরল। কৃষ্ণরামের "রায়মঙ্গলে" আছে—"চাষা ভুলাইয়া সেই গীত হৈল ভাষা।" কিন্তু বাহরামের "লায়লি-মজনু" চাষা ভুলাইবার ভাষায় বিরচিত হয় নাই; ইহাকে শালীনতা ও সৌকর্য্যের দিক দিয়া সে-যুগের ব্যতিক্রম বলা যাইতে পারে।

পারস্যে প্রাচীনকাল হইতে 'লায়লি-মজনুঁ'র উপাখ্যান প্রচলিত রহিয়াছে। সেই কালজয়ী কাহিনী অবলম্বন করিয়াই বাহরাম খাঁর কবিকল্পনা বিকশিত হয়। কিন্তু সপ্তদশ শতকের মুসলমান কবিগণ আমাদের অধিকতর নিকটস্থ নর-নারীর পার্থিব প্রেমকে উপলক্ষ্য করিয়া সাহিত্য-সৃষ্টির প্রয়াস পান। বলা অনাবশ্যক যে, বাঙ্গালায় মুসলমান কবিগণই প্রত্যক্ষভাবে মানবীয় প্রেমকে আদর্শ করিয়া কাব্য-প্রণয়নের নূতন ধারা প্রবর্ত্তন করেন। আরাকান-রাজ শ্রীসুধর্ম্মার 'লস্কর-উজীর শ্রীযুত আশরফ খানের' আদেশে সপ্তদশ শতকের প্রথম ভাগে (১৬২২ খৃঃ—১৬৩৮ খৃঃ) কবিগুরু কাজী দৌলৎ 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' রচনায় আত্মনিবেশ করেন। উহার আরম্ভ-ভাগে আছে—

নিরঞ্জন-সৃষ্টি নর অমূল্য রতন।
ত্রিভুবনে নাহি কেহ তাঁহার মতন॥
নর বিনে চিন্ নাহি কেতাব কোরাণ।
নর সে পরম জান, তন্ত্র মন্ত্র জ্ঞান।
নর সে পরম দেব, নর সে ঈশ্বর।
নর বিনে ভেদ নাহি ঠাকুর কিঙ্কর॥

দৌলৎ কাজীর কল্যাণে নিছক 'নর' আসিয়া বাঙ্গালা কাব্যের প্রধান ভূমিকায় আত্মপ্রকাশ করিল। তিনি অলৌকিকতার দৌরাত্ম্য হইতে বাঙ্গলা কাব্যকে প্রায় মুক্তি দিলেন। নারী-সৌন্দর্য্যের বর্ণনায় তাঁহার অনিবার্য্য শব্দ-সমাবেশ এবং মনোজ্ঞ উপমা প্রয়োগের ফলে বাঙ্গলা-কাব্য পল্লী-প্রাঙ্গণ হইতে বিদ্বন্মণ্ডলীর আসরে অসংশয়িত আসন লাভে সমর্থ হইল। "ময়নাবতী ও লোরক-চন্দ্রানীর" আখ্যায়িকা এখনও রাজপুতানা-অঞ্চলে শুনিতে পাওয়া যায়; এতৎসংক্রান্ত কয়েকখানি পুরাতন চিত্র লাহোরের যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ঠেট-হিন্দী হইতে কাজী দৌলৎ উহার আখ্যান-ভাগ আহরণ করিয়াছিলেন। কিন্তু কবি-বর্ণিত সেই 'গোহারী' দেশ কোথায়? চন্দ্রানীর প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন—

প্রথম যৌবনী কন্যা রূপে মনোহারী।
বচন অমৃত পূর্ণ সে চান্দ গোহারী॥

কবির বলিষ্ঠ লেখনীর অসামান্য দক্ষতাগুণে সৌন্দর্য্য-কামনার আনন্দ-রস যেন চতুস্পার্শ্বে উচ্ছ্বসিত হইতেছে। একটু উদ্ধৃত করি—

শীতল মন্দিরে কন্যা নাহি রয় স্থির।
মদন-বেদনা চিত্তে, আঁখে ঝরে নীর॥
হিততত্ত্ব উপদেশ না শুনে শ্রবণে।
ক্ষণে আলাপয় ক্ষণে বিলাপে আপনে॥
যৌবন কালেতে কন্যা বড় চিন্তা পায়।
অনঙ্গ-ভুজঙ্গ-বিষ সর্ব্বাঙ্গে বেড়ায়॥
সে বিষ নামাইতে নাহি ওঝার শকতি।
স্বামী সে চিকিৎসা-হেতু, ঔষধ সুরতি॥

কাজী দৌলৎ উপমা-ব্যবহারে স্থানে স্থানে বিদ্যাপতির তুল্য দক্ষতার পরিচয় দিয়াছেন। বিদ্যাপতির মৈথিল-ভাষার সহিত প্রাকৃত বাঙ্গালা ও সামান্য হিন্দী মিশ্রিত হইয়া ব্রজবুলির সৃষ্টি হয়; কাজী দৌলৎ সংস্কৃত, ফারসী, হিন্দী প্রভৃতির মতন এই ব্রজবুলিতেও বিশেষ ব্যুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার ব্রজবুলিতে রচিত বারমাস্যা বাঙ্গালা সাহিত্যের অক্ষয় সম্পদ।

কাজী দৌলৎ চট্টগ্রাম জেলার রাউজানের অন্তর্গত সুলতানপুরে জন্ম পরিগ্রহ করেন। তিনি অকালে দেহত্যাগ করেন; সেজন্যই তাঁহার অমর কাব্য 'সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রানী' সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের প্রায় একুশ বৎসর পরে ১৬৫৮ খৃষ্টাব্দে স্বনামপ্রসিদ্ধ কবি সৈয়দ আলাওল শাহ্ কর্তৃক উহার বাকী অংশ সংরচিত হয়। আলাওল বহুভাবে দৌলৎ কাজীর নিকট ঋণী। দৌলৎ কাজীর রচনায় রূপধ্যানীর ঔদাসীন্য লক্ষ্যণীয়, আর আলাওলের বিশেষত্ব হইতেছে পাণ্ডিত্যের দীপ্তি।

"সুধর্ম্মার শেষে তিন নৃপ চলি গেল," অতঃপর রাজা থদো-মিন্তারের আমলে অমাত্য সোলেমানের আদেশে সৈয়দ আলাওল "লোর-চন্দ্রানী" কাব্যের অবশিষ্ট অংশ রচনা করেন। এ-প্রসঙ্গে আলাওল বলিয়াছেন—

সোলেমান মহামতি
হরষিতে আদেশ করিল আমা প্রতি ঃ
এই খণ্ড পুস্তক পুরাও মোর নামে,
দুগ্ধ মধু দোহ আনি' বিলাও এক ঠামে।

অমাত্য সোলেমানের আদেশে আলাওল 'তোহফা' নামক একখানি আধ্যাত্মিক কাব্যও রচনা করেন। ভণিতাদৃষ্টে মনে হয়, কবি তখন 'জীর্ণ-কায়', তখন তাঁহার 'বৃদ্ধকাল'। তিনি কোন্ কাব্যখানি প্রথম রচনা করেন, তাহা নির্ণয় করা কঠিন। কবি তাঁহার বিভিন্ন কাব্যে যেভাবে আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছেন, তাহাতে ধারণা হয় যে, 'লোর-চন্দ্রানীর' উত্তরাংশ তাঁহার সর্ব্বপ্রথম রচনা এবং 'তোহ্ফা' তাঁহার সর্ব্বশেষ রচনা।

আলাওল 'সতী ময়না'র উত্তরাংশ ভিন্ন 'পদ্মাবতী', 'সয়ফুলমুল্লুক্'-বদিয়ুজ্জামাল', 'সপ্ত-পয়কর', 'সেকান্দরনামা,' 'তোহ্ফা' প্রভৃতি প্রণয়ন করিয়াছিলেন। মালিক মোহাম্মদ জায়শীর হিন্দী 'পদুমাবৎ' কাব্যের (৯২৭ হিজরী) ভাবানুবাদ হইতেছে তাঁহার 'পদ্মাবতী'। ইহাই তাঁহার সর্ব্বোত্তম রচনা। আরাকান-রাজ থদো-মিস্তারের শাসন-সময়ে প্রধান মন্ত্রী কোরেশী মাগন-ঠাকুরের আজ্ঞায় ১৬৫১ খৃষ্টাব্দে উহা অনূদিত হয়। কবি তাঁহার কাব্যের নায়িকা পদ্মাবতীর (পদ্মিনীর) বয়ঃসন্ধি বর্ণনা করিয়াছেন এইভাবে—

উপনীত হৈল আসি' যৌবনের কাল।
কিঞ্চিৎ ভুরুর ভঙ্গে বচনে রসাল॥
আড়-আঁখি বঙ্ক-দৃষ্টি ক্রমে ক্রমে হয়।
ক্ষণে ক্ষণে লাজে তনু যেন সঞ্চরয়॥
সম্বরয় গীম-হার, কটির বসন।
চঞ্চল হইল আঁখি, ধৈরয গমন॥
চোর-রূপে অনঙ্গ অঙ্গেতে আসে যায়।
বিরহ-বেদনা ক্ষণে ক্ষণে মনে ভায়॥
অনঙ্গ সঞ্চরে অঙ্গে রঙ্গভঙ্গ-সঙ্গে।
আমোদিত পদ্ম-গন্ধ পদ্মিনীর অঙ্গে।
সংসারে নাহি ক দৃষ্টি, নয়ান আকাশে।
যোগী-মুনি তপঃ করে দরশন-আশে॥
নিত্য সুখ রস-রঙ্গ কথা সুমধুর।
হৃদয়ে জন্মিল কিছু প্রেমের অঙ্কুর॥

আলাওল ছন্দঃ ও অলঙ্কার-শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ছিলেন। তাঁহার সংস্কৃত-ঘেঁষা সাধু-ভাষার পরিপাট্য ও ঝঙ্কার অসামান্য প্রতিভার পরিচায়ক। উদার ও অসাম্প্রদায়িক পটভূমিকার উপর তিনি তাঁহার কাব্যের ভিত্তি গড়িয়াছিলেন। সৌন্দর্য্য-চিত্র অঙ্কনে তিনি যে কিরূপ সিদ্ধহস্ত ছিলেন, তাহা পদ্মাবতীর ভুরু ও আঁখির বর্ণনাতেই বুঝা যায়—

কামের কোদণ্ড ভুরু অলখা-সন্ধান।
যাহারে হানয় বালা, লয় যে পরাণ।

ভুরুভঙ্গ দেখি' কাম হইল অতনু।
লজ্জা পাই' ত্যজিল কুসুম-শরধনু॥
কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু।
ভুরুভঙ্গ-দরশনে লুকায় নিজ তনু॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি' ভুজঙ্গ সকল।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল॥
প্রভারুণ-বর্ণ আঁখি সুচারু নির্ম্মল।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল॥
কাননে কুরঙ্গ, জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন-গঞ্জন নেত্র অঞ্জন-রঞ্জিত॥
আঁখিতে পুতলী শোভে রত্ন সেতান্তর।
ভুলিয়া কমল রসে বসিল ভ্রমর॥
কিঞ্চিৎ লখিতে মাত্র উথলে তরঙ্গ।
অপাঙ্গ-ইঙ্গিতে হয় মুনি-মন ভঙ্গ॥

সৈয়দ সুলতানের 'শবে-মেয়ারাজ' কাব্যে বিদ্যাধরীগণের রূপবর্ণনা অনেকটা এ-ধরণেই করা হইয়াছে—

খঞ্জন-গঞ্জন আঁখি, নাসা তিলফুল।
চাঁচর চিকুর সব লম্বিত বহুল॥
ভুরু-যুগ দুই ধনু, কাজলে রঞ্জিত।
ঈষৎ কটাক্ষ-শরে করয় মোহিত॥
মুখশশী 'পরে যেন নয়ান-চকোর।
রহিছে অমিয়া-আশে হই' অতি ভোর॥
সেই পদ্ম 'পরে শোভে অলখা ভ্রমর।
ঘর্ম্মজল মধু বলি' পিয়ে নিরন্তর॥

মন্ত্রী মাগনের আশ্রয়ে রচিত আলাওলের দ্বিতীয় কাব্য "সয়ফলমুল্লুক-বদিউজ্জামাল"। সে-সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—

মহাদেবীর মুখ্য পাত্র শ্রীযুত মাগন।
সয়ফলমুল্লুক-কথা করাইল রচন॥

পুস্তক না সাঙ্গ হৈতে পাইল পরলোক।
কত কাল মোর মনে আছিল সে শোক॥

তাহার নয় বৎসর পর অন্যতম মন্ত্রী সৈয়দ মুসার উপরোধে আলাওল সেই কাব্যখানি সমাপ্ত করেন। কবি লিখিয়াছেন যে, তিনি তখন 'বৃদ্ধ' ও 'বলহীন'। কিন্তু সেই বয়সেও কবি যে মুন্সিয়ানা দেখাইয়াছেন, তাহা বিস্ময়কর।

তোমার রূপের ছবি যখন দেখিলুম।
সব সুখ সঙ্কল্পিয়া দুঃখ ইচ্ছিলুম॥

ভাবপ্রকাশের বলিষ্ঠতা ও রূপকল্পনার বিশালতার অন্তরালে বেদনার ছায়াপাত এই কাব্যখানিকে মধুর করিয়া তুলিয়াছে। আলাওল বহু ভাষা ও বহু শাস্ত্রে বুৎপন্ন ছিলেন। তাঁহার তুল্য পণ্ডিত প্রাচীন কবি-সমাজে ভারতচন্দ্র ভিন্ন দ্বিতীয় দেখা যায় না। তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে উপমা ও অলঙ্কার যেভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে তাহাতে তাঁহার অসাধারণ লিপিশক্তি ও বিদ্যাবত্তার আশ্চর্য্য পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাচীন মুসলমান কবিদিগের মধ্যে আলাওল নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠতম প্রতিভা। বাঙ্গালা কাব্যে তিনি যে নবধারার প্রবর্ত্তন করেন, ভারতচন্দ্রে তাহার সর্ব্বোত্তম বিকাশ।

মানুষ এই মর্ত্ত্য-জীবনেই স্বর্গসুখ আস্বাদের জন্য ব্যাকুল। ভাগ্যহত মূঢ় মানুষ সংসারের শোক-দুঃখ বঞ্চনা-বেদনা বহন করিয়া চলে মৃত্যুর পরে স্বর্গের অনন্ত সুখ আস্বাদনের আশায়। তাহারা স্বর্গকে ভাবে ইন্দ্রিয়াসক্তি তৃপ্তির চিররম্যস্থান—পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার ইপ্সিত মিলন লাভের অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তাহাদের সাধনা-ভাবনার বিষয় নয়। স্বর্গ-হুরীর সাহচর্য্য লাভের লিপ্সাতেই তাহাদের মন উচাটন; কিন্তু স্বর্গলাভের আগে সে সুখের আশা নাই। তাই দরদী কবি দুর্ব্বল মর্ত্ত্যমানবকে স্বর্গজাত হুর-গেলমানের বিরহ-শোকে মুহ্যমান হইতে না দিয়া অগ্নিজাত জীনপরীর দেশে তাহাদের কল্পনাকে উদ্দাম ভ্রমণের অবসর দিয়াছেন। কবি-কল্পনার বেড়াজালে পড়িয়া জীন-পরী গন্ধর্ব্ব-অপ্সরী প্রভৃতি মানুষের দুর্জ্জয় কামনার কুণ্ডে আহুতি হইয়াছে। কাজী দৌলতের কবি-কল্পনা পৃথিবীর মাটি ও আকাশকে উত্তরণ

করিয়া অতি-প্রাকৃত-অবাস্তবতার রাজ্যে উধাও হয় নাই; কিন্তু আলাওল তাঁহার ভাবনেত্রে পরীরাজ্যের ( Fairy Land ) মোহাঞ্জন পরিতেও আনন্দবোধ করিয়াছেন। মনে হয়, আলাওলই সর্ব্বপ্রথম ফার্সী-সাহিত্য হইতে পরী প্রেমের উপাখ্যান বাঙ্গালায় আমদানী করেন।

চারিজন আরোহিল যুগল বিমানে।
মুখ্য মুখ্য পরী সব ধরিল জোগানে ॥
—'সয়ফলমুল্লুক-বদিউজ্জমাল'

কন্যা তবে আসিয়া কুমারে কৈল রাজা।
বিধিবশে অপ্সরা সে করে নরপূজা ॥
—'সপ্ত পয়কর'

পরী ও অপ্সরী হইয়াছে মানুষের সেবিকা ও প্রেমিকা; এই শিশু-সুলভ কল্পনা চিররোমাঞ্চকর। গন্ধর্ব্বকন্যার রূপদর্শনে মানবকুমার দিশেহারা হইবে ইহাতে বিস্ময়ের বিশেষ কিছু নাই; কিন্তু কবির তুলিকা-স্পর্শে নর-নন্দনের দেহ-সৌন্দর্য্য এমনভাবে চিত্রিত যে, তাহাতে গন্ধর্ব্বকন্যাকেও আত্মহারা হইতে হইয়াছে—

আপাদ-মস্তক নিরক্ষিয়া ভালো-মত
প্রেমানলে জ্বলি' দোহে রহিল মূর্চ্ছাহত।
নয়নে নয়নে দোঁহে চাহিয়া রহিল;
কতক্ষণ ধৈর্য্য ধরি' চৈতন্য লভিল।
মনে মনে মিলি' গেল নয়ানে নয়ান;
আঁখিপথে প্রবেশিল দোঁহার পরাণ।
তবে কন্যা পাট হ'তে সাদরে উঠিয়া
বসা'ল দক্ষিণ পার্শ্বে কুমারে তুলিয়া।
—সপ্ত পয়কর

গন্ধর্ব্বকন্যা তাহার প্রেমাকাঙ্খী যক্ষকে নিধন করিবার গোপন কৌশল কুমারকে বলিয়া দেয়, কুমার অলৌকিক মন্ত্রক্ষমতার বলে যক্ষকে নিপাত করিলে পর কন্যা তাহার অঙ্কে আপনাকে সানন্দে সমর্পণ করে,—এই উপকথা গ্রাম্য পাঠকের মনকে পরী-অপ্সরীর আসঙ্গ-লাভের আশায় আজও উজ্জীবিত করিয়া তোলে।

সপ্তদশ শতকের অন্যতম কবি সৈয়দ মোহাম্মদ আকবরের "জেবলমুলুক-শামারোখ" কাব্যের নায়িকা 'শামারোখ' গন্ধর্ব্বকুমারী ; দুঃসাহসিক মানুষের দুর্দ্দম আকাঙ্খার আকর্ষণে সেও পক্ষ শ্লথ করিতে বাধ্য হইয়াছে। মানুষের অজেয় কামনা যক্ষরাজ্য জয় করিতেও সমর্থ— এই প্রত্যয়ই উক্ত কাব্যের অন্তর্নিহিত কথা। কিন্তু মাটির মানুষের মন যখন অবাস্তব সৌন্দর্য্যলোকে অভিসার করে, তখন জীবন-রসের পরিপূর্ণ আস্বাদ তাহার ভাগ্যে প্রায়শঃ ঘটে না। তাই দেখা যায়, এরাদত আলী (ছহি গোলে বকাওলি), আবদুস্ শুকুর (বকাওলি-বাহারিয়া), কমরুদ্দিন আহমদ (শাহে এমরান-চন্দ্রভান), আবদুল গফ্ফার (নূরবক্স-নওবাহার), আবদুল করিম (কমরজ্জমান-বেদৌরা) প্রমুখ যে-সমস্ত মুসলমান কবি পরী-অপ্সরীকে নায়িকা করিয়া কাব্যরচনার প্রয়াস পাইয়াছেন, তাঁহাদের লেখনীতে প্রেমের আগ্নেয় অনুভূতি ও আনন্দ-বেদনার অতল গভীরতা কদাচিৎ প্রকাশ পাইয়াছে। ইন্দ্রিয়াতীত আনন্দের বেসাতি এই স্বল্পশক্তি কবিদের জন্য নহে, ইন্দ্রিয়লভ্য সহজ আনন্দের উলঙ্গ প্রকাশই হইয়াছে তাঁহাদের রচনার বিশেষত্ব।

* * * *

খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দীতে কবি সৈয়দ সুলতান (১৩৭৫-১৪৫০ খৃঃ) আবির্ভূত হইয়াছিলেন। তিনি 'জ্ঞান-প্রদীপ', 'ওফাতে-রসুল', 'শবে-মেয়রাজ', 'নবীবংশ' প্রভৃতি বহু কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। 'জ্ঞানপ্রদীপ' কাব্যে কঠিন যোগসাধন-প্রণালী পদ্যাকারে লিপিবদ্ধ হইয়াছিল। 'জ্ঞানপ্রদীপের' প্রারম্ভে আছে—

আওয়ালে আল্লার নাম করিয়া যে সার,
সৈয়দ সুলতানে কহে তনের বিচার।

দুরূহ দেহতত্ত্বের বিচারই কবির প্রধান লক্ষ্য ছিল। কাব্যখানিতে নানা পরমার্থিক তত্ত্ব সঙ্কেতপূর্ণ সন্ধ্যাভাষায় পরিব্যক্ত হইয়াছিল। গুরুপদ যে পরমারাধ্য, একথা কবি গভীরভাবে বিশ্বাস করিতেন। তাই গুরু হোসেন শাহার 'চরণতলে বসিয়া' তিনি হজরত মুসা, ঈসা, দাউদ, সোলেমান, নূহ প্রভৃতি আম্বিয়াগণের পবিত্র জীবনকাহিনী কাব্যসূত্রে গ্রথিত করিয়াছিলেন। হজরত মোহাম্মদের অসামান্য

জীবন ও মৃত্যুকথাও তাঁহার শক্তিমান লেখনীমুখে বর্ণিত হইয়াছিল। কিন্তু পরিতাপের বিষয় যে, সে-সমস্ত কাব্যের নানা ছিন্ন অংশই এ-পর্য্যন্ত সংগৃহীত হইয়াছে।

সৈয়দ সুলতানের রচনায় আরবী-ফারসী শব্দের ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। একথা সত্য যে, পরবর্ত্তীকালে বহু মুসলমান পুঁথিকার প্রয়োজন-বশে আরবী-ফারসী মিশ্রিত ভাষা ব্যবহার করিতে বাধ্য হইয়াছেন। আলাওলের "তোহফা" নামক আধ্যাত্মিক কাব্যেও 'লৌলাক', 'বেহেস্ত', 'নবী', 'কেরামত' প্রভৃতি বহু বৈদেশিক পদের অপরিহার্য্য প্রয়োগ দৃষ্ট হইয়া থাকে। এ-ধরণের 'মুসলমানী' শব্দের স্থলে বাঙ্গালা প্রতিশব্দ ব্যবহার করিয়া বক্তব্যকে সুস্পষ্ট করা সহজসাধ্য নয়। তাই ইসলামী শরা-শরীয়ৎ ও মারফৎ-হকিকৎ সম্বন্ধে যে-সমস্ত পুঁথি প্রচলিত রহিয়াছে, তাহাদের ভাষা আরবী-ফারসী-ঘেঁষা না হইয়া পারে নাই। বিষয়-বস্তুই এজন্য দায়ী।

ধর্ম্মীয় পুস্তকাদি ছাড়া আর-এক ধরণের পুঁথিতে উর্দ্দু ফারসীর আধিক্য দেখা যায়। সে-সমস্ত পুঁথির অধিকাংশ রচিত হইয়াছে মোহর্‌রমের মর্ম্মান্তিক ঘটনা উপলক্ষ্য করিয়া। এমাম হোসেনের নিদারুণ হত্যাকাহিনীর ভিত্তিতে বাঙ্গালায় যে বিরাট পুঁথি-সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছে, আমি তাহার নামকরণ করিয়াছি "মসিয়া-সাহিত্য"। মহাজন-পদাবলী, নাথ-গীতিকা, মঙ্গল-কাব্য, চৈতন্য-সাহিত্য প্রভৃতি যেমন উপাদান ও প্রকাশ-রূপের দিক্ দিয়া পরস্পর হইতে পৃথক, তেমনই বাঙ্গলার এই 'মসিয়া-সাহিত্য' বিষয়-বস্তু ও বাক্-ভঙ্গীতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র।

মর্সিয়া-সাহিত্যের আদি-লেখক হইতেছেন মোহাম্মদ খান্। তিনি সপ্তদশ শতকের মধ্যভাগে তাঁহার অমর কাব্য "মক্‌তুল হোসেন" ফারসীর অনুভাবে প্রণয়ন করেন। ইহাতে কারবালার করুণ কাহিনী হৃদয়স্পর্শী ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে; তাই মুসলমান সমাজে তাহার প্রচার এখনও হ্রাস পায় নাই। কবি ভণিতায় বলিয়াছেন—

'মোক্তাল-হোসেন কথা বিষাদের খনি।
মোহাম্মদ খান্ তাহা করিল গাঁথনি॥

অবশ্য একালে এয়াকুবের "ছহি বড় জঙ্গনামা" মোহাম্মদ খানের "মকৃতুল হোসেন" অপেক্ষা অধিকতর আদৃত। "জঙ্গনামা" রচনা সম্পর্কে কবি বলিয়াছেন—

ফারসী কেতাব ছিল মোক্তল হোছন।
তাহা দেখি' কবি আমি করিনু রচন॥
বচনের ঝুট-সাচ্চা আমি নাহি দেখি।
কেতাবে যেমন আছে আমি তাহা লেখি॥

আজিও পল্লী-মুসলমানের নিকট 'জঙ্গনামা' অতি-আদরণীয় গ্রন্থ। এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, স্বনামখ্যাত মীর মোশার্‌রফ হোসেন মরহুমের গদ্যগ্রন্থ "বিষাদ-সিন্ধু' এই 'জঙ্গনামা' অবলম্বনেই বিরচিত হয়। মোহর্‌রমের যে-কাহিনী 'জঙ্গনামা'য় লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তাহার ঐতিহাসিক সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া মুন্সী জনাব আলী তাঁহার 'শহীদে-কারবালা' কাব্যে বলিয়াছেন—

মহরমের বুনিয়াদ শিয়া-লোক হ'তে।
বাংলার মুসলমান ভাবিত সে-মতে॥...
'জারী' ও 'মসিয়া' যত গাহিত সকলে।
সে-কথা না পাওয়া যায় হাদীসে দলীলে॥
সেই মর্ছিয়ার ভাবে কোনো শায়েরেতে॥
মোক্তাল হোছেন লিখে দিলেন ফারসীতে॥
বাঙ্গালার জঙ্গ-নামা তর্জ্জমা তাহার।
দেশে দেশে জারি খুব আছে যে-প্রকার॥...
কেননা, তাহাতে যত বে-দলীল বাত্।
নাহি মিলে সত্য কিছু দীনের হালাত্॥

ঐতিহাসিক সত্য ও ধর্ম্মবিধির দোহাই দিয়া "শহীদে-কারবালা" রচিত হইয়াছে বটে, কিন্তু তাহা চিরন্তন রসের ক্ষেত্রে উত্তীর্ণ হইতে পারে নাই। সাহিত্যের দরবারে এই বিধি-নিষেধের বেড়াজাল টিকে নাই; তাহাতে কবি-কল্পনা বাধা পড়ে নাই। শাহ্ বদিউদ্দিনের "ফাতেমার ছুরতনামা", সেরবাজের "সখিনা-বিলাপ", শেখ মনসুরের "আমীর-জঙ্গ", বনিজ মামুদের "এমাম-সাগর", হায়াত মামুদের

"মোহর্‌রম-পর্ব্ব", দুর্গতিয়া সরকার সাহেবের "এমাম-যাত্রা নাটক", ছেকেন আলী মিঞার "এমাম-বধ নাটক" প্রভৃতি দেখিলে এ-উক্তির সত্যতা প্রমাণিত হইবে। "জয়নবের চৌতিশা", "সকিনার বারমাস", "হানিফার পত্রপাঠ" প্রভৃতিতে যে-করুণ রসের বন্যা বহিয়া গিয়াছে, তাহাতে বাঙ্গালী চাষীর চিত্ত হইয়াছে চিরদিন অশ্রু-আর্দ্র।

কিন্তু কারবালা-কাহিনীর এই মর্ম্মস্পর্শী বিলাপ একঘেয়ে নহে, তাহার পাশে রহিয়াছে মোহাম্মদ হানিফার বীরত্বের চিত্র। জঙ্গনামায় আছে—

এইভাবে হনুফার এগার বেটা হৈল।
ফাতেমার হাঁকে পয়দা হইয়া মরিল॥

অবশেষে হজরৎ আলীর কল্যাণে হনুফা-নন্দন বীর হানিফা অকালমৃত্যু হইতে রক্ষা পায়!—এমাম হোসেনের এই কল্পিত ভ্রাতাকে কেন্দ্র করিয়াই আবদুল আলীমের "হানিফার লড়াই", সৈয়দ হামজার "জৈগুনের পুঁথি", ফকীর মোহাম্মদ শাহের "ছহি সোনাভান", খোন্দকার গোলাম ইস্‌মাইলের "পবন-কুমারী" প্রভৃতি রচিত হইয়াছে। বীর হানিফা সম্বন্ধে "পবন-কুমারী"তে বলা হইয়াছে—

তের জঙ্গ করে মর্দ্দ কেতাবে খবর।
চৌদ্দ জঙ্গ লেখা যায় বসন্তনগর॥

আমীর হানিফার অদ্ভুত পাহ্‌লোয়ানীর বর্ণনাই এ-সমস্ত পুঁথির বিশেষত্ব। পুঁথি-কাব্যের প্রায় নায়কগণের মতন হানিফাও বহু-বিবাহের ভক্ত; কিন্তু নায়িকাগণের মধ্যে কদাচ সপত্নী-বিদ্বেষ দেখা যায় না। 'সূর্য-উজাল বিবির কেচ্ছা'তে আছে—

পহেলা করেছে সাদী মল্লিকা-আকার।
তারপরে করে সাদী জৈগুন সুন্দর॥
সমর্ত্তভানে করে সাদী জোরে পালোয়ান।
তারপরে করে সাদী বিবি সোনাভান॥
পবন-কুমারী বিয়া করে আপনার জোরে।
এই পঞ্চ বিবি দেব হানিফার ঘরে॥

যমরাজার বেটী মল্লিকা, এরেমের শাহাজাদী জৈগুন প্রভৃতি

হানিফা অপেক্ষা হীনবীর্য্য নন। তাঁহাদের জঙ্গ-বাহাদুরী আশ্চর্য্য ভঙ্গীতে এ-সমস্ত পুঁথিতে বর্ণিত হইয়াছে। হানিফার দেহ-বলের বর্ণনা-প্রসঙ্গে কবি সৈয়দ হামজা বলিয়াছেন—

নও-শো চল্লিশ মনের মনের ছিল যে বক্তর,
উঠাইয়া নিল মর্দ্দ অজুদ উপর ॥

আর কবি ফকির মোহাম্মদ শা বীরাঙ্গনা সোনাভানের রণ-অভিযানের ছবি আঁকিয়াছেন এইভাবে—

দুধে-জলে ত্রিশ মণ করি' জলপান।
আশী মণ খানা ফের খায় সোনাভান ॥
হাজার মণের-গুর্জ্জ তুলি' নিল হাতে।
আছিল লোহার জেরা, পরিল গায়েতে ॥
শিঙ্গার করিয়া বিবি বামে বান্ধে খোঁপা।
তারপরে গুঁজে' দিল গন্ধরাজ চাঁপা ॥
সওয়ার হইয়া বিবি ঘোড়ার উপরে।
ময়দানে চলিল বিবি হানিফা-হুজুরে ॥

এ-কথা সত্য যে, এ-সমস্ত পুঁথিতে অলৌকিকতা ও অদ্ভুতত্বের অত্যধিক বাড়াবাড়ি রহিয়াছে। কল্পনার দৈন্যের জন্যই বীরত্ব-বর্ণনা হইয়াছে এরূপ কৌতুকাবহ। তবে সান্ত্বনার কথা এই যে, কবি এরূপ কৌতুকোদ্দীপক পরিবেশেও তাঁহার বীর-নায়িকার বঙ্কিম খোঁপায় "গন্ধরাজ চাঁপা" গুঁজিয়া দিতে ভোলেন নাই। অধিকন্তু "ছহি-সোনাভানের" ভাষার গতিবেগ বেশ তূর্ণ। তবে তাহাতেও অলৌকিক ক্ষমতার ব্যাখ্যান কিছুমাত্র কম নহে।

এ-সমস্ত স্বল্প-শক্তি পুঁথিকারগণের কথা থাকুক, সুপ্রচলিত "কাছাছোল আম্বিয়া"-র লেখকগণও অদ্ভুতত্বের মোহ কাটাইয়া উঠিতে পারেন নাই। আজহার আলীর "জঙ্গে-রসুল ও জঙ্গে-হজরৎ আলী' নামক পুঁথিতে আছে—

আলী শাহা সেই ঘড়ি মোনাজাত করে।
পশ্চিম হৈতে সূর্য্য ওঠে আল্লার মেহেরে ॥

এই প্রকার অলৌকিকত্বের পাশাপাশি রহিয়াছে পাহলোয়ানী। উক্ত পুঁথির অন্যত্র আছে—

হাজার হাজার কাটে জিনের লস্কর।
লোহুর তুফান চলে জমিন উপর॥

এবম্প্রকার পাহ্‌লোয়ানীর চূড়ান্ত চিত্র অঙ্কিত হইয়াছে আবদুন্ নবী, সৈয়দ হামজা, শাহ্ গরীবুল্লাহ্ ইত্যাদি প্রণীত "আমীর হাম্‌জা" নামক পুঁথিগুলিতে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, কাজী দৌলত ও সৈয়দ আলাওলের সূক্ষ্ম সৌন্দর্য্যদৃষ্টি পরবর্ত্তী পুঁথিকারদিগের মধ্যে প্রায়শঃ দৃষ্ট হয় না। দৌলত কাজীর দুইটি চমৎকার চরণ—

যুবক পুরুষ জাতি নিঠুর দুরন্ত।
এক পুষ্পে নহে জান মধুকর শান্ত॥

মোহাম্মদ রাজার "তমিমগোলাল-চতুর্থছিল্লাল' পুঁথিতে এ-ধরণের দুইটি পংক্তি আছে—

পুরুষ ভোমরা-জাতি ফুল-মধু চোর।
মজাইয়া এক পুষ্প আর পুষ্পে ভোর॥

এ-সমস্ত পুঁথির দুই-একটি স্তবক অথবা ছত্রে কবিত্বের আভাষ আছে বটে, কিন্তু কুত্রাপি প্রতিভার প্রকৃত নিদর্শন দেখা যায় না। মনুয়ার আলীর "আলমাছ-গোলেরায়হানে" আছে—

মাণিক্য রতন হেন যতনে রাখিব।
অঞ্জন মানিয়া নিত্য নয়ানেতে দিব॥
গজমুক্তা হেন দিব হৃদয়ে তুলিয়া।
বাসা করি' দিব নিজ কলেজা চিরিয়া॥

এ-ধরণের কথা সাধারণ্যের মধ্যে আজও সুপ্রচলিত। অনেকটা এ-কারণেই এ-সমস্ত পুঁথি ভাব-কল্পনার দৈন্য সত্ত্বেও জন-সমাজে সমাদৃত হইয়াছে। এরাদত আলীর "ছহি গোলে-বকাউলি', অথবা আবদুস্ শুকুরের "বকাউলি-বাহারিয়া" পড়িয়া তাহাদের অমার্জ্জিত মন পরীরাজ্যে অবাধে বিচরণ করিয়া আসিতে পারে। এরূপ লোভ সামলানো একালের শিক্ষিত লোকের পক্ষেও শক্ত।

পুঁথি-সাহিত্যের দোষ-ত্রুটী সামান্য নহে নিশ্চয়ই। কিন্তু কোনো

অজুহাতেই ইহাকে সাহিত্যে অপাংক্তেয় করা সমীচীন হইবে না। স্বনামখ্যাত মুন্‌শী আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ বলিয়াছেন—"এ-পর্য্যন্ত 'বটতলার' মুসলমান কবিগণ ৮৩২৫ খানি পুস্তক রচনা করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু ইহার মধ্যে এখন কেবল ৪৪৪৬ খানি গ্রন্থ ছাপা হয় এবং বাজারে প্রচলিত আছে; ২৯৮২ খানি গ্রন্থের অস্তিত্ব নানা কারণে বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ৭৯৫ খানি গ্রন্থ কবিগণের উত্তর-বংশীয়গণের মধ্যে বিরোধের ফলে এখন আর ছাপা হয় না। ১০২ খানি পুস্তকের প্রচার সরকারী আইনানুসারে বন্ধ হইয়া গিয়াছে।" ( বঙ্গীয় মুসলমান সাহিত্য-পত্রিকা, মাঘ, ১৩২৫ )—এই বিরাট পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের অবহিত হওয়া অত্যন্ত বাঞ্ছনীয়। অবশ্য এই সাহিত্যের একটি বড় ত্রুটী এই যে, ইহাতে স্বদেশের প্রতি অনু-রক্তি, অথবা সমাজের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খার ক্ষীণতর আভাষও নাই। আমাদের বটতলা-সাহিত্যের অধিকাংশই ধর্ম্মমূলক গ্রন্থ, কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের আকুলি-বিকুলি দুই একখানি পুঁথিতেও সামান্য প্রকাশ পাইয়াছে কি না সন্দেহ। হিন্দী ও ফারসী হইতে অনূদিত পুঁথিগুলিতে বৈদেশিকতার প্রভাব অবশ্যম্ভাবী বটে, কিন্তু সমগ্র পুঁথি-সাহিত্যই যদি হয় দেশের মাটী ও মানুষের সহিত সম্পর্কশূন্য, তবে তাহার প্রতি শিক্ষিত পাঠকের বীতস্পৃহ হওয়া স্বাভাবিক। তবে নূতন সাহিত্য সৃষ্টির পশ্চাতে প্রাচীন ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি কম ক্রিয়াশীল নহে; কাজেই পুরাতন পুঁথি-সাহিত্য সম্বন্ধে আমাদের কৌতুহল জাগ্রত হওয়া উচিত।

* * * *

উপরোক্ত "তমিমগোলাল-চতুর্ণছিলাল" পুঁথিতে অপ্রত্যাশিতভাবে একটি বৈষ্ণব পদের সন্নিবেশ ( কাব্য-মালঞ্চ, ৪২-৪৩ পৃষ্ঠা ) দেখিতে পাওয়া যায়। বকৌলির রূপৈশ্বর্য্য, জৈগুনের হুহুঙ্কার, মাদারের কেরামতি * প্রভৃতির রসোপভোগের অন্তরালে একটি চির-মধুর ভাবধারা যে বাঙ্গালী মুসলমানের মনোলোকে তখনও প্রবাহিত হইতেছিল, ইহা এই প্রকার বৈষ্ণবভাবের পদ দেখিয়া অনুমিত হয়। অবশ্য ইহা

* ছায়াদ আলী খোন্দকারের "জঙ্গে শাহ্ মাদার" পুঁথি দেখুন।

নিঃসন্দেহে অনুমান করা চলে যে, ষোড়শ শতক হইতেই বাঙলার মুসলমান কবিগণ বৈষ্ণব ভাবতত্ত্ব সম্যক্‌ অবগত ছিলেন। কাজী দৌলৎ ও সৈয়দ আলাওল যে বিদ্যাপতির রচনা-ভঙ্গীর সহিত সুপরিচিত ছিলেন, ইহা তাঁহাদের রচিত বারমাস্যাটি পড়িলেই বুঝা যায়। কিন্তু কাজী দৌলৎ তাঁহার বারমাস্যাতে ব্রজবুলির অনুসরণ করিলেও স্বতন্ত্র কোনো বৈষ্ণব পদ রচনা করেন নাই। অন্যপক্ষে আলাওল বৈষ্ণব পদ রচনায়ও কৃতবিদ্য ছিলেন। তাঁহার "ননদিনী রস-বিনোদিনী" এক অনবদ্য গীতি-কবিতা।

মুর্শিদাবাদের সাধক-কবি সৈয়দ মর্ত্তুজা বৈষ্ণব পদ-সাহিত্যের এক দিক্‌পাল বিশেষ। ঐতিহাসিক নিখিলনাথ রায়ের ধারণা যে, সৈয়দ মর্ত্তুজা খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে মুর্শিদাবাদ শহরের সন্নিকটস্থ জঙ্গীপুর বালিঘাটায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা সৈয়দ হোসেন কাদেরী-ও একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন। মর্ত্তুজার বুজুর্গী সম্বন্ধে বহু কিংবদন্তী প্রচলিত আছে। আনন্দময়ী নাম্নী এক ব্রাহ্মণ-কন্যা ভৈরবী-রূপে তাঁহার সহিত অবস্থিতি করিতেন। ছাপঘাটিতে তাঁহার আস্তানা ছিল; অদ্যাবধি তথায় তাঁহার দরগাহে প্রতি রজব মাসে মেলা বসিয়া থাকে। মর্ত্তুজার রচিত অনেক পদ 'পদকল্পতরু' প্রভৃতি বৈষ্ণব পদ-সংগ্রহে পাওয়া যায়। তাঁহার রচনায় তান্ত্রিক-যোগ ও ও সুফী-সাধনার এক আশ্চর্য্য সমন্বয় রহিয়াছে। তাঁহার "শ্যাম-বন্ধু, চিত-নিবারণ তুমি" পদটি চণ্ডীদাসকে স্মরণ করাইয়া দেয়।

ওহে পরাণ-বন্ধু তুমি!
কি আর কহিব আমি॥
তুমি সে আমার, আমি সে তোমার।
তোমার তোমাকে দিতে কি যাবে আমার॥
কে জানে মরম-কথা কাহারে কহিব।
তোমারে তোমায় দিয়া তোমার হৈয়া রহিব॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কহে, আমি ত না জানি।
ভব-সিন্ধু পার হৈতে যা কর আপনি॥

সৈয়দ মর্ত্তুজার এই পদটিতে যে সমর্পিতচিত্ততার প্রকাশ রহিয়াছে, তাহা অক্ষয় আনন্দের সামগ্রী।

মীর্জ্জা কাঙ্গালী, মীর্জ্জা ফয়েজুল্লাহ, নসীর মামুদ, আলী রাজা, ফকির হবিব, শেখ ফতন, শেখ ভিখন, সালবেগ (লালবেগ?), আকবর আলি শাহ, কমর আলি, আফজল আলী, মোহাম্মদ হাশিম, মোহাম্মদ হানিফ প্রমুখ অন্যূন চল্লিশ জন মুসলমান কবি সেকালে বৈষ্ণবীয় পদাবলী রচনা করিয়া লোকখ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে নসীর মামুদ এক উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি। তাঁহার সখ্যভাবের পদ ছন্দঃ-নৈপুণ্য ও শব্দমাধুর্য্যে সহজেই শ্রোতার মনোহরণ করে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চট্টগ্রামের অন্তর্গত ওশখাইন-গ্রামে দার্শনিক-কবি আলী রাজা জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার রচিত পদে আধ্যাত্মিকতার আভাষ সুস্পষ্ট—

সতত বঁধুর লাগি জ্বলে অবলার চিত।
হায়, এ কি প্রেম-রীত॥
দূর-দেশী সঞে প্রেম বাড়াইনু অতি।
সেই হৈতে হৈল মোর অনলে বসতি॥
প্রেমের ঔষধ খাই' হৈলুম উদাস।
জগ-লোকে কলঙ্কিনী বলে বার মাস॥
শাশুড়ী ননদী বৈরী, স্বামী হৈল ভিন্।
আর জ্বালা কালার, সহিমু কত দিন॥
গুরু-পদে আলি রাজা গাহিল কানাড়া।
চিত্ত হৈতে প্রেমানল না হউক ছাড়া॥

এই আধ্যাত্মিকতা এক অস্পষ্ট গুহ্যতত্ত্বের রূপে প্রকাশ পাইয়াছে তাঁহার সুবিখ্যাত "জ্ঞানসাগর" কাব্যে। তিনি তাহাতে স্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূত নিরঞ্জন নহে কদাচন।
সর্ব্বভূত হ'তে ভিন্ন নহে নিরঞ্জন॥

আলি রাজার উপর সহজিয়ার নিগূঢ় রস-সাধনার প্রভাব যথেষ্ট। তিনি একস্থানে বলিয়াছেন—

সুখ-দুঃখ ভালো-মন্দ নানা ভঙ্গী করি'।
আপে রঙ্গ চাহে আল্লা লীলা-রূপ ধরি'॥

আপনার মায়ানূর্লে আপে হই' বশ।
নানা রূপ ধরি' প্রভু করে নানা রস ॥

আল্লাহ্-রসুলের প্রসঙ্গ "জ্ঞান-সাগরে" আছে বটে ; কিন্তু আসলে যোগ-সাধনার মাহাত্ম্য প্রচারই তাঁহার উদ্দেশ্য। তিনি বলিয়াছেন—

কোরাণেতে কহিয়াছে জগত-ঈশ্বরে।
যোগ-পন্থে নরনারী সবে চলিবারে ॥
নরনারী সব যদি ফকিরী না করে।
পুণ্যবলে স্বর্গে গেলে না দেখিবে মোরে ॥

তাঁহার মতে, পুণ্যকর্ম্মের বলে মানবের মোক্ষলাভ ঘটিলেও ঈশ্বর-প্রাপ্তি ঘটে না। প্রেমের পথেই হয় সিদ্ধির বরলাভ—

সিদ্ধিপন্থ গোপন রাখিছে করতার।
সম্মুখে অসার পন্থ হয়েছে প্রচার ॥···
আলি-রাজা ভণে ভাষা জ্ঞানের সাগর।
প্রেম-পাঠ বিনু নাহি সিদ্ধি মুক্তি-বর ॥

প্রেমের উৎপত্তি ও মুক্তিতত্ত্ব সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—

(১) রূপ বিনু প্রেম নাহি, ভাব বিনা ভক্তি।
ভাব বিনু লক্ষ্য নাই, সিদ্ধি বিনা মুক্তি ॥
(২) মদনে পিরীতি জন্মে, প্রেমেতে সন্তাপ।
বিরহেতে দুঃখ জন্মে, দুঃখে সিদ্ধি-লাভ ॥

বলা অনাবশ্যক যে, এ-সমস্ত উক্তি আমাদিগকে বৈষ্ণবের রস-তত্ত্বই স্মরণ করাইয়া দেয়। তবে সহজিয়ার জটিল তাত্ত্বিকতার গহনে ডুব দিলেও তাঁহার জ্ঞানদৃষ্টি পরিচ্ছন্ন অথচ ভাবদীপ্ত।

আলী রাজার ধারণা যে, একালের অনেক কবি ও তাপস সেকালের বহু পয়গম্বর হইতেও শ্রেষ্ঠ। কারণ, 'আগম-নিগম-তত্ত্ব জানে ঋষিগণে।'

শাস্ত্র সব ত্যাগ করি' ভাবে ডুম্ব দিয়া
প্রভু-প্রেমে প্রেম করি' রহিবে জড়িয়া ॥

তাঁহার এই মধ্যযুগীয় মনোভাব গোঁড়া ধর্ম্মাচারীদের সমর্থনীয় হইতেই পারে না। তাঁহার মতে, প্রকৃত সাধক ভিন্ন পয়গম্বরের প্রদর্শিত পথে কেহ অগ্রসর হইতে পারে না, এবং গুরুর অন্ধানুসরণ মুক্তি-

লাভের অমোঘ উপায়। বলা বাহুল্য যে, একালেও বহু পীর-পন্থীর মনে এই বিশ্বাস অটুট। আলী রাজার কাব্যে গুরুবাদের সমর্থন করিয়া এক তত্ত্বসংকুল পরিবেশের সৃষ্টি হইয়াছে। তাঁহার কাব্যের স্থানে স্থানে সন্ধ্যাভাষার ব্যবহার লক্ষ্যণীয়। এই দিক্ দিয়া তিনি শেখ ফয়জুল্লাহ্ ও সৈয়দ সুলতানের সগোত্র।

"গোরক্ষ-বিজয়ে" আছে—

মহাদেব বলে, গৌরী, শুন সাবধান।
সংগীত পরম তত্ত্ব, কহি তোমা স্থান॥

এ-কথার প্রতিধ্বনি করিয়া "জ্ঞানসাগরে" বলা হইয়াছে—

নয় কোটি বার হোন্তে এক এক গান।
গীতের উপরে সিদ্ধি-পন্থ নাহি আন্॥
গান হোন্তে পূর্ণ ভক্ত প্রভু করতার।
সিদ্ধাকুল গান হোন্তে পায় সিদ্ধি সার॥

বৌদ্ধ সিদ্ধাগণের উত্তর-পুরুষ বাঙ্গলার বাউল-দল। তাঁহারা এই গীত-মার্গের মধ্য দিয়াই আত্মমুক্তির সহজ পথ সন্ধান করিয়া থাকেন। একালের এই বাউলদিগের শ্রেষ্ঠ হইতেছেন লালন শাহ্, ঈলাল শাহ্, ভানু শাহ, ভেলা শাহ্, শেখ মদন, তীনু ফকির, হাসন রাজা, পাগলা কানাই, শীতলাং শাহ্, ইব্রাহিম তস্না ইত্যাদি। লালন শাহের পূর্ব্বনাম লালনচন্দ্র রায়। তিনি নদীয়া জেলার কুমারখালি থানার অন্তর্গত ভাঁড়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। বসন্ত রোগে আক্রান্ত হইয়া তিনি গঙ্গাতীরে পরিত্যক্ত হন, তথা হইতে তাঁহাকে এক মুসলমান স্ত্রীলোক স্বগৃহে তুলিয়া আনিয়া সেবাশুশ্রূষা করিয়া রোগমুক্ত করেন। রোগমুক্তির পর লালন মুসলমান-ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং কুমারখালির নিকটবর্ত্তী হরিনারায়ণপুর-গ্রামবাসী সিরাজ শা নামক এক ফকিরের শিষ্য হইয়া অধ্যাত্মতত্ত্ব শিক্ষা করেন। তিনি কুষ্টিয়ার নিকটবর্ত্তী ছেওড়িয়া গ্রামের গভীর বনের মধ্যে এক আম্রবৃক্ষ-মূলে বসিয়া সাধনা করিয়াছিলেন। বহুলোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। তাঁহার রচিত আত্মতত্ত্ব ও দেহতত্ত্ব-বিষয়ক বহু গান বাউলদের নানা আখড়ায় গীত হইয়া

থাকে। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তাঁহার কতকগুলি গান সংগ্রহ করিয়া 'প্রবাসী' ও 'শান্তিনিকেতন' পত্রিকায় প্রকাশ করিয়াছিলেন।

ভারতীয় দার্শনিক সম্মেলনের সভাপতিরূপে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার অভিভাষণে শেখ মদন বাউলের "নিঠুর গরজী তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে"—গানটি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন। আত্মবিকাশের সহজ ধারা সম্বন্ধে মদন বাউল ওয়াকিবহাল ছিলেন, তাই বাঁধা-পথের দোহাই মানেন নাই। এই অবন্ধনপ্রিয়তা বাউল-ধর্ম্মের বৈশিষ্ট্য। মর্ম্মরসের অতলে ডুব দিয়াছিলেন বলিয়াই প্রচলিত মতের বিধি-বন্ধনের বিরুদ্ধে মদনের বেদনার্ত্ত মনের প্রতিবাদ হইয়াছিল এমন তীব্র—

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মসজেদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

পাগ্‌লা কানাইর গান ভাবের সূক্ষ্মতা ও অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় মদনের গানের তুল্য না হইলেও তাহার আবেদন উপেক্ষনীয় নহে। পাগ্‌লা কানাই যশোহর জেলার ঝিনাইদহ মহকুমার অন্তর্গত বেড়াবাড়ী গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি নিরক্ষর কৃষক ও জাতিতে মুসলমান ছিলেন; কিন্তু হিন্দু-মুসলমান-নির্ব্বিশেষে বহু লোক তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরীও পাগলা কানাইর মতই তত্ত্বরসিক ছিলেন। সুনামগঞ্জের জমিদার হিসাবে তাঁহার নাম সুবিদিত; অথচ তিনি হইয়াছিলেন নিঃসঙ্গতা-রসের রসিক। তাঁহার গানগুলিতে হিন্দু Pantheism-এর প্রভাব লক্ষ্যণীয়।

বাউল গান, মুর্শীদি গান, ভাটিয়ালী গান প্রভৃতি বহু প্রকার গান পল্লীগ্রামে আজও সুপ্রচলিত। বাউল গান ও মুর্শীদ্যা গানের মধ্যে বিশেষ পার্থক্য নাই। তবে সুফীচিত্তের আগ্নেয় অনুভূতি মারফতী গানের সুরে সঞ্চারিত করিয়াছে আশ্চর্য্য তীব্রতা। বাউল গানের কথায় আছে বৈরাগ্যভাবের স্ফূরণ,—তাহার সুরে আছে বৈরাগ্যের বিশিষ্ট ব্যঞ্জনা। পশ্চিম বাংলার নিদাঘদগ্ধ বিস্তীর্ণ প্রান্তরের পরিবেশে বাউল-গানের বিকাশ হইয়াছে বেশী; সেই জন্যই তাহার সুরে আছে তীক্ষ্ণ ঔদাসীন্য। সেখানকার দিগন্ত-প্রসারিত মাঠের ক্ষুদ্র তালপুকুরের তীর-

তরুচ্ছায়ায় রৌদ্র-ঝিমানো দ্বিপ্রহরে যে-উদাস সুরটি অনাহত বাজিতে থাকে, তাহাকেই গানে গানে বাঁধিয়া দিয়াছেন পল্লীর বাউল-কবি। পক্ষান্তরে, মুর্শীদ্যা গানে পূর্ব্ববঙ্গের ভাটিয়ালী গানের প্রভাব সুস্পষ্ট। মেঘ্‌না ও সুরমা নদীর তীরে তীরে হইয়াছে এই ভাটিয়ালী গানের বিকাশ। মন্দস্রোতা নদীর অলস টানে বহিয়া চলে ভাটিয়ালী গানের উদাস সুর-প্রবাহ। বাউল-কবি হইতেছেন প্রধানতঃ তাত্ত্বিকতা ও নিঃসঙ্গতার সাধক; কিন্তু ভাটিয়াল গানের কবি হইতেছেন সুখদুঃখ-পূর্ণ পৃথিবীর বিরহী মানুষদের অতি-আপনার জন।

ফকিরী গান ছাড়া পল্লীর মুসলমান কবিরা নানাপ্রকার বারমাস্যা, মেয়েলী গান, জলভরণের গান প্রভৃতি রচনা করিয়াছেন। মুর্জা হুসেন আলির রচিত কয়েকটি শ্যামা-সঙ্গীতও সংগৃহীত হইয়াছে। একটি উদ্ধৃত করি—

যা রে শমন এবার ফিরি'।<br>
এস না মোর আঙ্গিনাতে, দোহাই লাগে ত্রিপুরারি॥<br>
যদি কর জোর-জবরি,<br>
সামনে আছে জজ-কাছারি;<br>
আইনের মতো রসিদ দিব, জামিন দিব ত্রিপুরারি॥<br>
আমি তোমার কী ধার ধারি;<br>
শ্যামা মায়ের খাস তালুকে বসত করি।<br>
বলে মুর্জা হুসেন আলি,<br>
যা করে মা জয়কালী,<br>
পুণ্যের করে শূন্য দিয়ে, পাপ নিয়ে যাও নিলাম করি'॥

মুসলমান কবি-কর্ত্তৃক কালী-মাহাত্ম্য প্রচার দেখিয়া অধুনা অনেকে বিস্ময় প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু প্রাক্‌-ওহাবী যুগে হিন্দু-মুসলমান সংস্কৃতির সমন্বয় সাধনের উদ্দেশ্যে সত্যপীর, মাণিকপীর, কালুগাজী প্রমুখ "মিশ্র-দেবতার" সৃষ্টিও হইয়াছিল। এই মিশ্র-দেবতার দল—

হিন্দুর দেবতা হৈল, মুসলমানের পীর।<br>
দুই কুলে লয় সেবা হইয়া জাহির॥

মুন্সী আবদুল করিমের "কালুগাজী চম্পাবতী" পুঁথিতে আছে—

তিন ডাক দিল গাজী গঙ্গার উপর।
বাহিরে আইল গঙ্গা হরিষ-অন্তর ॥
বাহিরে আসিয়া গঙ্গা গাজীরে দেখিল।
'বাছা' 'বাছা' বলি' তা'রে কোলেতে লইল ॥

এই "বড় খাঁ গাজী" ব্যাঘ্রদেবতা হিসাবে এবং তদীয় ভ্রাতা কালু খাঁ কুম্ভীর-দেবতা হিসাবে সুন্দরবন-সন্নিহিত অঞ্চলে অদ্যাবধি পূজিত হইয়া থাকেন। বিশেষতঃ "গাজীর-গান" বাঙ্গলার সর্ব্বত্র প্রচলিত রহিয়াছে।

লৌকিক হিন্দুত্ব ও প্রচলিত ইসলামের সমন্বয়ে বাঙ্গলায় এক নূতন ধর্ম্মমত প্রতিষ্ঠার জন্য সুলতান হুসেন শাহের আমল হইতে চেষ্টা হইয়াছে। বাঙ্গলার মুসলমান-দল সম্ভবতঃ এই চেষ্টার বেশী বিরোধী ছিলেন না; তাই গঙ্গাস্তোত্র-রচয়িতা গাজী দরাফ খাঁ-ও করিয়াছিলেন তাঁহাদের শ্রদ্ধালাভ। "জঙ্গনামা" পুঁথির প্রারম্ভে আছে—

ত্রিবেণীর ঘাটেতে বন্দিনু দরাফ খান্।
গঙ্গা যাঁর ওজুর পানি করিত যোগান্ ॥

গুরুভক্তি, ভাবোন্মাদনা, তত্ত্বানুরাগ, ইহবিমুখতা প্রভৃতি নানা দিক্ দিয়া এদেশের হিন্দু-মুসলমানে বেশী পার্থক্য ছিল না। সেই ঐক্যের ক্ষেত্রে উভয় সম্প্রদায়ের মিশ্রণ সম্ভব করিতে গিয়া নানা কারণে শুধু ধর্ম্মীয় জঞ্জালই বৃদ্ধি পাইয়াছে। মিলনের শুভ ইচ্ছার সহিত মুক্তজ্ঞান সংযুক্ত হইলে তাহাতে এক শ্রীমণ্ডিত সংস্কৃতির সৃষ্টি হইতে পারিত। কিন্তু সেরূপ চেষ্টা হয় নাই।

পরিশেষে ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সমস্ত প্রকার অনৈসলামিক প্রভাব দূরীকরণের বার্ত্তা লইয়া বাঙ্গলায় ওহাবী আন্দোলনের বন্যা আসে; ওহাবী-নেতা সৈয়দ আহ্‌মদের আহ্বানে ভারতীয় মুসলমান-গণকে আদি ও অকৃত্রিম ( pure and primitive ) ইসলামে সঞ্জীবিত করার জন্য সঙ্ঘবদ্ধভাবে চেষ্টা চলে। "শহিদে কারবালা" পুঁথির প্রারম্ভভাগে আছে—

আগে জমানার বীছে নবাবী আমলে।
ইংরাজের আমল না ছিল যেই কালে ॥

সেই কালে বাজে লোক বাঙ্গলা দেশের।
ইস্‌লামী তরিকা না ছিল তাহাদের॥
শরা-শরীয়ৎ জারি অধিক না ছিল।
দেখাদেখি লোকে সব করিতে আছিল॥
জানিত না দ্বীন আর ইসলামী ঈমান।
মুখে খালি কলাইত সুন্নী-মুসলমান॥
খত্‌না করান আর গোরু-গোস্ত খেলে।
মুসলমান হবে ইহা বুঝেছিল দেলে॥
হিন্দুদের দেখে শুনে করিত সে কাম।
শেরেক্‌ বেদাতে ছিল ভরিয়া তামাম্‌॥···
হেনকালে আল্লা-পাক্‌ দয়াল খোদায়।
মোজাদ্দেদ পাঠাইয়া দিল বাঙ্গালায়॥
সৈয়দ আহমদ শাহে মোজাদ্দেদ করি'।
মিটাইল বাঙ্গালার শেরেক্‌ কুফরী॥

উক্ত সৈয়দ আহ্‌মদ শাহের আবির্ভাব হইতেই বাঙ্গলার মুসলমান-পল্লীতে কোরানের প্রকৃত শিক্ষা প্রচারিত হইতে থাকে, লৌকিক ধর্ম্মের প্রভাব ধীরে ধীরে প্রশমিত হয়। জনাব আলি প্রমুখ পুঁথিকারগণ বাউল-ফকিরদের 'মাথায় লাঠি' মারিতে নির্দ্দেশ দেন; ইসলাম-প্রচারকগণ "বাউলধ্বংস-ফতোয়া" প্রচার করিতে থাকেন এবং ওহাবী-হানাফীর বিতর্কে বাঙ্গলার শান্ত পল্লী মুখরিত হইয়া ওঠে। সেই ঘুর্ণ্যাবর্ত্তে মুসলমান জনসাধারণ দিশেহারা হইয়া যায়; তাহাদের সমস্ত সুকুমার বৃত্তি শুষ্কপ্রায় হইয়া ওঠে।

* * *

এই পরিবর্ত্তনের দিনে সমস্ত হট্টগোল হইতে নিজেদের বিমুক্ত রাখিয়া মুসলমান গাথা-রচয়িতাগণ আনন্দের নিত্য সামগ্রী পল্লীবাসীদের পরিবেশন করিয়াছেন।* সৃজনী প্রতিভার অপক্ষপাত ধ্যানদৃষ্টি লইয়া পল্লীকবি মনসুর বয়াতি রচনা করেন "দেওয়ান-মদিনা।" ফরাসী

* মুসলমানী পুঁথি-সাহিত্যের সহিত এদেশের মাটির সম্পর্ক নাই বলিলেও চলে; কিন্তু গাথা-রচয়িতাগণ এদেশের মাটির সন্তান।

মনীষী রোমাঁ রোলাঁ এই গাথা-কাব্যটির "অজস্র প্রশংসাবাদ" করিয়াছেন। এই পালা-গানটিতে যে-আন্তরিকতা বাণীমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে তাহার তুলনা বাঙ্গলা কাব্যে বেশী নাই। দেওয়ান দুলাল যখন আভিজাত্যের খাতিরে সহধর্ম্মিণী মদিনাকে অকারণে বর্জ্জন করিলেন, তখন কৃষক-কন্যা মদিনা অশ্রুধারে বিনাইয়া বিলাপ করিতেছে—

লক্ষ্মী না আঘন মাসে ধানের বাওয়া মাড়ি।
খসম মোর আনে ধান আমি নাড়ি চাড়ি॥
দুইজনে বইস্যা পরে ধানে দেই উনা।
টাইল-ভরা ধান খাই, করি বেচা-কেনা॥
হায় রে পরাণের খসম, এমন করিয়া।
কোন্ বা পরাণে রৈলা আমারে ছাড়িয়া॥
হুক্কায় পুরিয়া পানি তামাক ভরিয়া।
খসমের লাগি' থাকি পন্থ পানে চাহিয়া॥
হায় রে দারুণ আল্লা, যদি এই আছিল মনে।
কেন বা নিদয়া হৈলে দেখাইয়া জীবনে॥
আমার মতন নাই রে আর অভাগিনী।
ভরা-ক্ষেতের মধ্যে আমার কে দিল আগুনি॥
কোন্ বা পরাণে আমি থাকবাম বাঁচিয়া।
মন-পক্ষী মোর উইড়া গেছে, রৈছে মাত্র কায়া॥

মদিনার মৃত্যুর পর অনুতপ্ত দুলাল কাতরভাবে মদীনার কবরের উপর বুক পাতিয়া অনুশোচনা করিতেছে—

পরাণের মদিনা বিবি, উঠ্যা কও কথা।
আর না দিবাম আমি তোমার দীলে ব্যথা॥
কোন্ বা বিপাকে পইড়া কইরা হেন কাজ।
তোমার কাছে পাইলাম আমি বড় লাজ॥
আইস রে পরাণের বিবি কবর ছাড়িয়া।
কথা কও মোর পানে একবার ফিরিয়া॥
তোমারে ছাড়িয়া কও কোন্ পরাণে থাকি
আমার কষ্টের আর কিবা আছে বাকী॥

আর না যাইব আমি বান্যাচঙ্গ সহরে।
এইখানে থাকবাম আমি পড়িয়া কবরে॥
ফকির আছিলাম আগে, হৈলাম ফকির
মদীনার লাগ্যা আমার বুক হৈল চিড়॥

* * *

পল্লীর মুসলমান কবিগণ অনবদ্য সাহিত্য সৃষ্টিতে আত্মনিবিষ্ট থাকিলেও ওহাবী-দলের আহ্বানে ইংরেজী-শিক্ষিত সাহিত্যিকেরা সচেতন হইয়া উঠিলেন। বাঙ্গালী মুসলমানের রাষ্ট্রিক, আর্থিক ও নৈতিক দুর্গতির বিষয় চিন্তা করিয়া তাঁহারা সমাজকে পবিত্র ইস্‌লামের আদর্শে উদ্বুদ্ধ করিতে প্রয়াস পাইলেন। "ওঠো, জাগো, হায় মুস্‌লিম! হায় ইস্‌লাম!" প্রভৃতি অনুশোচনা ও উত্তেজনার বাণীতে তাঁহাদের কবিকণ্ঠ মুখরিত হইয়া উঠিল। এই পুনরুজ্জীবনের যুগে কবিদল গাহিলেন—

( ১ ) জয় এসলামের জয়, সত্য-ধর্ম্ম জয়;
পৌত্তলিক পুতুলের বুঝি নাশ হয়!
—( মীর মশাররফ হোসেন )

( ২ ) গাও রে মোস্‌লেমগণ, নবী-গুণ গাও রে।
পরাণ ভরিয়া সবে সাল্লে-আলা গাও রে॥
—( মুন্সী মোহাম্মদ মেহেরুল্লাহ্ )

( ৩) ডুবিল ইসলাম-তরী অকুল পাথারে, হায়!
তুমি বিনে কে রক্ষিবে? কর প্রভু সদুপায়॥
—( মুন্সী মোহম্মদ রেয়াজুদ্দীন আহ্‌মদ )

( ৪ ) অই হের মক্কা-মদিনায় সেই পবিত্র গৌরব,
অই শোন মোস্‌লেমের সুধাকণ্ঠে সুধা-স্নিগ্ধ-রব।
—( কয়েকোবাদ, অশ্রুমালা )

( ৫ ) থাকুক যেরূপে বিশ্বে যেথা মুসলমান,
ভিন্ন ভাব মাত্র নাই, সকলেই ভাই ভাই,
একই ভাবে সকলের ধর্ম্মের সাধনা;
একই ধর্ম্মক্ষেত্রে গতি, একই প্রেরণা।
—( মোজাম্মেল হক্; জাতীয় ফোয়ারা )

(৬) এক আল্লা, এক নবী, একই কোরাণ,
এক আশা, এক লক্ষ্য, এক উপাসনা,
এক আত্মা, এক ভাব, একই সমাজ…
আহা! কি যথার্থ তত্ত্ব!…সরল উদার।
—(এস্‌মাইল হোসেন; মহাশিক্ষা কাব্য)

এই সময়কার মুস্‌লিম-রচিত বাঙ্গলা কাব্যে সৌন্দর্য্যসৃষ্টি অপেক্ষা এ-ধরণের প্রচার-প্রচেষ্টাই হইয়াছে সমধিক। মহাকবি কায়কোবাদের "মহাশ্মশান-কাব্য" একমাত্র ব্যতিক্রম। শিল্পী-জনোচিত নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তিনি সৌন্দর্য্যের দিব্যাঞ্জন পরিয়া জগৎ ও জীবনের দিকে তাকাইয়াছেন। তাই তাঁহার রূপসৃষ্টি হইয়াছে মনোমুগ্ধকর—

বাঁধিলা কবরী
উঠাইয়া ভুজদ্বয়, বাঁকিয়া পশ্চাতে
অনঙ্গের ধনুপ্রায়,—দু'টি পুষ্পকলি
শোভিল সে মনোহর অনঙ্গ-ধনুকে
দু'টি সুবর্ণের শর নয়ন-রঞ্জন।
দু'টি সুবর্ণের কর, কমলিনী-প্রায়
শোভিল সে মনোহর কবরী-কুসুমে
ভাবুক-প্রেমিক-প্রাণ করিয়া হরণ।

মধুসূদন-প্রবর্ত্তিত অমিত্রাক্ষর ছন্দে এই কাব্যখানি বিরচিত। তবে মহাকাব্য (epic) অপেক্ষা গীতি-কবিতার (lyrics) উপাদানই ইহাতে অধিক; মধুর ভাবকল্পনা ও সুস্নিগ্ধ সৌন্দর্য্যদৃষ্টিই ইহার বৈশিষ্ট্য। প্রকৃতির সৌন্দর্য্য-বর্ণনাতেও কবি সমান সিদ্ধহস্ত—

সুগভীর তমস্বিনী, সুনীল গগনে
অসংখ্য তারকা-রাজি শোভিছে সুন্দর
হৈম-বেশে; যেন নীল পয়োধির জলে
ভাসিছে কনক পদ্ম, অথবা ত্রিদিবে
উজ্জ্বল প্রদীপ-রাজি জ্বলিছে সুন্দর
ঘরে ঘরে স্ফটিকের স্বচ্ছ দীপাধারে।

কায়কোবাদ রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িক কবি; অথচ রবীন্দ্রনাথের

কিছুমাত্র প্রভাব কায়কোবাদের কবিতায় দৃষ্ট হয় না। রবীন্দ্র-যুগের প্রসিদ্ধনামা মুসলমান-কবি হইতেছেন গোলাম মোস্তফা, শাহাদৎ হোসেন, হুমায়ুন কবির, বন্দে আলি, সুফিয়া খাতুন ইত্যাদি। গোলাম মোস্তফার কবিতার লিরিকেল্ উপাদান এবং শাহাদৎ হোসেনের কবিতায় ক্লাসিকেল্ উপাদান আমাদের পরম আনন্দের সামগ্রী।

* * * *

স্বনামধন্য কাজী নজরুল ইস্‌লাম রবীন্দ্র-যুগের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মুসলমান কবি। তাঁহার শ্রেষ্ঠ পরিচয় এই যে, তিনি বাঙলার প্রথম জাতীয় গণতান্ত্রিক কবি। বাঙ্গালী মুসলমানদের দৃষ্টিতে তিনি যেমন একদিকে তরুণ মুসলিমের প্রতিনিধি-স্থানীয় কবি, অন্যদিকে তেমনই মুসলিম বঙ্গের প্রাচীন সাহিত্যধারা ও ঐতিহ্যের যোগ্যতম উত্তরাধিকারী। নজরুলের আবির্ভাবে বাঙ্গলা-সাহিত্যের মুসলিম-ধারার প্রতি বৃহত্তর দেশের কুতূহলী দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়াছে।

আমাদের প্রাচীন সাহিত্যে রহিয়াছে প্রধানতঃ অদ্ভুত তত্ত্ব আর বাক্‌কৌশল। নজরুলের রচনাতেই আমরা প্রথম পাইলাম জীবনের পরম আস্বাদ। 'সওগাতে' প্রকাশিত "বাউণ্ডেলের আত্মকাহিনী"র মধ্যে তাঁহার শক্তির প্রথম স্ফূরণ দেখা যায়। ইহার প্রায় তিন বৎসর পর তাঁহার কয়েকটি ছোট গল্প ও কবিতা প্রকাশিত হয়; করাচীর সেনানিবাসে সেগুলির জন্ম। সহজ সৌন্দর্য্যদৃষ্টি ও প্রাঞ্জল প্রকাশভঙ্গী সেই গল্পগুলির বিশেষত্ব। সে-সমস্ত রচনায় বাক্‌চাতুরী নাই, তত্ত্বান্বেষী মানস-কণ্ডুয়ণ নাই,—আছে জীবনের সহজ অনুভূতির স্বচ্ছন্দ প্রকাশ। সাহিত্য জীবন-বিটপির পুষ্প,—নজরুল-সাহিত্যের সুরভি আস্বাদন করিয়া বাঙ্গলার শিক্ষিত মুসলমান এই সত্য বিশেষভাবে উপলব্ধি করিয়াছে।

বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে নজরুল যখন কলিকাতায় আসেন, তখন খেলাফৎ-আন্দোলনের বেগ খুবই প্রবল। সেই আন্দোলনের প্রতিক্রিয়া তাঁহার মনে পূর্ণভাবেই কার্য্যকরী হইয়াছিল। সেকালের বহু চিন্তাশীল মুসলমানের মতন নজরুলও তাই প্যান-ইস্‌লামের স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন। সেই দৃষ্টিভঙ্গী তাঁহার বহু রচনায় সুস্পষ্ট। সুবিখ্যাত "সুব্‌হ্-উম্মেদ্" কবিতায় আছে:

জাগিল আবার ইরাণ তুরাণ মরক্কো আফগান মেসের,—
সর্ব্বনাশের পরে পৌষ মাস এলো কি আবার ইসলামের।

কিন্তু এই জাগরণের মূলে রহিয়াছে কোন্ জীবন-মন্ত্র, তাহা দেখা দরকার। মুসলিম রাষ্ট্রগুলির সার্ব্বভৌমিকত্ব রক্ষার জন্য উদ্দীপনা দেখিয়াই কবি আনন্দে নৃত্য করিয়া উঠিয়াছেন। অবশ্য একথা সত্য যে, খেলাফৎ-যুগের বিশিষ্ট আবহাওয়ায় নজরুলের আবির্ভাব হইলেও খেলাফৎ-পরবর্ত্তী যুগের চিন্তাসম্পদই তাঁহার রচিত সাহিত্যের প্রধান উপজীব্য। কামাল পাশার স্মার্ণা উদ্ধারের সংবাদে উৎফুল্ল হইয়া আমাদের কবি আনন্দের আবেগে যে-স্মরণীয় কবিতাটি লিখিয়াছিলেন, তাহাতে আছে :

ও কে আসে? আনোয়ার ভাই?—
আনোয়ার ভাই, জানোয়ার সব সাফ্।
জোর নাচো ভাই, হর্দ্দম দাও লাফ্।
আজ জানোয়ার সব সাফ্।

প্যান-ইসলাম তত্ত্বের সাধক আনোয়ার পাশার সঙ্গে সাধারণতন্ত্রের সমর্থক কামাল-পাশার বিরোধ ইতিহাস-পাঠকের অজানা নাই। কিন্তু আমাদের কবি এই দুই বীরকেই অভিনন্দন জ্ঞাপন করিয়াছেন। কোনো সুনির্দ্দিষ্ট আদর্শবাদের জন্য নয়, যৌবনের উদ্দামতা দেখিয়াই তাঁহার কণ্ঠে জাগিয়াছে আনন্দ-গীতি। তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন :

বেজেছে নাকাড়া, হাঁকে নকীবের তূর্য্য ;
হুশিয়ার ইস্লাম, ডুবে তব সূর্য্য।

মুসলিম রাষ্ট্রগুলির বিলোপে হইবে ইস্লামের মতন এক চিরন্তনী আদর্শের পতন, এই চিন্তার মধ্যে দুর্ব্বলতা আছে কি না বিবেচ্য। শক্তিমন্ত ও বিচারশীল মানুষ হিসাবে মুসলমানের প্রতিষ্ঠাতেই ইস্লামের সার্থকতা,—এই কথা কামাল-ভক্ত কবি নিশ্চয়ই জানেন। খেলাফৎ-পরবর্ত্তী বাঙ্গালা-সাহিত্যে কামাল-পন্থীদের প্রভাব সামান্য হইলেও লক্ষ্যযোগ্য। ধর্ম্মসঙ্ঘের প্রয়োজনীয়তা ও ধর্ম্মাচারের অনুশাসন অস্বীকার, বিচারবুদ্ধির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা, আধুনিক জীবন ও জগতের প্রতি কুতূহলী দৃষ্টি, এ-সমস্তকে সমর্থন করিয়া বঙ্গদেশে যে-আন্দোলন

প্রবর্ত্তিত হয়, নজরুল তাহার অন্যতম প্রধান অধিনায়ক। অবশ্য এ-সম্পর্কে তাঁহার বাণীতে যথেষ্ট তীক্ষ্ণতা নাই। তবে প্রশংসার বিষয় যে, নিগৃহীত মুসলমানের মুক্তির জন্য ধর্ম্মনেতা অপেক্ষা তিনি রাষ্ট্রবীরের আবির্ভাবই অধিকতর কাম্য মনে করিয়াছেন :

খালেদ ! খালেদ !
খোদার হবিব বলিয়া গেছেন, আসিবেন ঈসা ফের ;
চাহিনা মেহ্‌দী, তুমি এস বীর হাতে নিয়ে শমশের !!

কিন্তু তাঁহার এ-ধরণের কবিতায় বীর্য্যবত্তার প্রকাশ অপেক্ষা বেশী রহিয়াছে তাঁহার চতুষ্পার্শ্বের মানুষের দুরবস্থার জন্য বেদনাবোধ। সেই দুর্গতির ছবি ফুটাইতে গিয়া স্থানে স্থানে তাঁহার নভোবিহারী কবি-কল্পনা মর্ত্ত্যের ধূলিকর্দ্দমে ম্লান না হইয়া পারে নাই। নমুনা দেখুন—

(১) রীশ্-ই-বুলন্দ, শেরওয়ানী চোগা, তস্‌বী ও টুপী ছাড়া
পড়ে না ক কিছু, মুসলিম-গাছ ধরে' যত দাও নাড়া।
(২) শুনে হাসি পায় ইহাদেরও না কি আছে গো ধর্ম্ম জাতি,
রামছাগল আর ব্রহ্মছাগল আরেক ছাগল পাঁতি।

আমাদের পঙ্গুতার জন্য অতিরিক্ত উদ্‌ব্যস্ততার ফলেই হয়ত তাঁহার বহু কবিতার গঠন যথেষ্ট আঁটসাট ও সুঠাম হইতে পারে নাই। কাব্যের গঠন-রূপে এই শৈথিল্যের জন্য তাঁহার বহু রচনাই দূর-কালের পাঠকদের রসতৃষ্ণা হয়ত পুরোপুরি মিটাইতে সমর্থ হইবে না। কিন্তু তিনি যুগ-প্রয়োজন মিটাইতে কার্পণ্য করেন নাই। তিনি নিজেকে বলিয়াছেন "বর্ত্তমানের কবি", Posterityর জন্য পরোয়া করেন নাই,—সর্ব্বান্তঃকরণে কামনা করিয়াছেন আমাদের অধঃপতিত জীবনের শ্রীবৃদ্ধি।

মানুষের আত্মবোধ জাগ্রত হোক্, পরমসত্তা সম্বন্ধে সে সচেতন হোক্, সর্ব্বপ্রকার ভ্রূকুটীকে অগ্রাহ্য করিয়া সমাজ-সাম্যের প্রতিষ্ঠা করুক,—ইহাই কবির কাম্য। যে দুরন্তের দল সকল বন্ধন অস্বীকার করিয়া মহাজীবনের আকর্ষণে ছুটিয়া চলিয়াছে, তিনি প্রাণ ভরিয়া তাঁহাদেরই জয়গান গাহিয়াছেন। এই জরা-মরার দেশে কবি গাহিয়াছেন উদ্দাম যৌবনের গান, পথের সঠিক সন্ধান দিতে না পারিলেও পথের বাহির

হইবার জন্য আমাদের জানাইয়াছেন উদাত্ত আহ্বান। অপূর্ব্ব উন্মাদনা লইয়া অহোরাত্র করিয়াছেন যৌবনের বন্দনা-গীতি রচনা।

অনেকের মতে, নজরুল বিপ্লবী-কবি। তিনি বাঙলা ভাষায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সংখ্যক বৈপ্লবিক কবিতা রচনা করিয়াছেন। এই জীবনবাদী কবির রচনায় বিপ্লবসৃষ্টির আকাঙ্খাও প্রকাশ পাইয়াছে :

আমি যুগে যুগে আসি, আসিয়াছি পুনঃ মহাবিপ্লব-হেতু,
স্রষ্টার শনি মহাকাল ধূমকেতু।

তিনি কবি-কল্পনায় বিপ্লব-লীলা দেখিয়াছেন। তাহাতে উন্মাদনা আছে, কিন্তু সুস্পষ্ট পথনির্দ্দেশ নাই। তবে দেশের জন্য আনন্দের সংবাদ এই যে, বাঙালী মুসলমানদিগের মধ্যে তাঁহারই কণ্ঠে প্রথম ধ্বনিত হইয়াছে স্বাজাত্যবোধের উদাত্ত সুর। দেশের মাটী ও মানুষের দিকে তিনিই প্রথম চাহিয়াছেন সচেতন প্রেমের দৃষ্টিতে, পারিপার্শ্বিক মানুষের সুখ-দুঃখ আশা-আকাঙ্খা তাঁহার বাণীতে করিয়াছে রস-মূর্ত্তিলাভ। তাঁহার দেশবাসীর বীরত্ব ও ভীরুতার বিষয় তিনি সম্যক্ অবগত আছেন বলিয়াই বিপ্লব-মহিমা প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে বলিয়াছেন :

ধ্বংস দেখে' ভয় কেন তোর? প্রলয় নূতন-সৃজন-বেদন!
আসছে নবীন, জীবন-হারা অসুন্দরে করতে ছেদন।

এই অসুন্দর জীবন-ব্যবস্থার বিলোপ করিয়া তিনি চাহিয়াছেন নব-সমাজ প্রতিষ্ঠা। তাঁহার কবি-কল্পনায় ধরা দিয়াছে নব-জীবনের ছবি। কবির আকাঙ্খিত নব্য-সমাজ হইবে অক্ষয় যৌবনের দেশ, অবাধ মুক্তির ক্ষেত্র—

যুবা-যুবতীর সে-দেশে ভিড়,
সেথা যেতে নারে বুঢ্ঢা পীর,
শাস্ত্র-শকুন জ্ঞান-মজুর
যেতে নারে সেই হুর-পরীর
শরাব-সাকীর গুলিস্তাঁয়।
আয় বেহেস্তে কে যাবি আয়॥

নজরুলের এ-ধরণের কবিতায়ও উদ্দীপনার প্রকাশ অপেক্ষা সৌন্দর্য্য-বর্ণনা প্রবলতর। তাঁহার বীররসের কবিতা "বিদ্রোহী"তে আছে :

আমি দেবশিশু, আমি চঞ্চল,
আমি ধৃষ্ট, আমি দাঁত দিয়া ছিঁড়ি বিশ্বমায়ের অঞ্চল !
আমি অর্ফিয়াসের বাঁশরী,
মহা- সিন্ধু উতলা ঘুম্‌ঘুম্‌
ঘুম চুম্‌ দিয়ে করে নিখিল বিশ্বে নিঝ্‌ঝুম্‌
মম বাঁশরীর তানে পাশরি'।
আমি শ্যামের হাতের বাঁশরী।

এই 'বিদ্রোহ' শ্রীকৃষ্ণের লীলাচাঞ্চল্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। তিনি একদিকে যেমন বলিয়াছেন "মানি না কো কোনো আইন", অন্যদিকে তেমনই "গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি"র মায়ায় ধরা দিয়াছেন। তাঁহার "আলেয়া"নাটকের সুন্দরীরা গাহিতেছে :

যৌবন-তটিনী ছুটে চলে ছলছল।
ধরণীর তরণী টলমল টলমল॥

এই যৌবনবেগে কিন্তু সৌন্দর্য্যই চতুর্দ্দিকে উচ্ছ্রিত হইয়া পড়িতেছে। তাঁহার "বাঁধনহারা" উপন্যাসে 'সাহসিকা'র এক পত্রে যে-বিদ্রোহিতার আভাষ আছে, পরবর্ত্তীকালে "বিদ্রোহী" কবিতায় তাহারই পূর্ণবিকাশ দেখা যায়। কিন্তু এই "বাঁধনহারা" উপন্যাসের মূলে রহিয়াছে তরুণ প্রেমের ব্যর্থতা। তিনি "সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে" দেখিয়াছেন একদিকে :

ধূমকেতু আর উল্কাতে
চায় সৃষ্টিটাকে উল্টাতে

অন্যদিকে :

কপট কোপের তূণ ধরি'
ঐ আসে যত সুন্দরী।

প্রধানতঃ নারীপ্রেমের প্রেরণা হইতেই তাঁহার বিদ্রোহ-ভাবের জন্ম; তাই পরিণামে সেই দৈবী-প্রতিভার প্রকাশ হইয়াছে প্রেমের কবিতা, বিশেষতঃ সঙ্গীত রচনায়।

নজরুল ইস্‌লামের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবিতা "বিদ্রোহী"তে একালের মানুষের বিদ্রোহের বাণী রূপায়িত হইয়া উঠিয়াছে, বলা হইয়া থাকে। কিন্তু লক্ষ্যের বিষয় যে, এ-কবিতা মুক্তক-মাত্রিক ছন্দে রচিত। অক্ষরবৃত্ত

ছন্দই বিপুল ভাবের ভার বহন করিয়া চলিতে পারে ; সে-ছন্দের গতি মন্থর হইলেও তাহা বীররস-প্রকাশের সম্পূর্ণ উপযোগী। পক্ষান্তরে হৃদয়-তন্ত্রীর সূক্ষ্ম সুরগুলি উত্তমরূপে প্রকাশ করা চলে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে। এই ধ্বনিমাত্রিক ছন্দে "বিদ্রোহী" বিরচিত; তাই বীররসের অবসরে তাহাতে প্রকাশ পাইয়াছে চটুলতা :

গোপন প্রিয়ার চকিত চাহনি, ছল করে'-দেখা অনুখন,—
চপল মেয়ের ভালবাসা, তা'র কাঁকণ চুড়ির কন্‌কন্‌।

"বিদ্রোহী" কবিতার মধ্যে দেখা গিয়াছিল যে 'লিরিক্' উপাদান, তাহাই তাঁহার পরবর্ত্তীকালের রচনায় প্রবলতর হইয়া ওঠে।

* * *

এ-কথা উল্লেখ করা নিষ্প্রয়োজন যে, মীর মশার্‌রফ হোসেন হইতে শাহাদৎ হোসেন পর্য্যন্ত আমাদের সাহিত্যের **Transition Period**, পরিবর্ত্তন যুগ। অতঃপর কাজী নজরুলের আবির্ভাব কাজী দৌলতের মতই বিস্ময়কর। কিন্তু এই অপূর্ব্ব প্রাণবান কবিও, অসাধারণ প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, সমাজবোধের নূতন প্রেরণায় সাহিত্যের রূপ পরিবর্ত্তন করিতে সক্ষম হইলেন না! পরিবর্ত্তন-যুগের মুসলমান-কবিরা মধু-হেম-নবীনের অনুভাবে কাব্যানুশীলন করেন ; আর খেলাফৎ-পরবর্ত্তী যুগের কবিরা রবীন্দ্রনাথ-সত্যেন্দ্রনাথ-মোহিতলালের প্রভাব এড়াইতে অসমর্থ হন। নজরুলে যেটুকু স্বকীয়তা সম্ভব হইয়াছে, সেটুকুর জন্যই তিনি স্মরণীয় ও বরণীয়।

নজরুলের আবির্ভাবের অনতিকাল পরেই জসীমউদ্‌দীন, বন্দেআলি মিয়া, হুমায়ুন কবির ও সুফিয়া খাতুন বৃহত্তর দেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পল্লীর গাথা-রচয়িতাদের প্রভাব জসীমউদ্‌দীনের রচনায় অল্প নহে, তবু নজরুলের মতনই তিনি সৃষ্টিধর্ম্মী কবি। তাঁহার "নক্সী কাঁথার মাঠ" ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ায় তিনি আন্তর্জ্জাতিক খ্যাতির অধিকারী হইয়াছেন। এ-সময়ের স্বল্পখ্যাতিমান কবিদের (minor poets) মধ্যে মোতাহের হোসেন চৌধুরী, ফজলুর রহমান চৌধুরী, এরুশিয়ুর রেজা চৌধুরী, দিদারুল আলম, মীর ফজলে আলী, কাজী কাদের নওয়াজ, খান মোহম্মদ মঈনুদ্দীন, মোহাম্মদ হোসেন, মোহাম্মদ

ওয়াজেদ আলী, এ হাদী, মাহমুদা খাতুন সিদ্দিকা, সাজেদা খাতুন ও মোতাহেরা বানু প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

নজরুল ইস্‌লামের মতন দেশের জনজীবন ও রাজনীতির সহিত সাক্ষাৎ সংযোগ রাখিয়া মহীউদ্‌দীন, বেনজীর আহমদ, ফজলুর রহমান ও আশরফ আলী খান্ অতঃপর কাব্য-চর্চ্চায় অগ্রসর হন। মহীউদ্‌দীনের 'পথের গান', বেনজীর আহমদের 'বন্দীর বাঁশী' ও আশরাফ আলীর 'কঙ্কাল' পাঠকদের প্রশংসা অর্জ্জন করিয়াছে। পরিতাপের বিষয়, ইংরেজ কবি টমাস্ চেটারটনের ( ১৭৫২-৭০ ) মতো আশরাফ আলী অল্প বয়সে দারিদ্র্যের জ্বালায় বিষ খাইয়া আত্মহত্যা করেন। সমাজ-বৈষম্যের ছবি ও নিপীড়িত মানবতার বেদনা তাঁহার অন্তিমকালের রচনায় দীপ্যমান—

ভাবিছেন নেতা মহাশয়
অবলা-আশ্রম পিছে শূন্য পড়ে' রয়,
মহৎ উদ্দেশ্যে তাই খাটে দিবারাত—
মানুষেরে করিতেছে উৎপীড়িত অবলা অনাথ।

তাঁহার "চিরন্তনী প্রিয়া" শীর্ষক কবিতায়ও সামাজিক অবিচারের বিরুদ্ধে প্রকাশ পাইয়াছে এমন শ্লেষ ও আক্রোশ। তাঁহার রচনা উদ্দেশ্যমূলক, অতএব তাহাতে কাব্য-সৌন্দর্য্যের অপূর্ণতা স্বাভাবিক।

নজরুল ইস্‌লাম ছাড়া বাঙলা ভাষায় আর যাঁহারা বৈপ্লবিক কবিতা লিখিয়াছেন, মহীউদ্‌দীন তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাগ্রগণ্য। ভবিষ্যৎ সমাজরূপের ছায়া তাঁহার চিত্তে স্পষ্টরূপে প্রতিফলিত হইয়াছে; তাহারই প্রতিক্রিয়ায় তিনি কাব্যবীণায় নূতন সুর যোজনা করিয়াছেন। প্রচুর ভাবপ্রবণতা সত্বেও সেজন্যই তিনি পুরোপুরি ব্যক্তিকেন্দ্রিক হইতে পারেন নাই। জীবন-নীতির নিয়ামক হইতেছে সমাজের অর্থনীতিক সংগঠন, তাহার আমূল সংস্কার তিনি কামনা করিয়াছেন—

করো সাম্য শান্তির স্থাপনা।
পৃথিবীর মানুষের লাগি'
সৃষ্টি করো একটি সমাজ,
এক ধর্ম্ম, এক জাতি, একটি জীবন।

সে-জীবনে সমস্ত মানুষ আর
সমস্ত সমাজ লভিবে বিকাশ।
হে শ্রমিক, হে কৃষক, বিশ্বজনগণ!
আমার সূর্য্যের পথে দাঁড়াও, দাঁড়াও!
পৃথিবীর কঙ্করের বুকে
আবার আগ্নেয়গিরি জ্বালো।

তাঁহার এই উদ্দীপনার মূলে রহিয়াছে নূতন সমাজ-চেতনা। কিন্তু লক্ষিতব্য যে, তৎসত্ত্বেও তাঁহার আঙ্গিকের রূপান্তর হয় নাই। কাব্যকে তিনি হয়ত কর্ম্মের সহায়স্বরূপ ভাবিয়াছেন, অথবা কর্ম্মের আহ্বানে তাঁহার ধ্যানী-মনের প্রশান্তি প্রায়শঃ পর্য্যুদস্ত হইয়াছে; সেজন্যই তাঁহার রচনার রস-প্রকাশ সর্ব্বত্র সুঠাম হইতে পারে নাই। তাঁহার মনোমেঘে রহিয়াছে রোমান্টিক বিদ্যুৎ-কণা, কিন্তু অবচেতনিক অভিজ্ঞতা সুগভীর নয় বলিয়া তাহার অভিব্যক্তি সর্ব্বত্র সুন্দর ও স্বতঃস্ফূর্ত্ত হয় নাই। অধিকন্তু হইয়াছে অযত্নলাঞ্ছিত। মহীউদ্দীন পুরোপুরি সামাজিক নন, খানিকটা আত্মকেন্দ্রিকও। তাঁহার ব্যক্তি-মানস মাঝে মাঝে পাড়ি দিতে চায় ভাবের রহস্যলোকে :

ওগো বধূ! ওগো অচেনা গাঁয়ের বধূ!
যেথায় সুদূর নীল ছায়াপথ,
অসীম ব্যাপিয়া তারার জগৎ,
আমার মাটীর ভঙ্গুর রথ
কোন পথে বলো যাবে সে-দেশে?

জগৎ-রহস্যের পশ্চাতে রহিয়াছে কাহার অদৃশ্যলীলা, তাহা আবিষ্কারের জন্য তাঁহার অবচেতন মন মাঝে মাঝে কর্ম্মের অবসরে উন্মুখ হইয়া ওঠে।

বেনজীর আহমদ নিভাঁজ রোমান্টিক। তাঁহার "ময়ূরপঙ্খী নাইয়া", "দাঁড় বাইয়া যাও রে মাঝি," "নয়া পানির ঢেউ লাগে ভাই," "ময়না পাখী," "পূবালী" প্রভৃতি ভাটিয়ালী গানগুলি পড়িলেও তাঁহার মনের এই ছাঁচ চেনা যায়। তবে মলিন মর্ত্ত্যের ধূলিধ্বজা তাঁহার কল্পলোককে আচ্ছন্ন করিয়া বারবার দুলিয়া উঠে। বৈষম্য-পীড়িত

সমাজের প্রতি চাহিয়া তিনি বুঝিতে পারেন, কেমন করিয়া চিরদিন অভিজাতশ্রেণীর আনন্দ-রসের যোগান হয় :

'নিগ্রো'রা বারে বারে ফিরে আসে,
পৃথিবী-জোড়া অগ্নিলীলা না হ'লে
তা'দের বাঁশী বাজে কেমন ক'রে।

কিন্তু কিরূপে এই 'নিগ্রো'দের চিরতিরোভাব হইবে? 'স্বর্গের দেবতা'র স্থান গ্রহণ করিয়াছে আজ বিজ্ঞানবুদ্ধি—এ-বিষয়ে নিঃসংশয় হইতে পারিতেছেন না বলিয়াই বেনজীরের মানসিক স্থৈর্য্যলাভ তেমন ঘটিতেছে না।

ফজলুর রহমানের "ইমারত-ভিতে মাটির কাঁদন শুনেছ কি কোনদিন", "ঘুমের ঘোরে তাজমহলের স্বপ্ন দেখি,"—এই দুইটি কবিতায় সমাজ-তান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গী বেশ স্পষ্ট। কিন্তু উপলব্ধি তেমন গভীর নয় বলিয়া তাঁহার বাণী আশানুরূপ শাণিত হয় নাই। তাঁহার "রিকশওয়ালা" কবিতাটি অনেকের প্রশংসা লাভ করিয়াছে। কিন্তু সেই কবিতাটিতে কুলে 'নিগ্রো'-বৃত্তি যেভাবে প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা মার্ক্সবাদীরা ক্ষমা করিবেন না। নিপীড়িত মানবাত্মার প্রতি তাঁহার সহানুভূতি হয়ত মানসিক বিলাস; শেষ পর্য্যন্ত তিনি আনন্দ-রসের রসিক।

মোয়াহেদ বখ্ত্ চৌধুরী, ইমাউল হক্, কামালউদ্দীন খান্, এ এফ এম আবদুল হক্, ওহীদুল আলম, আজহারুল ইস্‌লাম, মহ্‌বুব, আবুল হাশেম, আবদুর রাজ্জাক, মোহাম্মদ আব্দুল ওদুদ, মোহাম্মদ আবুবকর, মোহাম্মদ মোলতাজী, মোহাম্মদ নেজামতউল্লাহ্, আজিজুল হাকিম, এ জেড্ নূর আহমদ, ফকির আহমদ, শামসুল হুদা, সৈয়দ আবুল হুদা, কাজী আবুল হোসেন, কাজী শামসুল ইস্‌লাম, সিরাজুল ইস্‌লাম চৌধুরী, সিরাজউদ্দিন চৌধুরী, সদরউদ্দীন, বেগম লুৎফউন্নেসা হারুণ, মিসেস রাহেলা খাতুন, জামশেদউন্নেসা প্রভৃতি সাময়িক পত্রিকায় বহু মনোজ্ঞ কবিতা লিখিয়াছেন। তবে ইঁহাদের কেহই পাঠকদের মনে নূতন দাগ কাটিতে সমর্থ হন নাই। সৈয়দ উদ্দীনের "অনিল" ও "পাকুড়" উল্লেখযোগ্য কবিতা। আবু নয়ীম ফজলুর রশীদ বিশেষতঃ জসীমউদ্দীনের এবং আবদুস্ সালাম মুখ্যতঃ

মহীউদ্দীনের অনুবর্ত্তী। নবীন কবিদের কেহ কেহ নিছক রূপ ও ভাবের বিলাসী। কিন্তু আত্মকেন্দ্রিক ললিত ভাবের বিলাস যাঁহাদের রচনার উপজীব্য, তাঁহাদের আয়ু কদাচিৎ দীর্ঘ হইয়া থাকে।

কে এম শমসের আলী, আবদুল গফ্ফার চৌধুরী, দেলওয়ার হোসেন প্রভৃতির বহু সনেটই উপভোগ্য। সনেট রচনায় সংখ্যার দিক্ দিয়া প্রথম আসন রিয়াজউদ্দীন চৌধুরীর প্রাপ্য; তবে সৌন্দর্য্য-বর্ণনা ও সুঠাম প্রকাশভঙ্গীর দিক্ দিয়া সুফী মোতাহের হোসেনের নামই সর্ব্বাগ্রে উল্লেখ করিতে হয়। সুফী মোতাহের 'পরিচয়' ও 'উপাসনা' পত্রিকায় প্রকাশিত তাঁহার কয়েকটি সনেটেই শক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু অকালে স্বাস্থ্যভঙ্গহেতু তাঁহার সে-শক্তিতে ভাটা পড়িয়াছে।

* * *

ইদানীং ফররুখ আহ্‌মদ সনেট রচনায় বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। তাঁহার "বন্ধন," "নোঙর," "প্রতীক্ষা", "সমাপ্তি", "বন্দরে সন্ধ্যা", "কাঁচড়াপাড়ায় রাত্রি" প্রভৃতি সনেটগুলিতে সৌন্দর্য্যবিহার ও বেদনাবোধ অনবদ্য রসমূর্ত্তি লাভ করিয়াছে। তিনি রোমান্টিক কবি, কিন্তু তাঁহার নভোবিহারী কল্পনা ধূলিম্লান পৃথিবীর আকর্ষণ অস্বীকার করে নাই। "অপঘাত অপমৃত্যু" আছে; কিন্তু তাহার মধ্যেই তিনি "জীবনের স্বপ্নসাধ" মিটাইতে চান। এই আশাবাদী কবি "মৃত কবরের" মধ্যে লক্ষ্য করেন "নব-জীবনের সাক্ষ্য।"—তাঁহার "তায়েফের পথে," "প্রেক্ষণ", "হে বন্য স্বপ্নেরা" প্রভৃতি কবিতায় বলিষ্ঠ আশাবাদ অপূর্ব্ব রূপমাধুর্য্যে প্রকাশ পাইয়াছে।

ঐ দেখ শিশু কাঁদে, ঐ দেখ দিশে দিশে মৃত্যুর খবর।
পেষণের মর্ম্মান্তিক কালো চাপ রচিতেছে ওদের কবর।

কিন্তু কিরূপে এই 'মর্ম্মান্তিক পেষণের' অবসান আজ হইবে? তিনি বলিয়াছেন: "সূর্য্যের লাঙল মাঠে মাঠে সোনার ফসল" ফলাইবে, তাহাতেই 'উচ্ছেদ' হইবে এই 'রজনীর ছাপ'; অতএব "দিকে দিকে সেই তীক্ষ্ণ লাঙলের করো অন্বেষণ।"—মহীউদ্দীন বিশ্বজনগণকে আহ্বান করিয়াছেন: "আমার সূর্য্যের পথে দাঁড়াও, দাঁড়াও!" মহীউদ্দীনের 'সূর্য্য' আজ নূতন আলোর আশ্বাস লইয়া

সর্ব্বত্র স্বয়ম্প্রকাশ; পক্ষান্তরে ফররুখ আহমদের "দীপ্তফলা সূর্য্যের লাঙল" বহু দিন হইতে নূতন ও প্রয়োজনীয় 'ফসল' ফলাইতেছে না। কিন্তু আজও সেই 'লাঙল' যে অব্যর্থ, এ-বিষয়ে তাঁহার মনে কোনো "আশংকা-কুটিল সংশয়' নাই। তাঁহার "সাত সাগরের মাঝি" দুঃখ-রাত্রির পারে এখনও লক্ষ্য করিতেছে "হেরার রাজতোরণ।" ইস্‌লামের পয়গম্বরের পথে তিনি যাত্রা করিতেছেন চিত্তের জাগরণ। কিন্তু "আল্-হেলাল" তাঁহার জন্য আজও কেবল প্রেম ও সৌন্দর্য্যের প্রতীক্:

বন্ধু, তোমরা এনেছ নূতন গান,
তোমরা এনেছ আল্-হেলালের যৌবন অম্লান।...
তা'র সুরজালে লুপ্ত চেতনা, সে-নারী সংজ্ঞাহারা,
কেনানের পথে সাথী খোঁজে তা'র ঝরছে অশ্রুধারা।
কালির আঁচড়ে খুলেছ তোমরা শাহরিয়ারের মন,
প্রেমমুগ্ধ সে শাহেরজাদীর হাতে সঁপে যৌবন।

মৃত্যুজয়ী যৌবন, দুঃখজয়ী আশা, এ সমস্ত ইস্‌লামে অস্বীকৃত নয়। কিন্তু মানব-কল্যাণ, সামাজিক ন্যায়বুদ্ধি, আল্লাহ্‌র পথে সমর্পিতচিত্ততা —এ সমস্ত হইতেছে উহার অন্তর্নিহিত প্রাণবস্তু। ফররুখ আহমদের মনোজগতে ইস্‌লামের এই মহান্ রূপের প্রতিফলন এখনো তেমন হয় নাই। নজরুলের মতন মাঝে মাঝে তিনি কোরানের রূপক ও প্রতীক্-সমূহ (classical allusions and symbols) ব্যবহার করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহাতে ইস্‌লামিক নীতিবোধ অপেক্ষা প্রকৃতি-প্রেম ও সৌন্দর্য্যস্বপ্নের প্রকাশই বেশী সম্ভব হইয়াছে। তাঁহার মন বাস্তবতাবিমুখ নয়, আবার উপচেতন মনের জটিল গ্রন্থি মোচনেও তাঁহার আগ্রহ অল্প নয়। তাঁহার স্বীকৃতি অসংশয়িত, তাঁহার মন সদাসক্রিয়; কাজেই তাঁহার কাব্যের ধারা সম্বন্ধে এখনই স্থিরনিশ্চয় হইয়া কিছু বলিতে যাওয়া জবরদস্তিরই পরিচায়ক।

আবুল হোসেনও আশাবাদী কবি। তবে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী ও টেকনিক্ কিছু স্বতন্ত্র। ফররুখ আহমদে আছে মাধুর্য্য, আবুল হোসেনে তীব্রতা। ফররুখ আহমদ আনে মন্থর মেঘমায়া, আবুল হোসেন হানে দ্রুত বিদ্যুৎ-কশা।

অসহ আজ কথার সনে কথা গাঁথি' আতশবাজি।
সময় নাহি সময় নাহি, বন্ধু!
বুদ্ধি নয় বুদ্ধি নয় শাণ দাও আজ কাস্তেটায়।
দেয়াল তোল দেহের পাঁজা ভেঙে'।

আধুনিক কবিতার বিষয়বস্তুর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। আবুল হোসেন এই আধুনিকতা সম্বন্ধে অতিশয় সচেতন।

গোলাম কুদ্দুসও অতি-আধুনিক। তবে তাঁর মন যেন একটু অবসন্ন, আবুল হোসেনের মতো সতেজ নয়। কুদ্দুসের ইঙ্গিত কিছু প্রচ্ছন্ন,—আবুল হোসেনের মতো স্পষ্ট নয়। কুদ্দুস্ বলিয়াছেন—

শৈশব হতে আশা ক'রে আছি মাথার অন্ধকার
হবে একদিন স্ফটিকের মতো স্বচ্ছ পরিষ্কার।

ভাবের রহস্যলোকে তিনি প্রেরণ করিতে চান বিশ্লেষণী বুদ্ধির আলোক। কিন্তু তাঁর তীক্ষ্ণ মননশীলতা মাঝে মাঝে আচ্ছন্ন হইয়া যায় অসংলগ্ন তত্ত্বের কুয়াশায়। নিজের সহজ স্বরূপ তিনি হয়ত জানেন না। সেইজন্যই তাঁর বহু কথা হইয়াছে খাপছাড়া,—ভাষা অনেক ক্ষেত্রে হইয়াছে দুর্ব্বোধ্য। মনের স্বপ্ন অনায়াসে আপন নীড় রচনা করুক, চিত্তের আকুতি সঙ্গীতের মতো বিস্তার করুক বেদনার সুরভি,—এই সহজ পন্থা তিনি যেন কেন কাম্য মনে করেন নাই। তিনি সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের ব্যর্থ অনুবর্ত্তন ত্যাগ করিয়া ম্যানারিজম্ ও সোস্যালিজমের মোহে ধরা দিয়াছেন। কিন্তু প্রচুর সৌন্দর্য্যানুরাগ এবং ছন্দঃদক্ষতা সত্ত্বেও তাঁহার প্রয়াস এখনও সার্থকতার সন্ধান পাইতেছে না। তাঁহার "একজনের জন্মদিনে" কবিতাটিতে নৈরাশ্য বড় করুণ হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে।

আহ্সান হাবীব বাস্তববাদী ও সত্যাশ্রয়ী; কিন্তু আবুল হোসেনের মতো অতখানি আশাবাদী নন। তাঁর কোনো কোনো রচনায় কিছু বিষন্নতার ছাপ আছে; কিন্তু তাঁর দৃষ্টি কুদ্দুসের মতো দূরবিস্তৃত নয়। হাবীবের হৃদয়াবেগ যথেষ্ট উচ্ছল নয়, অভিজ্ঞতাও অল্প, ফলে কল্পনায়

গতি কিছু শ্লথ। কুদ্দুস বলিয়াছেন : "এ-দিনের পাখী নাই, নাই কোথাও বন্ধু আকাশ।" আর হাবীব বলিয়াছেন :

আজকের দিনগুলি ডানা-ভাঙা পাখী একদল।

বাস্তব জীবনের দুঃসহ দুঃখকে দূর করিবার জন্য তিনি মহীউদ্দীনের মতনই উৎসুক ; তবে তাঁর মতো কর্ম্মীর বেশ পরিতে রাজি নন। তাঁর রসনায় ঝলকায় শুধু ক্ষুরধার বাণী। বিশ্বজোড়া অবিচারের অবসানের জন্য তিনি প্রয়োজন মনে করিয়াছেন 'ক্ষুর তরবার।' আবুল হোসেন বলিয়াছেন : 'বুদ্ধি নয়, বুদ্ধি নয়, শান দাও কাস্তেটায়।" আর হাবীব বলিয়াছেন : 'হে বাঁশরী, অসি হও তুমি !'

কিন্তু চাঁদকে ভুলিয়া কাস্তে, বাঁশী ফেলিয়া অসি এবং লেখনী ছাড়িয়া লাঙল ধরিতে সৈয়দ আলী আহসান রাজি নহেন। তিনি বলিয়াছেন :

দীপ্ত অসি, বাঁশী হও আজ !

আলী আহসানের ভাবের ব্যঞ্জনা ও কথার গাঁথুনি রাবীন্দ্রিক। এই রোমাণ্টিক কবির সৌন্দর্য্যানুভূতি ও জীবনোৎসাহ আনন্দদায়ক।

রবীন্দ্রানুসরণে এ-যাবৎ আজিজুর রহমান বহু লিরিক্ কবিতা লিখিয়াছেন। কিন্তু ইদানীং তিনি অতিরিক্ত বস্তুনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন। বিক্ষিপ্ত বস্তুপিণ্ডের মধ্যে তাঁর "মাজা-ভাঙা দিন খুঁড়িয়ে চলে।" তাঁর 'ফুটপাথ', 'শহরের সন্ধ্যা', 'বসন্ত' ও 'উপান্তিক' নামক কবিতাগুলিতে আধুনিক টেকনিক্ প্রয়োগের চেষ্টা অসার্থক হয় নাই। তাঁহার কয়েকটি কবিতায় দৃষ্টিভঙ্গীর পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে আঙ্গিকেরও কিছু পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে।

অবশ্য আধুনিকতার উপকরণ অনেক বেশী ছিল শওকত ওসমানে। তবে অস্বাভাবিক চিত্তচাঞ্চল্য এবং সমাজ-জীবন সম্বন্ধে এলোমেলো ভাবনা, এই দুইয়ের দরুণ তাঁহার ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্বন্ধে স্থির ধারণা করা দুষ্কর। "দিনের কবিতা" শীর্ষক তাঁহার প্রথম-প্রকাশিত রচনাটি ছিল বিস্ময়কর। কিন্তু সেই কবিতাটির দৃষ্টিভঙ্গী ও শব্দচয়নের মূলে জীবনানন্দ দাশগুপ্তের প্রভাব প্রচুর। তবে তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কোলরিজের স্তিমিত ভাবের গুহায় তিনি বেশী দূর অগ্রসর হন

নাই। "কমঃরেডস্" কবিতাটিতে তিনি স্মরণ করিয়াছেন 'কমরেড্ লেনিন-'কে। কিন্তু অব্যবস্থিতচিত্ততা সেখানেও তাঁহাকে স্থির হইতে দেয় নাই। শেষে জয়ী হইয়াছে পলায়নী মনোবৃত্তি—

> করো প্রসারিত উরু-প্রান্ত তব!—
> ভগ্নদশা, জীর্ণগৃহ, রয় যা'রা
> নিপীড়িত, তাহাদের চেনো তুমি?
> যাক তা'রা। এসে মোরা ওষ্ঠদেশ চুমি।

উপরোক্ত কবিতাটিতে জীবনানন্দ দাশের অবান্তরতা ও অস্পষ্টতার অনুসরণ না থাকিলেও তাঁহার escapism-এর প্রভাব সুস্পষ্ট।

আধুনিক সভ্যতার বিকার আজিজুর রহমানের মতো শামসুদ্দীন হায়দরের মনেও দুঃসহ পীড়ার সৃষ্টি করিয়াছে। তাঁহার "হে গোপন তুমি ভুবনে ভুবনে" কবিতাটিতে 'লালসার অসংযম' উৎকট আকারে প্রকাশ পাইয়াছে। বর্ত্তমান সমাজের রুচিবিকৃতিতে তাঁহার "বলির শিশু" কবিতাটিতেও উদ্বেল হইয়া উঠিয়াছে অস্বস্তিকর উত্তেজনা।

কাজি আফসারউদ্দিন আহমদের বিশ্লেষণীশক্তি আশাপ্রদ। তিনি বলিয়াছেন:

> আমার অমর শাশ্বত সুন্দর প্রেম
> আর আমার অমর কবিতার মাঝে
> যারা ভীরু ক্লিষ্ট আর বঞ্চিত, সকলের জয়গান বাজে।

সমাজসত্তার অর্থনীতিক ভিত্তি সম্বন্ধে সচেতন না হইলে গণশ্রেণীর দুর্গতির হেতু সম্যক্ বুঝা যায় না। তবুও যে ইঁহাদের মধ্যবিত্ত-শ্রেণীমানস বঞ্চিত জনগণের জন্য জয়মাল্য রচনা করিতে উৎসুক, তাহাতে যুগধর্ম্মের প্রাধান্যই সপ্রমাণ হয়।

ইতিমধ্যে আরও কয়েকজন নবীন কবি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে মহবুবুর রহমান খাঁ, বেগম জেবু আহমদ, শামসুদ্দীন, মতিউল ইস্‌লাম ও শাহেদ আলী প্রতিশ্রুতিশীল। মহবুবুর রহমানের 'চাকা' ও 'কাগজ-ফেলার ঝুড়ি' প্রেমেন্দ্র মিত্রকে স্মরণ করাইয়া দেয়। শামসুদ্দীন এখনও ছন্দের কারুকর্ম্ম লইয়া বেশী ব্যস্ত,

মতিউল ইসলামেরও "শ্লথগতি ডানাভাঙ্গা দিন" ; তবে অসংলগ্নতা ও অবোধ্যতার মায়া কাটাইতে তিনি সচেষ্ট।

মতিউল ইস্‌লাম সম্প্রতি একটি আলোচনায় তাঁহার সমসাময়িক মুসলিম কবিগণের পরানুকৃতি 'লজ্জাকর' বলিয়া মনে করিয়াছেন। অতি-আধুনিক হিন্দু-সাহিত্যিকদের "দারিদ্র্যের আস্ফালন" ও "লালসার অসংযম" যে আসলে ইউরোপের আমদানী, এই অভিযোগ রবীন্দ্রনাথ করিয়াছিলেন। ইহা নিঃসন্দেহ যে, আমাদের সাম্প্রতিক কবিগণ সরাসরি ইউরোপের খবরদারী বিশেষ করেন নাই। নজরুল ইস্‌লাম, প্রেমেন্দ্র মিত্র, জীবনানন্দ দাশ, সুধীন্দ্র দত্ত, বিষ্ণু দে, সমর সেন ও অমিয় চক্রবর্ত্তী হইতেই ইঁহারা অনেকখানি প্রেরণা লাভ করিয়াছেন। মহীউদ্‌দীন হইতে আলী আহ্‌সান পর্য্যন্ত আমাদের এহেন অতি-আধুনিকগণের রচনায় অপটুতা আছে বটে, তবে শক্তির স্ফূরণই বেশী। ইঁহাদের অনেকেই আজও অনুকরণপ্রিয়, এবং অনুকরণ আসলে প্রস্তুতি মাত্র। কিন্তু ইঁহাদের কাহারও দ্বারা নব-সৃষ্টির গৌরবলাভ সম্ভব হইবে কি না এবং কবে হইবে, তাহা ভবিতব্যই জানে।

সাহিত্যের স্বরূপ মুখ্যতঃ সমাজতত্ত্বের কষ্টিপাথরে নির্ণয় করা চলে। বাঙালী মুসলমানের সমাজ-গঠন কি শিল্প-প্রতিভার আবির্ভাবের পক্ষে বাস্তবিকই প্রতিকূল? অবশ্য প্রতিভার আবির্ভাব আজও এক রহস্যময় ব্যাপার। কোনো সাহিত্যই একেবারে নৈর্ব্যক্তিক নয়; এবং ব্যক্তিত্বের বিকাশে পরিবেশের প্রভাব অসামান্য। জন্মমৃত্যু ও বিশ্বপ্রকৃতির রহস্য, নরনারীর যৌন-মিলন, সম্পত্তির অধিকার, এই তিনটি প্রধান বিষয়ই মানব-জীবনের ধারাকে অনেকাংশে নিয়ন্ত্রিত করে। আর, সাহিত্য জীবন-বৃক্ষেরই সুরভি-কুসুম। বাঙালী মুসলমানের সমাজ-সংগঠনে যতটুকু বৈশিষ্ট্য আছে, ততটুকু বৈশিষ্ট্য তাহার সাহিত্যেও প্রতিফলিত হইতে পারিত। কিন্তু শেখ ফয়জুল্লাহ্‌ হইতে ফররুখ আহমদ পর্য্যন্ত আমাদের যে কাব্য-সাহিত্য, তাহাতে সুস্পষ্ট স্বাতন্ত্র্যের পরিচয় বেশী নাই। মনে হয়, পরিবেষ্টনের সঙ্গে প্রেমের সম্পর্ক কোনোদিন সুগভীর হইতে পারে নাই বলিয়াই আমাদের সাহিত্যের বিকাশ হইয়াছে এরূপ খণ্ডিত। পল্লীতে পারিপার্শ্বিকতার

সহিত মুসলমানদের যোগ যেখানে হইয়াছে সহজ ও সুনিবিড়, সেখানে অসংখ্য বাউল-কবি ও গাথা-রচয়িতার আবির্ভাব সম্ভব হইয়াছে। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যিকগণ যদি চতুঃপার্শ্বের বিচিত্র জীবনধারা হইতে প্রাণরস সংগ্রহ করেন, এবং নিরাবেগ ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাহাদের সুখ-দুঃখে-মণ্ডিত জীবন-সৌন্দর্য্যের দিকে তাকান, তবে অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধির আনন্দের মধ্যে সার্থকতার সন্ধান পাইবেন।

বিজ্ঞানবুদ্ধি ও মানবিকতার ভিত্তিতে জাগতিক জীবনকে শ্রীমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করেন রামমোহন, আধুনিক জ্ঞানের আলোকে নব্য-হিন্দুত্বের উদ্বোধন করেন বঙ্কিমচন্দ্র,—এই দুই মহাপুরুষের বীর্য্যবন্ত সাধনার সুন্দরতম সমন্বয় ও চরমতম বিকাশ রবীন্দ্রনাথে। কিন্তু বাঙলার এই শতবর্ষের সাধনায়ও বৃহত্তম সামাজিক জীবনে বেশী শ্রী ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই; এজন্য বিংশ-শতকের তৃতীয় দশকে অতি-আধুনিক হিন্দু-সাহিত্যিকদের রচনায় স্বাভাবিকভাবেই প্রকাশ পায় নৈরাশ্য ও অসন্তোষ। রাশিয়ায় 'সানিনিজমের' প্রসারের মতন বাঙলা সাহিত্যেও একই কারণে দেখা দেয় দুর্ব্বলের যৌনলালসা। আধুনিক বাঙলা সাহিত্যের তখন সংক্রান্তি-সময়। চতুর্থ দশকে সমাজ-মানসের উৎকর্ষের সাথে সাহিত্যের রূপ পরিবর্ত্তনের সচেতন চেষ্টা হয়। ইদানীন্তন সাহিত্যের নূতন মননভঙ্গী তাহারই অবশ্যম্ভাবী ফল। কিন্তু সাহিত্যের সংকট-কাল এখনো উত্তীর্ণ হয় নাই; এখনো কালান্তরের আভাষ দেখা দেয় নাই। সমাজ-চেতনার বিকাশ সাহিত্যের গঠন-রূপ নিয়ন্ত্রিত করে; কিন্তু বাঙ্গলায় একালেও স্বকীয় বা সামাজিক চৈতন্যবোধ সুস্থ বা স্বস্থ নয়।

এ-প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে, বাঙ্গলার মুসলমান-সমাজে ওহাবী-আন্দোলনের প্রভাব, আলীগড়-আন্দোলনের প্রভাব ও কামাল-পন্থীদের প্রভাব যেভাবে নানা প্রতিক্রিয়ার সূচনা করে, সে-সম্বন্ধে সচেতন হওয়া আমাদের বহু অতি-আধুনিক লেখক বিশেষ প্রয়োজন মনে করেন না। ঐতিহ্যের জন্য কিছুমাত্র পরোয়া না করিয়া অধুনা ইঁহাদের কেহ কেহ মার্ক্সীয় গাথা বা পাকিস্তানী পুঁথি রচনার জন্য উদ্দীপিত হইতেছেন।

মাত্রাহীন উন্মাদনা এবং আত্মবিশ্বাসের অভাব, দুইই মারাত্মক। আমাদের সাম্প্রতিক সাহিত্যে যে হতাশা ও বিক্ষোভ দেখা দিয়াছে, সেজন্য আমাদের শ্রীভ্রষ্ট সমাজ-জীবন বহুলাংশে দায়ী। কিন্তু বলিষ্ঠ আশা ও প্রবল জীবনবোধ নূতন সাহিত্যের সূচনা করিতে পারে। আমাদের সেই নূতন সাহিত্যেই রূপায়িত হইয়া উঠিবে ভবিষ্যৎ সমাজের সুস্পষ্ট প্রতিচ্ছবি।

যে-সমস্ত রসসৃষ্টি ক্ষণকালের প্রশ্রয়ের গণ্ডী পেরিয়ে নিত্যকালের বৃহৎ পরিপ্রেক্ষিতের মধ্যে দৃঢ় হ'য়ে দাঁড়িয়েছে, তা'দের সঙ্গে সর্ব্বদা চেনা-শোনা থাক্‌লে সাহিত্যবিচার করবার অধিকার জন্মে ও আনন্দ ভোগ করবার শক্তি খাঁটি হ'য়ে ওঠে। সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ সম্পদ্‌গুলি সঙ্কলনের প্রয়োজন এই কারণেই।

—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

# শেখ ফয়জুল্লাহ্

## সৃষ্টিপত্তন

প্রথমে প্রণাম করি প্রভু করতার।
নিয়মে সৃজিলা প্রভু সয়াল সংসার॥
স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল সৃজিলা ত্রিভুবন।
নানা রূপে কেলি করে, না যায় লক্ষণ॥
পরে প্রণামিয়ে তাঁর নিজ অবতার।
নিজ অংশে করিলেক হইতে প্রচার॥
প্রথমে আছিলা প্রভু না চিনি' আপনা।
যেজন আছিল সঙ্গে, সে কৈল চেতনা॥
চৈতন্য পাইয়া দেখে আপন আকার।
আকার দেখিয়া তা'র জন্মিল বিকার॥
এরা কোন্ জন হয়ে আছে মোর পাশ।
এ বলিয়া ধরিবারে মনে কৈল আশ॥

চৌদিগে বাড়াই' হাত ধরিতে নারিলা ।
অতি ক্রোধে তবে 'তা'রে চাপিয়া ধরিলা ॥
সাত পাকি দিয়া আগে আপনা ধরিলা ।
নখে ক্ষত করি' তা'র অঙ্গ বিদারিলা ॥
প্রেমরস করিয়া আহুতি হৈল ধুয়া ।
আকাশে স্থাপন কৈল শরতের খোয়া ॥
রক্তে এক চন্দ্র হৈল, তারা হৈল আর ।
বক্ষেতে স্থাপন কৈলা ক্ষিতি অবতার ॥

অচৈতন্য হইয়া আছিলা কতক্ষণ ।
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ কৈলা নিরীক্ষণ ॥
চৈতন্য পাইয়া পুনঃ হাসিতে লাগিল ।
ভাবিতে ভাবিতে পুনঃ বিস্ময় জন্মিল ॥
আপনাত দেখি পুনঃ আপনে পাইলা ।
ভাবের ভাবিনী যদি ভাবিতে লাগিলা ॥
হুঙ্কারে জন্মিলা ব্রহ্মা, বিষ্ণু হৈল মুখে ।
আপনা আকার তবে রাখিলা সম্মুখে ॥
আদ্য অনাদ্য রূপে কৈল নিরীক্ষণ ।
ভাবের অনলে ঘর্ম্ম ঘর্ম্মিত তখন ॥
সেই ঘর্ম্মে পরমাত্মা হই' গেল যত ।
সেই ঘর্ম্মে জন্মিল মহামন্ত্র কত ॥
এ সকল একে একে সৃজিল নির্ম্মল ।
নিরাশ্রয় পুরীতে রহিলেক সকল ॥
সেই ঘর্ম্মে হৈল স্বর্গ নরক সৃজন ।
সেই ঘর্ম্মে স্থান স্থিত হৈল উৎপন্ন ॥

## শেখ ফয়জুল্লাহ্

আকাশ পাতাল মধ্যে সৃজন করিয়া ।
আদ্য আছেন্ত অনাদ্যে আহুতিয়া ॥
সৃষ্টিকে স্থাপিয়া আদ্য অনাদ্যের দেশ ।
যোগ-পরিচয় হেতু এক স্থানে বেন্ধে ॥
আদ্য বলে : অনাদ্য, তোমাকে বুঝাই ।
উৎপত্তি প্রলয় সমর্পিলা কার ঠাঁই ॥
তোমা সমর্পিয়া সব আমি হৈছি ভিন্ ।
তোমার আমার জান এক অংশে চিন্ ॥

—গোরক্ষবিজয়

---

## কদলী-নগর

আড়ে আড়ে চাহে গোর্খ শূন্যে করি' ভর
মঙ্গল বিধানে দেখে কদলী নগর ॥
অগুরু চন্দন-গন্ধ সর্ব্ব রাজ্যে পাএ ।
নাথ বলে : এহি রাজ্য বড় ভাল হএ ।
লোকের পিন্ধনে আছে পাটের পাছড়া ।
প্রতি ঘরের চালে দেখে সোণার কুমড়া ॥
কা'র পুকুরের পানি কেহ নাহি খায় ।
মণি-মাণিক্য তা'রা রৌদ্রেতে শুকায় ॥
সুবর্ণের ঘর দ্বার রতনে জড়িত ।
সকল দেশের লোক সুবর্ণ-ভূষিত ॥
সর্ব্ব রাজ্য হ'তে এই রাজ্যের বাখানি ।
সুবর্ণ কলসে সর্ব্ব লোকে খায় পানি

—গোরক্ষবিজয়

# আবদুস্ শুকুর মাহ্মুদ

## রমণিগণের অঙ্গসজ্জা

চিরুণী লইয়া করে ধরিল মাথার 'পরে,
চিরে কেশ করিয়া যতন।
দুই দিকে কুঞ্জবন মধ্যখানে কেশ ঘন
চিনিতে না পারে যুবজন ॥
গাঁথিল কেশের বেণী যেন হৈল কৃষ্ণ-ফণি,
চারি রাণী বান্ধে চারি খোঁপা।
তাহাতে কদম্ব-ফুল অগুরু কস্তুরী-তুল
জাদ দিল মাণিক্যের ঝাঁপা ॥
ললাট দ্বিতীয়ার চাঁদ ভুবন-মোহন ফাঁদ
সিন্দূরে উদিত দিনকর।
মৃগমদ চারি পাশে রাহু যেন ভানু গ্রাসে
তাতে যেন বসিল ভ্রমর ॥
শ্রবণ গৃধিনী জিনি' তাতে পরে রত্ন-মণি,
কুরঙ্গ জিনিয়া আঁখি জ্বলে।
তাহাতে কাজল-রেখা মেঘ-সঙ্গে ইন্দ্র দেখা
কটাক্ষে যুবক-জন ভোলে ॥
নাসিকা খগের শোভা যুবজন-মনোলোভা
যেন তিল-ফুলের আকৃতি।
নাসা অতি মনোহর তাতে শোভয় বেশর
তাহাতে পরিল গজমোতি ॥
অধর বান্ধুলি-ফুল দশন মুকুতা-তুল
কর্পূর তাম্বুল শোভা করে।

কাননে কোকিলা-ধ্বনি [illegible] বংশীর সুস্বর শু[illegible]

তাহা জিনিয়া বচন সরে ॥

পরিল লক্ষের শাড়ি [illegible]ম বেড়ি

যেন দেখি চন্দ্রের পুতলী

নিতম্ব সে মনোহর, পদ্ম হেন পদ্মকর,

পদনখ যেন চম্পা-কলি ॥

এই রূপে চারি নারী নানা অলঙ্কার পরি'

দেখে রূপ ধরিয়া দর্পণ।

দেখিয়া আপন মুখ চারি রাণীর কৌতুক,

রূপ দেখি' হৈল অচেতন ॥

অদুনা পদুনা বোলে চন্দনা কাঞ্চনা বলে

এহি রূপে ভুলাব রাজনে।

আব্দুস্ শুকুরে কয়, এ রূপে ভুলিবার নয়,

যোগী হ'বে মায়ের বুঝানে ॥

—গোপীচান্দের সন্ন্যাস

---

# দৌলত উজীর বাহ্‌রাম খান্‌

## চাঁদের কলঙ্ক

জগতে বোলয় তোমা সুধাকর নাম।

তোমার শীতল গুণ অতি অনুপাম ॥

মোর প্রতি কেন তুমি গরল সমান।

অনল সদৃশ মোর দগধ পরাণ ॥

তোমার সমান মোর ঈশ্বরী-বদন।

তোমারে দেখিতে ইচ্ছি ইহার কারণ ॥

মোর প্রতি নাহি কিন্তু তোমার পিরীত।
[illegible] গরল হৈল, এ কি বিপরীত ॥
বি[illegible] সময়ে বৈরী হয় বন্ধুগণ।
শুভ[illegible]শা হৈলে হয় অমিলে মিলন ॥

বিরহী জনের প্রতি শশী দয়াহীন।
এই পাপে প্রতি মাসে এক পক্ষ ক্ষীণ ॥
বিরহী জনের তনু দগধে কারণ।
প্রতি মাসে এক বার তোমার মরণ ॥
বিরহী জনের সদা হৃদয় সশঙ্ক।
তেকারণে রহিলেক ইন্দুর কলঙ্ক ॥
বালক সময়ে সর্ব্ব লোকের বিদিত।
বিশেষ অনেক বক্র চন্দ্রের চরিত ॥
যৌবনেতে কলানিধি কুচক্র প্রকৃতি।
তেকারণে চণ্ডতা লাঘব করে অতি ॥
দুঃখের বারতা জান রাহুর গ্রহণে।
দুঃখিত জনের দুঃখ না ভাব আপনে ॥
বিরহী জনের অঙ্গ দগধ স্বরূপ।
তেকারণে দুই পক্ষে ধর দুই রূপ ॥
যদি মুই লম্ফ দিয়া তোর লাগ পাম।
কাটারে কাটিয়া তোরে জলেতে ভাসাম ॥
শশধর হেরিতে বাড়য়ে মোর দুখ।
নক্ষত্র দেখিতে মোর বিদরয়ে বুক ॥
গণিতে তারকা-দলে প্রাণ হৈল শেষ।
অবহু দারুণ নিশি নহে অবশেষ ॥

—লায়লা-মজনু

## সৈয়দ সুলতান

### বিদ্যাধরী

খঞ্জন-গঞ্জন অতি নাসা তিল-ফুল।
চাঁচর চিকুর সব লম্বিত বহুল ॥
ভুরুযুগ দুই ধনু কাজলে রঞ্জিত।
ঈষৎ কটাক্ষ-শরে করয় মোহিত ॥
মুখশশী 'পরে যেন নয়ন-চকোর।
রহিছে অমিয়া-আশে হই' অতি ভোর ॥
সেই পদ 'পরে শোভে অলখা ভ্রমর।
ঘর্ম্মজল মধু বলি' পিয়ে নিরন্তর ॥

—সবে-মেয়রাজ

---

### যোগ-প্রক্রিয়া

মধ্যেতে সুষুম্না নাড়ী সর্ব্ব মধ্যে সার।
আদ্যাশক্তি আরাধিবার সেই সে দ্বার ॥
পূরকে পূরিয়া বায়ু করিব স্থাপন।
সূচী-মুখে সূতা যেন করে প্রবেশন ॥
সন্ধি পাই' সেই বায়ু করিবে প্রবেশ।
প্রবেশ করিতে ধ্বনি উঠিবে বিশেষ ॥
শুনিতে শুনিতে ধ্বনি স্থির হবে মন।
যত সব জ্ঞানী দেখ এই মহাধন ॥
সেই ধ্বনি-মধ্যে জ্যোতিঃ চিনিয়া লইব।
তবে সে জ্যোতির মধ্যে মন নিয়োজিব ॥
তবে সেই জ্যোতিতে মনের হবে লয়।
সেই সে প্রভুর পন্থ, জানিও নিশ্চয় ॥

—জ্ঞানপ্রদীপ

## শেখ

### [illegible] আমিনার রূপ

অঞ্জন রঞ্জিত হৈল নয়নের কোলে।
পদ 'পরে ভোমরায় মধু-লোভে ভোলে॥
নাসিকা শোভয় যেন এক তিল-ফুল।
বেশর শোভয় তাতে মুকুতা-হিন্দোল॥
গৃধিনী পক্ষিনী জিনি' শ্রবণ শোভিত।
মণিময় কুণ্ডল আছে তাতে বিরাজিত॥
সুন্দর তিলকের চন্দনের বিন্দু।
সূর্য্য আচ্ছাদিয়া যেন রহিয়াছে ইন্দু॥
চাঁচর চিকুর দেখি' চামরী লজ্জিত।
তাতে বেণী শোভা করে ভুজঙ্গী সহিত॥
রক্তবর্ণ অধর জিনিয়া বিম্বফল।
মুকুতার হার জিনি' দশন বিমল॥
মৃণাল জিনিয়া শোভিয়াছে দুই কর।
কেয়ূর কঙ্কণ তাতে দেখিতে সুন্দর॥
বক্ষমূলে নবরঙ্গ দেখিতে শোভিত।
যার গন্ধে দশ দিক করে আমোদিত॥
গ্রীবা 'পরে শোভিয়াছে মণিরত্নহার।
দিনমণি দীপ্তি পায়, হরে অন্ধকার॥
মৃগরাজ-মধ্য জিনি' কটি অতি ক্ষীণি।
উরুযুগ সুললিত রামরম্ভা জিনি'॥
চরণ শোভয় মণিময় বৃক্ষরাজ।
কনক নূপুর তাতে অধিক বিরাজ॥

—রসুলবিজয়

# আব্দুন নবী

## আমীর হাম্জার লড়াই

হুঙ্কারি' লন্দুরে বলে হামজার ঠাঁই।
তুমি কেন নিজ নাম রাখহ ছাপাই' ॥
আমীর বলন্ত : আমি আরব-নন্দন।
হাম্জা আমার নাম বিদিত ভুবন ॥
আমীরের নাম শুনি' লন্দুরে বোলয়।
আমাকে বান্ধিতে তুমি আইলে মহাশয় ॥
আমীরেও বলিলেন্ত : আমি সেই জান।
তা শুনি' লন্দুরে গদা লয় তুরমান ॥
হাম্জাকে ডাকি' তবে বলিলেক বাণী।
আত্ম সামালিয়া রহ বিক্রমে সন্ধানি' ॥
আমীরে ছিফর ধরি' রহিলেক আগে।
লন্দুরে গুরুজ হানিলেক মহাবেগে ॥
গদার যে শব্দঘাতে মহাশব্দ ভেল।
সিন্ধু উথলিয়া যেন ভূমিগ্রহ গেল ॥
হুঙ্কারিয়া বলে : কৈলুঁ আরব সংহার।
আমীরে বোলন্ত : মিথ্যা না বোল দুর্ব্বার ॥
আমীরে বোলন্ত : যাকে রাখে করতার।
মিথ্যা কেন বল তাকে করিলি সংহার ॥

—আমীর হাম্জা

---

# মোহাম্মদ খান্

## সখিনার বিবাহ-সজ্জা

এথা সব বিবিগণ      সবে হই' একমন
সাজাইল সখিনা সুন্দরী।
আমীর হাসান-সুতা      রূপে গুণে অদ্ভূতা,
যেন গো স্বর্গের বিদ্যাধরী॥

চাঁচর চিকুর খোঁপা      শোভে অতি মনোলোভা
মুক্তা দোলে বেড়িয়া কবরী।
মুখ-চন্দ্র রাহু গিলে,      দেখি' তা'র বিন্দু-ফলে
তারাগণ কাঁপে দিক্ ভরি'।
নয়ন চঞ্চল দেখি'      ধাইল খঞ্জন পাখি,
কটাক্ষে হানিল দ্বিজরাজ॥

মৃগমদ পত্রাবলী      মৃগাঙ্ক কলঙ্ক বলি'
ভ্রম হয় মুনি-মন মাঝ॥
রতন কঙ্কন করে      অঙ্গেতে শোভন করে
অঙ্গুলিতে অঙ্গুরীয় সাজে।
ক্ষীণ মাঝা সিংহ জিনি'      পদযুগ কমলিনী
নুপূরের রুনু ঝুনু বাজে॥
নেটের পাটম্ব বেড়ি'      নানা অলঙ্কারে জড়ি'
সাজাইল সখিনা সুন্দরী।
দেখিতে এমন হয়      বিজলী-কিরণময়,
যেন গো স্বর্গের বিদ্যাধরী॥

—ছহি মুক্তাল হোসেন

# হায়াত মামুদ

## কাসেমের রণযাত্রা

কাসিম চলিল রণে, কহে সখিনার স্থানে,<br>
"দেহ প্রিয়া বিদায় আমায়।<br>
সংগ্রামে যুঝিতে যাই, দেখিতে পাই কি না পাই<br>
আর তব মুখ-চন্দ্রমায়॥"

শুনিয়া স্বামীর বাণী কহে কন্যা বিষাদিনী<br>
স্বামীর ধরিয়া দুই পাও।<br>
"বিয়া হৈল দিনাচারি তাতে বিধি হৈল বৈরী,<br>
সংগ্রামে যুঝিতে কেন যাও॥<br>
আমি বড় অভাগিনী, কহি প্রভু ক্রুর বাণী<br>
তোমাকে পাইব কোথা আর ?"

শুনিয়া কন্যার কথা কাসিম পাইল ব্যথা,<br>
অন্তিম চিন্তিল আপনার॥<br>
"শুন প্রিয়া প্রাণেশ্বরি শের আলী বরাবরি<br>
পুনঃ দেখা পাইবে আমার।"

এ বলিয়া যায় রণে, বিষাদ ভাবিয়া মনে<br>
পৌঁছে গিয়া রণের মাঝার॥

—জারি জঙ্গনামা

# মোহাম্মদ এয়াকুব

## সিঁদুরিয়া মেঘ

লোহু-ভরা দুই হাত এমাম উঁচা করে ।
এমামের লোহু গেল আস্‌মান উপরে ॥
আস্‌মান উপরে লোহু ছিটকিয়া লাগিল ।
সিঁদুরিয়া মেঘ হ'য়ে আস্‌মানে রহিল ॥
আজি-তক্ সেই মেঘ ওঠে আস্‌মানে ।
শহীদ্ হোসেনের লোহু জান সর্ব্বজনে ॥

—ছহি বড় জঙ্গনামা

---

## 'রুদ্র মাতম্ ওঠে দুনিয়া দামেস্কে'

আস্‌মান জমিন্ আদি পাহাড় বাগান ।
কাঁপিয়া অস্থির কৈল কার্‌বালা ময়দান্ ॥
আফ্‌তাব মাহ্‌তাব আদি কালো হৈয়া গেল ।
জানোয়ার হরিণ পাঁখি কাঁদিতে লাগিল ॥
বাঘ ভল্লুক কাঁদে আর মহিষ গণ্ডার ।
বাচ্চারে না দেয় দুধ, কাঁদে জার জার ॥
মৌমাছি ভোমর কাঁদে, মুখে নাহি মউ ।
কাঁখে কুম্ভ করি' কাঁদে গৃহস্থের বউ ॥
মালী ও মালিনী কাঁদে এলো করি' চুল ।
'হায় হায় এমাম গেল, কারে দিব ফুল ॥'
যত মুসলমান ছিল এজিদ-লস্করে ।
জার জার হৈয়া কাঁদে এমামের তরে ॥
শোকেতে কাতর হৈল যত মুসলমান ।
দেলেতে হইল খুশী যত কুফরান ॥

—জঙ্গনামা

# কাজী দৌলত

## প্রণম আষাঢ়

**প্রাণ মোর দহে দহে ।**

**রাজার নন্দিনী ময়না, কেন এত দুঃখ সহে ॥ ধ্রু ।**

প্রথম বরিষা দেখ প্রবেশ আষাঢ় ।
বিরহিনীর বিরহ বাড়য় অতি গাঢ় ॥
মদন-অসিক জিনি' নীর-কলা ঘন ।
শিখরে নাচয় শিখী ধরিয়া পেখম ॥
নব নীর পানে মত্ত চাতক চপল ।
পিউ পিউ উচ্চৈঃস্বরে ফুকারে মঙ্গল ॥
কেহ নাচে কেহ গায় সারস বিহঙ্গ ।
দোলয় দম্পতি সবে মদন-তরঙ্গ ॥
আইসে পথিকজন বধূ-প্রেম গণি' ।
নির্জ্জন সঙ্কেত সুখ বরিষা-রজনী ॥
নিজ গৃহ অনুসরি' আসে বণিজার ।
বরিষা নিকটে, কান্ত না দেখি ময়নার ॥
ঘরে ঘরে নিজ কান্ত করয় বিলাস ।
কামাকুল কামিনী না ছাড়ে কান্ত-পাশ ॥

*          *          *

দেখো ময়নাবতী        প্রথম আষাঢ়
চৌদিগে সাজে গম্ভীর ।
বধূজন-প্রেম        ভাবিয়া পথিক
আইসে নিজ মন্দির ॥

যার ঘরে কান্ত সেহ সোহাগিনী
পূরে মনোরথ কাম।
দুর্ল্লভ বরিষা তামসী রজনী
নির্জ্জন সঙ্কেত ঠাম॥
দারুণ ডাহুক দাহুরী ময়ূর
চাতক নিনাদে ঘন।
সে ধ্বনি শুনিয়া শ্রবণে বিরহিনী
সহয় মনে মদন॥
যাবত বয়স কেলি-কলা-রস
পূরে মনোরথ ধনি।
হট পরিপাট মান উপরোধ
চাতুরী ত্যজ কামিনী॥
শুনহ উকতি করহ ভকতি
মানহ সুরতি রাই।
নাগর সুজন মিলাইয়া দেহ
রাধার কোলে কানাই॥
কহেন্ত দৌলত, সতী সৎপথ
না ত্যজে যাবত প্রাণ।
লস্কর-নায়ক রস-বাণী যার
শ্রীযুত আশ্‌রাফ খান্‌॥

---

## শাওন

মালিনী! কি কহব বেদনের ওর।
'লোর' বিনে বাম হি বিধি ভেল মোর॥

শ্রাবণ মাসেতে, ময়না, বড় সুখ লাগে।
রিমিঝিমি বরিষে, মনে ভাব জাগে॥

## কাজী দৌলত

ধরতি বহয় ধারা, রাত্রি আঁধিয়ারি।
খেলয় বঁধুর সঞে প্রেমের ধামারি॥

শ্যামল অম্বর, শ্যামল ক্ষেত ক্ষেতি।
শ্যামলক দশ দিশি দিবসক জ্যোতিঃ॥

বিজলী মেহ চামরের সঙ্গে।
ভীমশ্রী নিশি রঙ্গে অভিরঙ্গে॥

শ্রাবণ সুন্দর ঋতু, লহরী অপার।
হরি বিনে কৈছনে পাইব আমি পার॥

খরতর সিন্ধুবর, পবন দারুণ।
চৌগুণ বাড়িয়া যায় বিরহ-আগুন॥

আকুল কামিনীকুল কামভাব-ত্রাসে।
পিয়া-পায় বন্দয় রতি-রস আশে॥

* * *

শাঙন গগন সঘন ঝরে নীর।
তবু মোর না জুড়ায় এ তাপ-শরীর॥

মদন-অসিক জিনি' বিজলীর রেহা।
তড়্পায় যামিনী, কম্পয় মোর দেহা॥

* * *

বিরহ-পীড়ায় ধনি জপয়তি লেহা।
লস্কর-নায়ক-মণি রস-গুণ গাহা॥

—সতী ময়না ও লোর-চন্দ্রাণী

# সৈয়দ আলাওল

## বিভু-স্তোত্র

প্রথমে প্রণাম করি এক করতার।
যেই প্রভু জীব-দানে স্থাপিল সংসার॥
করিল পর্ব্বত 'পরি জ্যোতির প্রকাশ।
তার পরে প্রকটিল সেই কবি-লাস॥
সৃজিলেক আগুন পবন জল ক্ষিতি।
নানা রঙ্গ সৃজিলেক করি' নানা রীতি॥
সৃজিল পাতাল-মহী স্বর্গ-নর্ক আর।
স্থানে স্থানে নানা বস্তু করিল প্রচার॥
সৃজিলেক সপ্ত মহী এ সপ্ত ব্রহ্মাণ্ড।
চতুর্দ্দশ ভুবন সৃজিল খণ্ড খণ্ড॥
সৃজিলেক দিবাকর শশী দিবা রাতি।
সৃজিলেক নক্ষত্র নির্ম্মল পাঁতি পাঁতি॥
সৃজিলেক শীত-শৈত্য গ্রীষ্ম-রৌদ্র আর।
করিল মেঘের মাঝে বিদ্যুৎ সঞ্চার॥
সৃজিল সমুদ্র মেরু জলচর-কুল।
সৃজিল শুক্তিতে মুক্তা, রত্ন বহুমূল॥
সৃজিলেক বন তরু পক্ষী নানা পদ।
সৃজিলেক নানা রোগ নানান্ ঔষধ॥
সৃজিয়া মানব-রূপ করিল মহৎ।
অন্ন আদি নানা-বিধি দিয়াছে ভোগত॥
সৃজিলেক নৃপতি, ভুঞ্জয় সুখে রাজ।
হস্তী অশ্ব নর আদি দিছে তার সাজ॥

সৃজিলেক নানা দ্রব্য এ ভোগ-বিলাস।
কা'কে কৈল ঈশ্বর, কাহাকে কৈল দাস॥
কা'কে দিল সুখভোগ, সতত আনন্দ॥
কেহ দুঃখী উপবাসী, চিন্তাযুক্ত ধন্দ॥
আপনা প্রচার হেতু সৃজিল জীবন।
নিজ ভয় দর্শাইতে সৃজিল মরণ॥
কা'কে কৈল ভিক্ষুক, কাহাকে কৈল ধনী।
কা'কে কৈল নিগুর্ণ, কাহাকে কৈল গুণী॥
সুগন্ধ সৃজিল প্রভু স্বর্গ প্রকাশিতে।
সৃজিলেক দুর্গন্ধ নরক জানাইতে॥
মিষ্টরস সৃজিলেক কৃপা-অনুরোধে।
তিক্ত কটু কষা সৃজি' জানাইল ক্রোধে॥
পুষ্পে জন্মাইল মধু সুগুপ্ত আকার।
সৃজিয়া মক্ষিকা কৈল তাহার প্রচার॥
এতেক সৃজিতে তিল না হৈল বিলম্ব।
অন্তরীক্ষ গঠিয়া রাখিছে বিনা-স্তম্ভ॥
কা'কে কৈল নির্ব্বল, কাহাকে বলী আর।
হাড় হস্তে নির্ম্মিয়া করয় পুনঃ হাড়॥

সেই এক ধনপতি, যার এ সংসার।
সকলেরে দেয় দান, কমে না ভাণ্ডার॥
ক্ষুদ্র পিপীলিকা হস্তে ঐরাবত আর।
কা'কে নাহি বিস্মরণ, দিয়াছে আহার॥
হেন দাতা আছে কোথা, শুন জগজন।
সবাকে খাওয়ায় কিন্তু না খায় আপন॥

জীবন আহার দিল, দিয়াছে আশ্বাস।
সকলের আশা পূরে, আপনে নৈরাশ॥
পর্ব্বত করয় রেণু, দেখে সর্ব্ব লোকে।
হস্তীরে আনয় পিপীলিকা সমযোগে॥
যেই ইচ্ছা সেই করে, কেহ নাহি জানে।
মন-বুদ্ধি অন্ধ ধন্ধ তাহার কারণে॥

সেই সে সকল গড়ে, সকল ভাঙ্গয়।
ভাঙ্গিয়া গঠয় পুনঃ যদি মনে লয়॥
প্রকট গোপন আছে সবাকারে ব্যাপি'।
ধার্ম্মিক চিনয়ে তাকে, না চিনয়ে পাপী॥
বিনি জীবে জিয়ে, বিনি হাতে করে কর্ম্ম।
জীবহীন কর্ত্তা সেই, কে বুঝিবে মর্ম্ম॥
পদ বিনে চলে প্রভু কর্ণ বিনে শোনে।
হিয়া বিনে ভূত ভবিষ্যৎ সব গোণে॥
চক্ষু বিনে হেরে পন্থ, পাখা বিনে গতি।
কোনো রূপ-সম নহে অনন্ত মূরতি॥
স্থান-বিবর্জ্জিত সদা আছে সর্ব্ব ঠাম।
রূপ-রেখা-বহির্ভূত নিরমল নাম॥

আর যত দিয়াছে সে রত্ন অমূলিত।
নাহি জানে মূর্খ তার মর্ম্ম কদাচিত॥
দরশন-হেতু দিয়াছে চক্ষুর জ্যোতিঃ।
শ্রুতি-হেতু দিয়াছে শ্রবণ মাঝে শ্রুতি॥
বাক্য ষড়্‌রস হেতু রসনা-প্রসাদ।
হাস্য লাগি' দশন লইতে নানা স্বাদ॥

## সৈয়দ আলাওল

সুস্বর নিমিত্ত করিয়াছে কণ্ঠ দান।
হস্ত পদ আদি প্রভু দিছে যথা-স্থান ॥
ভিন্ন ভিন্ন রাজ্যে নিয়োজিছে সবাকারে।
একের কর্ত্তব্য অন্যে করিতে না পারে ॥

এ সব রতন পাইয়াছে জনে জনে।
তথাপি সে দাতার মর্য্যাদা কেবা জানে ॥
যাহাকে করেছে প্রভু এক রত্ন হীন।
সেই জানে তার মর্ম্ম হই' অতি দীন ॥
যৌবনের মর্ম্ম জানে যার জীর্ণ কায়।
স্বাস্থ্য-মর্ম্ম সে জানে অস্বাস্থ্য যার গায় ॥
সুখ-মর্ম্ম দুঃখ বিনে না জানে রাজন্।
বন্ধ্যা-জনে নাহি জানে প্রসব-বেদন ॥

অনন্ত অপার পৃথ্বী প্রভুর কারণ।
কহিতে অকথ্য কথা না যায় বর্ণন ॥
সপ্ত মহী সপ্ত স্বর্গ বৃক্ষ-পত্র যত।
সপ্ত শূন্য ভরি' যদি সৃজয় জগত ॥
যত বিধ নব গৃহ আর বৃক্ষ-শাখা।
যত লোমাবলী আর যত পক্ষী পাখা ॥
পৃথিবীতে যত রেণু, স্বর্গে যত তারা।
জীব-জন্তু-শ্বাস আর বরিষার ধারা ॥
যুগে যুগে বসি' যদি স্তুতি এ লেখয়।
সহস্র ভাগের এক ভাগ নাহি হয় ॥

—পদ্মাবতী

## পদ্মাবতী-উপাখ্যান

শেখ মোহাম্মদ যতি যখন রচিল পুঁথি
সন সপ্তবিংশ নব শত।
চিতোর নগরেশ্বর রত্নসেন নৃপবর
শুক-মুখে শুনিয়া মহৎ॥
যোগী হৈয়া নরাধিপ চলিল সিংহল দ্বীপ
ষোল শত কুমার সংহতি।
লঙ্ঘি' বনখণ্ড বাট উত্তরি' সিংহল-ঘাট
নৌকা বাঁধে তথা জনপতি॥
সিংহল দ্বীপেতে গিয়া নানা দুঃখ বিস্মরিয়া,
বহু যত্নে পেল পদ্মাবতী।
পক্ষী-মুখে শুনি' কথা নাগমতি চিন্তাযুতা,
ভাবি' দেশে চলিলা নৃপতি॥
সাগরে পাইয়া ক্লেশ আসিয়া চিতোর দেশ
করে বহু উৎসব আনন্দ।
রাঘবচেতন জ্ঞানী অবিমৃষ্য কহি' বাণী
প্রতিপদে দেখাইল চন্দ॥
তত্ত্ব জানি' নৃপবর তা'রে কৈল দেশান্তর,
যাইতে পেল কন্যা দরশনে।
কন্যা আনন্দিত মনে করের কঙ্কন দানে
পরিতোষে পাঠাল ব্রাহ্মণে॥
সুলতান্ আলাউদ্দীন্ দিল্লীশ্বর তৎকাসীন্
প্রচণ্ড-প্রতাপ ছত্রধর।
পণ্ডিত ব্রাহ্মণ তথা কহিল কন্যার কথা
শুনি' হরষিত নৃপবর॥

শ্রীজা নামে বিপ্রবর পাঠাইল রাজেশ্বর
কন্যা মাগি' রত্নসেন স্থানে।
পদ্মাবতী না পাইয়া শ্রীজা আইল পালটিয়া,
শুনি' শাহা ক্রুদ্ধ হৈলা মনে॥

তুরঙ্গ মাতঙ্গ রাজি চতুরঙ্গ দল সাজি'
গেল চিতওর লড়িবারে।
দ্বাদশ বৎসর রণ তথা ছিল অখণ্ডন
রত্নসেনে ধরিল প্রাকারে॥

দিল্লীশ্বর দেশে আইল নৃপে কারাগারে থুইল
তাড়না করিল নানা মতি।
গউরা বাদিলা নাম ছিল রত্নসেন-ধাম,
মুক্ত কৈল কপট যুকতি॥

চিতওর দেশে আসি' বঞ্চিলেক সুখে নিশি
পদ্মাবতী সঙ্গে করি' রঙ্গ।
দেওপাল নৃপ-কথা পদ্মাবতী মুখে তথা
শুনি' নৃপ মৌন হৈল ভঙ্গ॥

সাড়ম্বরে তথা গিয়া দেবপালে সংহারিয়া
যুদ্ধক্ষেত্রে আইল নৃপতি।
সপ্ত মাস দিনান্তর মৈলা রত্ন নৃপবর
দুই রাণী সঙ্গে হৈলা গতি॥

পুনঃ সাজি' দিল্লীশ্বর আসি' চিতোর শহর
চিতা-কুণ্ড দেখিলা বিদিত।
সতীগতি পদ্মাবতী শুনি' শাহা মহামতি
মনে হৈল পরম দুঃখিত॥

চিতোরে সালাম করি' দিল্লীশ্বর গেল ফিরি।'<br>
—পুস্তকের এহি বিবরণ।<br>
হীন আলাওল বাণী সরস পয়ার জানি'<br>
রচাইল কোরেশী মাগন॥

---

## সরোবরে পদ্মিনী

সরোবরে আসিয়া পদ্মিনী উপস্থিত।<br>
খোঁপা খসাইয়া কেশ কৈল মুকুলিত॥<br>
সুগন্ধ শ্যামল-ভার ধরণী ছুঁইল।<br>
চন্দনের তরু যেন নাগিনী বেড়িল॥<br>
কিম্বা মেঘারম্ভ-যোগে হৈল অন্ধকার।<br>
বিধুন্তুদ আসিল-বা চন্দ্র গ্রাসিবার॥<br>
দিবস সহিত সূর্য্য হইল গোপন।<br>
চন্দ্র-তারা লইয়া নিশি হৈল প্রকাশন॥<br>
ভাবিয়া চকোর-আঁখি পড়ি' গেল ধন্দ।<br>
জীমূত-সময় কিবা প্রকাশিত চন্দ॥<br>
হাস্য সৌদামিনী তুল্য, কোকিল বচন।<br>
ভুরুযুগ ইন্দ্রধনু শোভিত গগন॥<br>
নয়ন-খঞ্জন দুই সদা কেলি করে।<br>
নারাঙ্গী জিনিয়া কুচ সগর্ব্বে শিহরে॥

সরোবর মোহিত কন্যার রূপ হেরি'।<br>
পদ-পরশন হেতু সৃজয় লহরী॥<br>
আপাদলম্বিত কেশ কস্তুরী-সৌরভ।<br>
মোহ-অন্ধকারে মন দৃষ্টি পরাভব॥

অলি পিক ভুজঙ্গ চামর জলধর।
শ্যামতা সৌষ্ঠব কার নহে সমস্বর ॥
ত্রিগুণ সঞ্চারে বেণী ভুবনমোহন।
এক গুণে দংশিতে পারয় ত্রিভুবন ॥
বিরাজিত কুসুম-গ্রথিত মুক্তাহার।
সজল জলদ-মধ্যে তারকা-সঞ্চার ॥
স্বর্গ হ'তে আসিতে যাইতে মনোরথ।
সৃজিল অলকারণ্যে স্বর্ণ সিঁথি-পথ ॥
সেই পথে বাটপাড় বৈসে অনুদিন।
কুটিল অলকা-পাশে ব্যক্ত রক্ত-চিন্ ॥
কিবা কবরীর মাঝে স্বর্ণ রেখাকার।
যমুনার মাঝে যেন সুরেশ্বরী-ধার ॥
জন্মান্তের বাঞ্ছা-সিদ্ধি হৈতে সহসাৎ।
ত্রিবলী উপরে যেন ধরিছে করাত ॥
কিবা মুখ-চন্দ্র আঁখি-অরুণে হেরিয়া।
ত্রাসে ফাটিয়াছে কিবা তিমিরের হিয়া ॥
কার শক্তি আছে সেই পন্থে যাইবার।
রুধির-মিশ্রিত যেন তীক্ষ্ণ অসিধার ॥
কদাচিৎ কেহ যদি যায় গমন-আশে।
মন বন্দী হয় তা'র অলকার ফাঁসে ॥

ভাগ্যের উদয়-লক্ষ্মী ললাট সুন্দর।
দ্বিতীয়ার চন্দ্র জিনি' অতি মনোহর ॥
বালক-চন্দ্রিমা-অঙ্গ বাড়ে দিন দিন।
মোহন ললাট অতি ভাগ্য-বিধি-চিন্ ॥

কেমনে বলিব ভালো তুলনা সে-অঙ্গ ।
সকলঙ্ক চন্দ্রমা, ললাট নিষ্কলঙ্ক ।
কতবার করে রাহু চন্দ্রেরে গরাস ।
মোহন ললাটে চন্দ্র সতত প্রকাশ ॥
ক্ষণেক বিলুপ্ত চন্দ্র ক্ষণেক উদিত ।
প্রশস্ত ললাটে চন্দ্র সদা-প্রকাশিত ॥
মৃগমদ-তিলক সুন্দর চারি পাশ ।
চন্দ্রমা উপরে রহে মিহির-গরাস ॥
স্বেদবিন্দু কপালেতে উদয় যখন ।
মুকতা আসিল কিবা ভ্রাতৃ-সম্ভাষণ ॥
যাহার ললাটে পূর্ণ ভাগ্যের উদয় ।
সেই ললাটেতে হৈবে সংযোগ নিশ্চয় ॥

কামের কোদণ্ড ভুরু অলকা সন্ধান ।
যাহারে হানয় বালা লয় যে পরাণ ॥
ভুরু-ভঙ্গ দেখি' কাম হইল অতনু ।
লজ্জা পাই' ত্যজিল কুসুম-শর ধনু ॥
ভুরু চাপে গুণাঞ্জন বাণ-কটাক্ষ ।
ত্রিভুবন শাসিল করিয়া তাহে লক্ষ্য ॥
কদাচিৎ গগনে উদিলে ইন্দ্রধনু ।
ভুরু-ভঙ্গী দরশনে লুকায় নিজ তনু ॥
ভুরুর ভঙ্গিমা হেরি' ভুজঙ্গ সকল ।
ভাবিয়া চিন্তিয়া মনে গেল রসাতল ॥
প্রভারুণ-বর্ণ আঁখি সুচারু নির্ম্মল ।
লাজে ভেল জলান্তরে পদ্ম নীলোৎপল ॥

কাননে কুরঙ্গ জলে সফরী লুকিত।
খঞ্জন-গঞ্জন নেত্র, অপাঙ্গ রঞ্জিত ॥

পুণ্যফলে লাগে যার অধরে অধর।
সহজে অমৃত পানে হইবে অমর ॥

—পদ্মাবতী

---

## বিলম্বিতা

ননদিনী রসবিনোদিনী !
ও তোর কু-বোল সহিতে নারি ॥ ধ্রু।

"ঘরের ঘরণী, জগৎ-মোহিনী, প্রত্যূষে যমুনায় গেলি।
বেলা অবশেষ, নিশি পরবেশ, কিসে বিলম্ব করিলি ॥"

"প্রত্যূষে জাগিয়া, কমল দেখিয়া, পুষ্প তুলিবারে গেলুম।
অরুণ উদনে, কমল মুদনে, ভ্রমর দংশনে মৈলুম ॥
কমল-কণ্টকে, বিষম সঙ্কটে, করের কঙ্কণ গেল।
কঙ্কণ হেরিতে, ডুব দিতে দিতে, দিন অবশেষ ভেল ॥
সিঁথির সিন্দুর, নয়নের কাজল সব ভাসি' গেল জলে।
হেরি' দেখ মোর, অঙ্গ জরজর দারুণ পদ্মের নালে ॥"

কুলের কামিনী, ফুলের নিছনি, কুলে নাহি তোর সীমা।
আরতি মাগনে, আলাওল ভণে, জগৎমোহিনী বামা ॥

---

## মুরলী-সঙ্কেত

হা হা রে বন্ধুর বাঁশী, বিষম ফাঁসি,
লাগিয়া রৈল রাধার গলে ॥ ধ্রু।

বন্ধুর বাঁশী চিত্ত-চোর লাগাইয়া প্রেম-ডোর
যুবতীর মন ধরি' টানে।
কুলবধূ কুল-হিয়া হরি' নিল বাঁশী দিয়া
প্রাণ নিল, বুঝি অনুমানে ॥

তুই বন্ধুর কঠিন হিয়া,　　অনলেতে কাষ্ঠ দিয়া
ছাই হই জ্বলিয়া পুড়িয়া।
কহে হীন আলাওলে,　　জল ঢাল সে অনলে,
নিবাও অনল প্রেম-রস দিয়া ॥

---

## বিরহ-রহস্য

ওলো কাহে মুখে মিলনের কাম
ঘরেতে না রহে প্রাণ। ধ্রু ॥

কি জানি কি হৈল　　কি দিয়া কি কৈল
না জানি নসিবে আছে কী।
বিনা দোষে কালা　　দিল এত জ্বালা,
এ দুঃখে প্রাণ মাত্র ত্যজি ॥
অবিরত পোড়ে মন　　কালা মোরে নিদারুণ
ভুলিয়া রহিল ভিন্ন দেশ।
বিরহ-বেদন　　মদন-দাহন
তনু ক্ষীণ, প্রাণ অবশেষ ॥
চন্দন অগুরু　　শীতল মন্দির
কিছু না লাগয় পোড়া অঙ্গে।
হীন আলাওল ভণে,　　এই দুঃখ রৈল মনে
কানাইয়া দেখোঁ তোর সঙ্গে ॥

---

## প্রার্থনা

প্রভু দয়াল হের গো মোরে
অনাথেরে দেও গো চরণ ॥

তোমার কৃপার বলে　　আপনা পাপের ফলে
তে কারণে তোহে না শুনিলাম।
এখন সঙ্কট ভেল　　শমন নিকটে এল
উদ্ধার কর মোরে, কাতর হইলাম ॥

ভুলিলাম সংসার-লোভে বন্দী হইলাম মায়া-কূপে
তে কারণে তোহে নাহি জানি।
তুমি ত্রিজগৎ-সাঁই তুমি বিনে গতি নাই
উদ্ধার মোরে আপ নাম গণি'॥
তোমারে ভ্রম হইলাম আপনি আপনা খাইলাম
তে কারণে লাগিল বিদশা।
হীন আলাওলে ভণে, যদি ভাব দিলে মনে
অবশ্য পুরিব তা'র আশা॥

---

## সৈয়দ মর্ত্তুজা

### মুরলী

রে শ্যাম, তোমার মুরলী বড় রসিয়া।
উচ্চৈঃস্বরে বাঁশী বাজে কুলের কামিনী সাজে
কোটি কোটি চাঁদ পড়ে খসিয়া॥
তোমার হৃদয় মাঝে অমূল্য মাণিক্য আছে,
দেখিলে গোপিনী নিবে পশিয়া॥
নন্দের দুলাল বলি' পন্থে চল কত ছলি';
কেলিয়া কদম্ব-তলে বসিয়া॥
সাধিতে আপন কাজ ভাব নাহি কুল-লাজ;
জলের নিয়রে রৈহু পড়িয়া।
সৈয়দ মর্ত্তুজা কয় পর কি আপন হয়,
কলঙ্ক রহিল জগ ভরিয়া॥

## বিরহ

মুঞি কেন পিরীত রে কয়লুম নিঠুর কালার সনে।
কালার প্রেমজ্বালা না সহে পরাণে॥ ধ্রু।

ঘরেতে বসিয়া শুনি মথুরায় বাজে বাঁশী।
শুইলে স্বপনে দেখি, জাগিলে উদাসী॥
বাও নাই, বাতাস নাই, কদম্ব কেন নড়ে।
মুঞি নারীর করমের দোষে ডাল ভাঙি' পড়ে॥
কলসীতে জল নাই রে বসিয়া রৈলুম ঘরে।
চলিতে না পারি আমি যৌবনের ভরে॥
সৈয়দ মর্ত্তুজা কয় মনেতে বিবাগী।
মুঞি কেন বসিয়া রৈলুম পিরীতির লাগি'॥

—রাগমালা

---

## মিলন

শ্যাম বন্ধু, চিত-নিবারণ তুমি।
কোন শুভ ক্ষণে দেখা তোর সনে
পাশরিতে নারি আমি॥
যখন দেখিয়ে ও চাঁদবদনে
ধৈরয ধরিতে নারি।
অভাগীর প্রাণ করে আনচান,
দণ্ডে দশবার মরি॥
মোরে কর দয়া দেহ পদ-ছায়া
শুনহ পরাণ-কানু।
কুলশীল সব ভাসাইনু জলে,
প্রাণ না রহে তোমা বিনু॥

## সৈয়দ মর্ত্তুজা

সৈয়দ মর্ত্তুজা ভণে কানুর চরণে—
নিবেদন শুন হরি।
সকল ছাড়িয়া রৈনু তুয়া পায়ে
জীবন মরণ ভরি' ॥

—পদকল্পতরু

---

## রস-সন্ধান

সুন্দরি, তুমি নাগর ভুলাইতে জান।
আড় নয়ন-কোণে হানিলে মদন-বাণে
জীউ ধরিয়া মোরে টান ॥ ধু।

একে তোমার গোরা গা না সহে ফুলের ঘা
বায়ে হেলিছে সব অঙ্গ।
দেখিয়া তোমার মুখ ব্যথায় বিদরে বুক
কাম-সাগরে উঠে রঙ্গ ॥

তোমার যৌবনে আমি ঝাঁপ দিব মনে জানি,
যদি কৃপা করহ আমারে।
বুঝিয়া আপন কাজ পার কর মোরে আজ
চড়াইয়া নৌকার উপরে ॥

সৈয়দ মর্ত্তুজা বাণী শুন রাধা ঠাকুরাণী,
ধনি ধনি তোমার জীবন।
ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর যারে ভাবে নিরন্তর
সে তোমার কেবল শরণ ॥

—তানলাথা

## নসির মামুদ

### গোষ্ঠলীলা

খেলত রাম সুন্দর শ্যাম পাঁচনি কাচনি রে।
বেত্র বেণু মুরলী আলাপি গানরি রে॥
প্রিয় শ্রীদাম সুদাম মেলি' অরুণ-তনয়া তীরে কেলি,
ধবলি শাঙলি আওবি আওবি ফুকরি' চলত কানরি রে॥
বয়সে কিশোর মোহন ভাতি বদন-ইন্দু জলদ-কাঁতি,
চারু চন্দ গুঞ্জাহার বদনে মদন ভানরি রে॥
আগম নিগম বেদ-সার লীলায় করত গোঠ-বিহার,
নসির মামুদ করত আশ, চরণে শরণ দানরি রে॥

—পদকল্পতরু

---

### প্রেমের দুঃখ

বল সখি, কি বুদ্ধি ক'রিব।
কানুর পিরীতি বড় পরমাদ
দৈবে মরিয়া যাব॥ ধ্রু।

শাশুড়ী ননদী মোরে কুবচন বলে।
কভু নাহি ভোলে রাঙা নয়ন-হিলোলে
নসীর মামুদ কহে, চিতে রৈল ব্যথা।
যা ছিল করমে মোর লিখিল বিধাতা॥

---

### ভজন

চলহ সখি নাগরী মান তুমি পরিহরি'
দেখ আসি' নন্দ-কি রায়।
যত ব্রজকুল-নারী অঞ্জলি ভরি' ভরি'
আবীর ফেঁকেন্ত শ্যাম-পায়॥

ক্ষণে যায় যমুনার জলে ক্ষণে ক্ষণে তরুতলে
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীটি বাজায়।
শুনিয়া বাঁশীর তান মানী ত্যজে তার মান
শ্রুতি মন নিত্য তথা ধায়॥
কহে নসীর মহাম্মদে ভজ রাধে শ্যামপদে
বিলম্ব করিতে না জুয়ায়॥

—রাগনামা

---

## ফকির হবিব

### শ্রীকৃষ্ণের রূপ

দেখ অপরূপ নন্দ-গোপাল।
কপালে চন্দন-ফোঁটা বিনোদ টালনি ঝোঁটা,
গলে শোভে বকুল-মাল॥ ধুঃ।
শ্রবণে কুণ্ডল দোলে কটাক্ষে ভুবন ভোলে
শ্রীমুখ অতি অনুপাম।
করেতে মোহন বেণু নির্ম্মল কোমল তনু
অতসী-কুসুম জিনি' শ্যাম॥
কটিতে পীতাম্বর দেখিতে মনোহর,
মুকুন্দ-মোহন যদু-রায়।
দাঁড়ায়ে কদম্ব-তলে সু-নাদ মুরলী বোলে,
ত্রিলোক মোহিত হইয়া যায়।
ফকির হবিব বলে, কানুরে দেখিনু ভালে
যেন পূর্ণশশীর উদয়।
হেন মন করে হিয়া, কানুরে সুমুখে নিয়া
নিরবধি দেখিছু সদায়॥

---

# আলী রাজা

## জ্ঞানসাগর

নবী বলে, শুন আলী অপরূপ বাণী।
প্রভুর আগম-তত্ত্ব সুরস কাহিনী॥
যেই সবে ভাব-তত্ত্বে করিবে খেয়াল।
সব হ'তে শুদ্ধ কাম, প্রভু জানে ভাল॥

অপরূপ সে কথন শুন আলী তুমি।
প্রভুর গোপন রত্ন, তত্ত্ব সে কাহিনী॥
এই সব বৃথা নহে, জান শুদ্ধ সার।
মোর পাছে পয়গম্বর না জন্মিব্ আর॥
মোর পরে হইবেক কবি ঋষিগণ।
প্রভুর গোপন রত্নে বান্ধিবেক মন॥
শাস্ত্র সব ত্যাগ করি' ভাবে ডুম্ব দিয়া।
প্রভু-প্রেমে প্রেম করি' রহিবে জড়িয়া॥
মোর পাছে হ'বে শুদ্ধ ফকির প্রধান।
গুরুর পাইবে দেখা প্রভু নিজ স্থান॥
তার সঙ্গে দেখা করে আপে নিরঞ্জন।
জ্যোতেঃ জ্যোতিঃ মেশামিশি হৈবে ত্রিভুবন॥
তাহার সমান মিত্র ভবে না জন্মিবে।
প্রভুর গোপন রত্ন যোগী সে পাইবে॥
যত কবি ঋষিকুলে, আপে নিরঞ্জনে
সর্ব্ব হ'তে বড় কৈল এ তিন ভুবনে॥
আগম নিগম তত্ত্ব জানে ঋষিগণে।
শক্তি কেহ নাহি ধরে তাহার সদনে॥

যোগী সবে বড় কৈল জগৎ মাঝারে।
তার সম মিত্র প্রভু না জানে কাহারে॥
—জ্ঞানসাগর

---

## মুরলী-মাহাত্ম্য

বনমালী শ্যাম, তোমার মুরলী জগপ্রাণ॥ ধুয়া।

শুনি' মুরলীর ধ্বনি ভ্রম যায় দেব মুনি
ত্রিভুবন হয় জরজর।
কুলবতী যত নারী গৃহবাস দিল ছাড়ি'
শুনিয়া দারুণ বংশী-স্বর॥
জাতি-ধর্ম্ম কুল-নীতি ত্যজি' সব পতি-প্রীতি
নিত্য শোনে মুরলীর গীত।
বংশী হেন শক্তি ধরে, তনু রাখি' প্রাণ হরে,
বংশী-মূলে জগতের চিত॥
যে শুনে তোমার বংশী সে বড় দেবের অংশী,
প্রচারি' কহিতে বাসি ভয়।
গৃহ-বাসে কিবা সাধ, বংশী মোর প্রাণনাথ,
গুরু-পদে আলী রাজা কয়॥
—ধ্যানমালা

---

## ভাব-সম্মিলন

কোথায় রাখিমু লুকাইয়া রে।
পিরীতি, তোরে কিরূপে রাখিমু লুকাইয়া॥ ধ্রু।

দারুণ অনল প্রেমে ঠাকুরের তনু ঘেমে'
ত্রিভুবন পুড়ি' করে ছার।
মহারত্ন প্রেম তোর রাখিতে কি শক্তি মোর
সর্ব্ব জগৎ যাহে অধিকার॥



৫

যে রাখে পিরীতি সার ত্রিলোক নিছনি তার
কান্ত-সোহাগিনী সে সফল।
যে-জন পিরীতি ছাড়া সে-জন জীয়ন্তে মরা
আদি অন্ত নাই তার ফল ॥
প্রেম-রত্ন নিধি-বস্তু গুরুপদ সিদ্ধিরস্তু
হীন আলী রাজা মাগে দান।
জানাও প্রেমের পাঠ করাও পিরীতি-নাট
সর্ব্ব-অঙ্গ গাহে প্রেম-গান ॥

---

## সেখ ফতন্

### সমর্পণ

মোর একি পরমাদ হৈল।
ছটফট করে হিয়া, কহ না বঁধুরে গিয়া,
কি দিয়া কিবা গুণ কৈল ॥ ধ্রু।

জিতে মোর নাহি সাধ মিছামিছি পরিবাদ
মিছা পাকে ঠেকিয়া রৈনু।
এমন করম মোর কলঙ্কের নাহি ওর
কলঙ্কে কলঙ্কে মুঞি মৈনু ॥
সহিতে পারি না আর, কৃপা করি' কর পার;
জনম অবধি দুখ পাইনু।
অধম ফতনের সাধ, ক্ষম প্রভু অপরাধ,
রাঙ্গা পায় শরণ লইনু ॥

---

# মির্জ্জা কাঙ্গালী

## নাট

কালিয়া নাচে রে রমণী সমাজে : তাল। ধ্রু।

মৃদঙ্গ বাজে রে তাথৈ বাজে করতাল।
সহস্র গোপিনী মাঝে কানু নাচে ভাল॥
করেতে কঙ্কণ শোভে, কটিতে কিঙ্কিণী।
চরণে নূপুর বাজে শুনি রিণিঝিণি॥
নাচে আর গাহে কালা রমণী-সমাজে।
রবাব ও বেণু-বাঁশী সুমধুর গাজে॥

মির্জ্জা কাঙ্গালী ভণে, দেখহ চরিত।
তারা সব সঙ্গে চাঁদ নাচয় ভূমিত॥

---

## অনুযোগ

কি রে শ্যাম, এমন উচিত নহে তোর॥ ধ্রু।

অঘোর সাঁঝের বেলা কি বোল বলিয়া গেলা,
আসিবা কি না আসিবা মনে।
এক কহ আর হয়, এমন উচিত নয়,
এই দুঃখ সহে না পরাণে॥

যখন পিরীতি কৈলা, রাত্র দিন আইলা গেলা,
ভিন্ন-ভাব না আছিল মনে।
সাধিয়া আপন কাজ কুলে দিয়া গেলা লাজ,
এখন না চাহ আঁখি-কোণে॥

বহুল যতন করি' শয্যা সাজাইনু নারী
নানা আভরণ পুষ্প দিয়া।
বাটায় তাম্বুল ভরি' অষ্ট অলঙ্কার পরি'
সারা নিশি গোঙানু জাগিয়া॥

তোমার কঠিন হিয়া অনলেতে কাষ্ঠ দিয়া
কোথা গিয়া রহিলা ভুলিয়া।
মীর্জা কাঙ্গালী ভণে, জল ঢাল সে অনলে,
নিবারহ প্রেম-রস দিয়া॥

—রাগমালা

---

## আকবর শাহ্

শ্রীগৌরচন্দ্র

জিউ জিউ মোর মন-চোর গোরা।
আপহিঁ নাচত আপন রসে ভোরা॥
খোল-করতাল বাজে ঝিকি ঝিকিয়া।
আনন্দে ভকত নাচে লিকি লিকিয়া॥

দুই চারি পদ চলু নট নটিয়া।
থির নাহি হোয়ত আনন্দে মাতোয়ালিয়া॥
ঐছন পঁহুকে যাহু বলিহারি।
শাহ্ আকবর তোর প্রেম-ভিখারী॥

---

# কবীর

## ফাগ-খেলা

ব্রজ-কিশোরী ফাগু খেলত রঙ্গে।

চুয়া চন্দন আবীর গোলাব
দেয়ত শ্যামের অঙ্গে ॥ধ্রু॥

ফাগু হাতে করি' ফিরত শ্রীহরি
ফিরি' ফিরি' বোলত রাই।

ঘোমট উঠামেঁ বয়ান ছোপায়ত
বেরি বেরি যৈছে মেঘ-সে চাঁদ লুকাই ॥

ললিতা এক সখি ফাগু হাতে রাখি'
দেয়ত কানু-নয়ান।

বৃষভানু-কিশোরী দুহুঁ বাহু ধরি'
মারত শ্যাম-বয়ান ॥

আওর এক সখি জিউ জিউ করি'
কাঁহা লাগাও আবীর।

কমরি ফাগু লেই কানু-নয়ান বেরি দেয়ত
হাঁ হাঁ করত কবীর ॥

---

# কমর্ আলি

## মাথুর

কান্দি' কান্দি' বলিতেছে শ্রীমতী রাই।
ও সই, আনিয়া দে মোর নাগর কানাই ॥ ধ্রু।

শুন ওগো বৃন্দা দূতী, বলি যে তোমারে।
মথুরায় গেল হরি, আনিয়া দে আমারে।
শ্যাম বিনে ব্রজপুরে আর আমার ব্যথী ত নাই ॥ ১

প্রেম-অনল জ্বলে মোর হৃদয়-অন্তরে।
বৃন্দাবনে বসি' দেখ কোকিল কুহরে।
সেই সে মনের দুখ কইতে নারি কার ঠাঁই॥ ২

কে হরিল প্রাণ-সখি ব্রজের শশী।
বৃন্দাবনে রাধা ব'লে ডাকে না বাঁশী।
অভাগী রাধারে বুঝি শ্যামের মনে নাই॥ ৩

কহে শ্রীকমর আলি, শুন গো প্যারি।
নিকটে আছে তোমার প্রাণের হরি।
ধ্যানে ভজ নাগর কানাই, কান্দ না শ্রীমতী রাই॥ ৪

—কমর আলীর পদাবলী

---

# আয়নুদ্দীন

## প্রেমের দীক্ষা

বন্ধু আমার পরাণের পরাণ।
বিরলে পাইয়া রূপ-যৌবন দিমু দান॥
দেখেছি অবধি রূপ মন ভেল ভোলা।
প্রেম-গুণ গুণি' গুণি' হিয়া করে জ্বালা॥
গোকুলে কলঙ্ক রটে, লোকে উপহাস।
গোপন বন্ধুর লাগি' জাতিকুল নাশ॥
আয়নুদ্দীনে বলে, সখি, মরম-বেদনা
কালা বিনে নিবারিতে নাহি আন্-জনা॥

---

# সাল বেগ

## শ্রীরাধিকার রূপ

নাগরী নাগরী নাগরী।

কত প্রেমের আগরি নব-নাগরী ॥ ধ্রু ।

কনক কেতকী চম্পা তড়িৎ-বরণী ।
ইন্দিবর নীলমণি জলদ-বসনী ॥
মৃগ পঙ্কজ মীন খঞ্জন নয়নী ।
কামধেনু ভ্রমর-পংক্তি ভুরু ভুজঙ্গিনী ॥
নাসা তিলফুল খগ চম্পাকলি জিতা ।
ঝামি জল বহন্তি বেণী ঝাঁপি' ঝলকিতা ॥
ভালে যে সিন্দূরবিন্দু শোভে কেশশোভা ।
জিনি' ইন্দিবর বাহু তমালের আভা ॥
ভালে বিরাজিত বর উরে মোতিম হারা ।
হংস বকশ্রেণী গঙ্গাজল দুগ্ধধারা ॥
কহে সাল বেগ হীন জগৎ-পামরা ।
রসের কলিকা রাই, কানু সে ভ্রমরা ।

---

## স্বপ্নাধ্যায়

কি করিল সখি মোরে নিঁদে জাগাইয়া ।
আইল চিকন কালা স্বপন জানিয়া ॥
কহিল বিনয় করি' হাত দিয়া উরে ।
চৈতন্য পাইয়া দেখি পিয়া নাই মোর কোরে ॥
মনের সঙ্গেতে মুঞি একলা নিঁদ যাম ।
কেন রে দারুণ বিধি মোরে হৈলে বাম ॥
কহে কবি সাল বেগ স্বপ্নেতে জাগিয়া ।
খণ্ডিল জন্মের দুঃখ চাঁদ-মুখ চাহিয়া ॥

# সেখ ভিখন্

## খণ্ডিতা

সবাই বলে, রাধার পরাণ কানাই।
তুমি রজনী বঞ্চিলে কোন্ ঠাই॥ ধ্রু॥

কেমনে বানালে চূড়া ভাঙিয়া তা হৈল গুঁড়া,
মেলিতে নারি দু'টি আঁখি।
হব না মথুরা-পথি, কি কব চূড়ার গতি
শ্যাম-অঙ্গে রহিয়াছে সাখি॥
কুঙ্কুম-কস্তুরী আর সুগন্ধি তাম্বুল-ভার
থুইয়াছিনু শিয়র উপরে।
হা হরি হা হরি করি' জাগি' রৈনু বিভাবরী,
তুমি ছিলে কাহার মন্দিরে॥
শেখ ভিখনে ভণে, বড় দুঃখ রাধার মনে,
পাশরিলে পূর্ব্বের পিরীতি।
আমার করম-দোষে তুমি থাক আন্-পাশে
হৌক মেনে' রাধিকার মৃতি॥

---

# মনওয়ার আলী

## সাধ

মাণিক্য রতন হেন যতনে রাখিব।
অঞ্জন মানিয়া নিত্য নয়নেতে দিব॥
গজমুক্তা হেন দিব হৃদয়ে তুলিয়া।
বাসা করি' দিব নিজ কলিজা চিরিয়া॥

—আলকাহ-খোলুরায়হান্

## মোহাম্মদ হাশিম

### বংশী-বাদন

না জানি না চিনি কেবা যমুনার কূলে।
দূরে থাকি' বাজায় বাঁশী, ফুলমালা গলে ॥
ক্ষণে হাটে ক্ষণে বাটে ক্ষণে তরুমূলে।
ক্ষণে ক্ষণে তার বাঁশী রাধা রাধা বোলে ॥
ক্ষণে ক্ষণে বান্ধে চূড়া ক্ষণে ক্ষণে খুলে।
ক্ষণে ক্ষণে বাঁশীর নাদে জলে ঢেউ তুলে ॥
মোহাম্মদ হাশিমে কহে, ভুবন মোহিলে।
কার বাঁশী হেন আর বুলিবে ব্রজকুলে ॥

—রাগমালা

---

## মোহাম্মদ হানিফ

### মথুরার পথে

মধুর মুরলী-ধ্বনি শুনিতে সুস্বর।
ভুবনমোহন রূপ, চলহ মথুর ॥ ধু।

কি রঙ্গ দেখিলাম সই রে যমুনার কূলে।
পুলকিয়া উঠে প্রাণ, দেহ মন ঢুলে ॥
কালিয়ার কাচনি চাহিতে প্রাণ নিল হরি'।
ঠামুরু ঠুমুরু নাচে আপনা পাশরি' ॥
মোহাম্মদ হানিফ কহে, কি রঙ্গ দেখিলুম।
মথুরা চলিয়া যাইতে নিরক্ষি' চাহিলুম ॥

—রাগমালা

---

## শাহ্‌ বদীউদ্দীন

### মিলন-রহস্য

অবলা মন্দিরে বসি,      প্রাণনাথ বাজায় বাঁশী,
অভাগিনী শুনি বাঁশীর গীত।
বন্ধুর বংশীর স্বনে      ধৈরয না ধরে মনে,
আকুল করিল নারীর চিত॥

শুনিয়া মোহন বাঁশী      হইলুঁ তোমার দাসী
ভজিলুম তুই শ্যামের চরণে।
না দেখি তোমার জ্যোতিঃ      থির নহে মোর মতি,
একবার দেখা কর রাধার সনে॥

তনুর অন্তরে পশি'      মনুরা রয়েছে বসি'
কিরূপে ভজিলে দেখা পাই।
কহন্ত বদীয়ুদ্দীনে      গুরুর আদেশ বিনে
দেখিবার আর লক্ষ্য নাই।

—ফাতেমার ছুরত-নামা

---

## মোহাম্মদ রাজা

### জল-ভরণে

সখিগণে তাঁরে সঙ্গে      রাধিকা চলিলা রঙ্গে,
—আয় রাধা যমুনার ঘাটে।
কদম্বের তলে বসি'      কানাই বাজায় বাঁশী,
ধবলী শাঙলি চরে মাঠে॥

কানাই বসিয়া বাটে, রূপ দেখি' প্রাণ ফাটে,
আজু মোর কি হয় না জানি।
জল সখি ঘরে যাই, কদম্ব-তলে সে কানাই
প্রাণ ফাটে তার বাঁশী শুনি'॥

অধীন রাজার-বাণী শুন রাধা সুবদনী;
বন্ধুয়া না দিব তোমা ছাড়ি'।
চতুরালী দূরে যাবে, পশরা ভাঙিয়া খাবে,
বলে ছলে লৈব ঘট কাড়ি'॥
দেখিয়া মথুরা-পতি স্থির নহে তোর মতি,
এই বাটে কেন আইলা পুনি।
তুই যে অবলা নারী কানাই প্রাণের বৈরী
এই ভাবে হারাইবে পরাণী॥

—তমিমগোলাল-চতুর্থছিলাল

---

# আফজল আলি

## অনুরাগ

থাম না সহে সজনী রে।
রোদে উনাইয়া পড়ে থাম॥ ধু।

তোমার বাঁশীর স্বরে প্রাণ আমার বিদরে
রহিতে না পারি ঘরে।
হেন লয় হিয়া প্রেম-ডুরি দিয়া
বান্ধিয়া রাখি আদরে॥

হেন লয় মনে বন্ধুর চরণে
ভজি' থাকি রাত্রি দিন।
দয়ার ঠাকুর না হৈও নিঠুর
দেখি' মোরে অতি হীন॥

কহে আফজল আলি শরীর কৈলুম কালি
তুমি সে বন্ধুয়ার লাগি'।
পিরীতি বাড়াইয়া যদি যাও ছাড়িয়া—
নিশ্চয় হইনু বৈরাগী॥

—রাগনামা

---

## অজ্ঞাত

### কাণ্ডারী

ওরে মন-মাঝি, তোর বৈঠা নে রে—
আমি আর বাইতে পারলাম না।
আমি জনম ভইরা বাইলাম বৈঠা রে—
তরী ভাইটায় বৈ আর উজায় না॥
ওরে জাঙ্গি রশি কতই কসি,
তবু হালেতে জল মানে না।
মায়ের তলা খসা, গুরা ভাঙা রে—
মায় তো গায়-গায়নি মানে না॥

---

# শেখ মদন বাউল

## মুক্তিতত্ত্ব

আমার হৃদয়-কমল চল্‌তেছে ফুটে' যুগ যুগ ধরি';
তাতে তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, উপায় কি করি'?
ফোটে ফোটে ফোটে কমল, ফোটার না হয় শেষ;
এই কমলের যে-এক মধু, রস যে তার বিশেষ।
ছেড়ে যেতে লোভী ভ্রমর পারো না যে তাই।
তাই তুমিও বাঁধা, আমিও বাঁধা, মুক্তি কোথাও নাই॥

---

## পথের বাধা

তোমার পথ ঢাক্যাছে মন্দিরে মস্‌জেদে।
ও তোর ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
আমায় রুখে দাঁড়ায় গুরুতে মুর্‌শেদে॥
ডুব্যা যাতে অঙ্গ জুড়ায়
তাতেই যদি জগৎ পুড়ায়,
বল্‌ তো গুরু কোথায় দাঁড়ায়—
তোমার অভেদ সাধন মরল ভেদে॥
তোর দুয়ারেই নানান্‌ তালা—
পুরাণ্‌ কোরাণ তসবি মালা,
ভেখ-পথই তো প্রধান জ্বালা,
কাইন্দ্যা মদন মরে খেদে॥

---

## নিঠুর গরজী

নিঠুর গরজী, তুই মানস-মুকুল ভাজবি আগুনে।
তুই ফুল ফুটাবি, বাস ছুটাবি, সবুর বিহনে ?
দেখ না আমার পরম গুরু সাঁই,
সে যুগ-যুগান্তে ফুটায় মুকুল,
তার তাড়া-হুড়া নাই।
তোর লোভ প্রচণ্ড
তাই ভরসা দণ্ড,
এর আছে কোন্ উপায়। (রে গরজী)
কয় যে মদন
শোন্ নিবেদন,
দিস্ নে বেদন
সেই গুরুর মনে ;
সহজ ধারা
আপন-হারা
তার বাণী শুনে। ( রে গরজী )

---

## হিলাল শাহ্

আমি অল্প বয়সে হৈলাম ফকির,
তুই আল্লার নিজ নাম লইয়া।
ফকির বিনোদিয়া রে আমার মুর্শীদ বিনোদিয়া।
তনের মধ্যে মনুয়ার বাসা, আমারে দেখাও নিয়া॥

---

# লালন শাহ্

## মানুষ-রতন

আমার ঘরের চাবি পরেরই হাতে।
কেমনে খুলে' সে-ধন দেখ্‌ব চক্ষেতে॥
আপন ঘরে বোঝাই সোণা
পরে করে লেনা দেনা,
আমি হ'লেম জন্ম-কাণা—
না পাই দেখিতে॥
এই মানুষে আছে রে মন
যারে বলে মানুষ-রতন,
লালন বলে, পেয়ে' সে-ধন
পারলাম না চিন্‌তে॥

---

## মনের মানুষ

আছে যার মনের মানুষ, মনে সে কি জপে মালা?
অতি নির্জ্জনে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয়ে' ডাকে তা'রে উচ্চস্বরে কোন্ পাগলা;
ওরে যে যা বোঝে, তাই সে বুঝে থাক্ রে ভোলা॥
যথা যার ব্যথা নেহাৎ, সেইখানে হাত ডলামলা;
ওরে তেমনি জেনো মনের মানুষ মনে তোলা॥
যে জন দেখে সে রূপ, করিয়ে চুপ রয় নিরালা;
ও সে লালন ভেঁড়োর লোক-জানান হরি বলা,
মুখে হরি হরি বলা॥

---

## সন্ধান

কোথা আছে দীন-দরদী সাঁই।
চেতন গুরুর সঙ্গে লয়ে খবর কর ভাই ॥
চক্ষু আঁধার দেলের ধোকায়,
কেশের আড়ে পাহাড় লুকায়,
কি রঙ্গ সাঁই দেখছে সদাই
বসে' নিগম ঠাঁই ॥
এখানে না দেখলাম যারে,
চিনবো তা'রে কেমন ক'রে ;
ভাগ্যেতে আখেরে তা'রে
দেখতে যদি পাই ॥
সম্‌ঝে ভবে সাধন কর,
নিকটে ধন পেতে পার ;
লালন কয়, নিজ মোকাম ঢোঁড়—বহু দূরে নাই ॥

---

## নিগূঢ় রহস্য

যার নাম আলেক মানুষ, আলেকে রয়।
শুদ্ধ প্রেম-রসিক বিনে কে তা'রে পায় ॥
রস রতি অনুসারে
নিগূঢ় ভেদ জান্‌তে পারে ;
রতিতে মতি ঝরে, মূল খণ্ড হয় ॥
লীলায় নিরঞ্জন আমার
আধ লীলা কল্লেন প্রচার,
জান্‌লে আপন জন্মের বিচার, সব জানা যায় ॥
আপনার জন্মলতা
জান্ গে তার মূল কোথা,
লালন কয়, হ'বে সেথা সাঁই পরিচয় ॥

## তিনু ফকির

### হেঁয়ালি

দৌড়বাজ ঘোড়া ফিরছে সদা ভবের বাজারে।
দিবানিশি ঘোরে ফিরে, ধৈর্য্য না মানে॥
সপ্ত সাগর পাড়ি দিয়ে
এল ঘোড়া শূন্য ভরে ;
হায়াৎ মওত্ জানা যাবে সেই ঘোড়ার সামনে॥
সাধন করলে পাবি তা'রে,
তার জোরে ব্রহ্মাণ্ড ঘোরে,
তিনটি মায়ের একটি ছেলে হৈল কি প্রকারে॥
সেই ঘোড়া হৈল ঘোড়া
এড়ে দিল বত্রিশ জোড়া,
তিনু বলে, খাড়াক-খাড়া যাবি কোন্ বাজারে॥

—হারামণি

---

## শীতলাং শাহ্

### প্রেমের লক্ষণ

পিরীতির শেল বুকে যার কলঙ্ক তা'র অলঙ্কার
কুল-মানের ভয় নাই রে তা'র।
পিরীতির এই নিশানি সদায় থাকে উদাসিনী,
দিবানিশি সে-জন বে-করার॥

ক্ষুধা নিদ্রা নাই গো মনে, জল ঝরে দুই নয়নে
লাজ ভয় নাই গো তার।
কলঙ্ক তা'র অলঙ্কার ॥
প্রথমে পিরীতে মজা, দ্বিতীয়ে পিরীতে সাজা,
তৃতীয়ে পিরীতে রাজা—
রঙ্গ খুশী বে-শুমার ॥
শীতলাং ফকিরে বলে, প্রেমের মালা যার গলে
কার কথা সে নাহি শুনে—
কেবল 'বন্ধু' 'বন্ধু' সার ॥

---

# দেওয়ান হাসন রাজা চৌধুরী

## আত্মবিচার

বিচার করিয়া দেখি সকলেই আমি।
সোনা মামী, সোনা মামী গো,
আমারে করিলে বদ্‌নামী ॥

আমি হৈতে আল্লাহ্‌ রসূল, আমি হৈতে কুল।
পাগলা হাসন রাজা বলে, তাতে নাই রে ভুল ॥
আমা হৈতে আস্‌মান জমিন্‌, আমা হৈতে সব।
আমি হইতে ত্রি-জগৎ, আমি হইতেই রব ॥
আমি আউয়াল্‌, আমি আখের, জাহের ও বাতিন্‌।
না বুঝিয়া দেশের লোকে বাসে মোরে ভিন্‌ ॥
মম অক্ষি হৈতে পয়দা আস্‌মান জমিন্‌।
কর্ণ হইতে পয়দা হইছে মুসলমানী দীন্‌ ॥

জীবন মরণ নাই রে আমার, ভাবিয়া দেখ ভাই।
ঘর ভাঙিয়া ঘর বানানি,—এই দেখিতে পাই॥
পাগল হইয়া হাসন রাজা কিসেতে কী কয়।
মর্‌ব মর্‌ব দেশের লোক, মোর কথা যদি লয়॥
আপন চিনিলে দেখ খোদা চিনা যায়।
হাসন রাজা আপন চিনিয়ে এই গান গায়॥

—হাসন উদাস

---

## প্রেমের হাট

প্রেমের বাজারে বিকায় মাণিক ও সোনা।
যেজন চিনিয়া কিনে, লাভ হয় তিন-ছুনা রে॥
প্রেমিকেরা প্রেম-বাজারে করে আনা-যানা।
অপ্রেমিক তো যায়না কেহই, চোখ থাকিতে কানা রে॥
প্রেম-বাজারে গিয়ে যা'রা বানাইয়াছে থানা।
মরণ তা'দের দূর হইয়াছে, সর্ব্বদাই জিনা রে॥
হাসন রাজা প্রেম-বাজারে গিয়ে হইল ফানা।
নাচন-বাদন করিয়া গায় প্রেমের এই গানা রে॥

—হাসন উদাস

---

# পাগলা কানাই

## হিন্দু-মুসলিম

এক বাপের ছুই বেটা, তাজা মরা কেহ নয়।
সকলেরি এক রক্ত, এক ঘরে আশ্রয়॥

কারো গায়ে শালের কোর্তা, কারো গায়ে ছিট,
দুই ভায়েরে দেখ্‌তে ভারি ফিট্‌,
কেবল জবানিতে ছোট বড়, বোবা বাচাল চেনা যায়॥
কেউ বলে দুর্গা হরি,
কেউ বলে বিস্‌মিল্লাহ্‌ আখেরী,
তবু পানি খেতে যায় এক্‌ দরিয়ায়॥
মালা পৈতা এক জন ধরে,
কেউ বা সুন্নত করে;
তবে ভায়ে ভায়ে মারামারি করে'
যাচ্ছিস্‌ কেন সব গোল্লায়॥

সাহিত্য পরিচয় : পরিশিষ্ট

# জোনাব আলি

## মারফতী ফকির

আজকাল দাগাবাজ ফকিরেরা ঢের।
ঠাঁই ঠাঁই যথা তথা হতেছে জাহের॥
শরিয়তের বরখেলাফ্‌ করিয়া বেড়ায়।
মারফতী ফকির আমি বলি সে-সবায়॥

মারফৎ পাইবে কিসে শরিয়ৎ ছাড়িলে।
কেতাব কোরানে যাহা না আছে দলীলে॥
ওয়াকিফ্‌ হইয়া হাল্‌ আওলিয়া লোকের।
লাঠি মার মাথে দাগাবাজ ফকিরের॥

—তাজকেরাতল আওলীয়া : ভূমিকা

# অজ্ঞাত

## বন্দনা

পূবেতে বন্দনা করি পূবে ভানুশ্বর।
এক দিকে উদয় ভানু, চৌদিগে পাশর॥
দক্ষিণে বন্দনা করি ক্ষীর-নদী সাগর।
যেখানে বাণিজ্য করে চাঁদ সদাগর॥
উত্তরে বন্দনা করি কৈলাশ পর্ব্বত।
যেখানে পড়ি' আছে আলীর মালামের পাথর॥
পশ্চিমে বন্দনা করি মক্কা হেন স্থান।
উদ্দেশে বাড়ায় সালাম মোমিন মুসলমান॥
সভা করি বসূছ ভাই রে হিন্দু মুসলমান।
সভার চরণে আমি জানাই সালাম॥
চারি কোণে পৃথিবী বন্দি' মন করলাম স্থির।
সুন্দরবন-মোকামে বন্দিলাম গাজী জিন্দা-পীর॥
আসমানে জমিনে বন্দিলাম সুরয্ আর চান্।
আল্লার কালাম বন্দি কেতাব আর কোরান॥
কিবা গান গাহি আমি, বন্দনা করি ইতি।
উস্তাদের চরণ বন্দিলাম করিয়া বিনতি॥

আলীর মালামের পাথর—হজরত আলীর পদচিহ্নযুক্ত প্রস্তর।

---

# মনসুর বয়াতি

## মদিনার বিলাপ

তালাক-নামা যখন পাইল মদিনা সুন্দরী।
হাসিয়া উড়াইল কথা বিশ্বাস না করি' ॥
"আমার খসম না ছাড়িবে পরাণ থাকিতে।
চালাকি করিল মোরে পরখ করিতে ॥
দুলাল তালাক্ দিবে, হেন নাহি লয় মনে।
মদিনারে ভালবাসে যেবা জানে-পরাণে ॥
মোরে ছাড়িয়া দুলাল রইতে না পারিবে।
কতদিন পরে খসম নিশ্চয় আসিবে ॥"

আজ আসে কাল আসে এই সে ভাবিয়া।
মদিনা সুন্দরী দিল কত নিশি গোঞাইয়া ॥
আজ বানায় তালের পিঠা, কাল বানায় খৈ।
ছিকায় তুলিয়া রাখে গাম্ছা-বাঁধা দৈ ॥
শালি ধানের চিড়া কত যতন করিয়া।
হাড়িতে পূরিয়া রাখে ছিকাতে ভরিয়া ॥
এই মত খাদ্য কত মদিনা বানায়।
হায় রে পরাণের খসম ফিরিয়া না চায় ॥
মদিনা কান্দয় : আল্লা কি লেখ্ছ কপালে।
বনের পংক্ষী হৈয়া যেন উড়িয়া গেল চলে' ॥
পরাণের পংক্ষী আমার পরাণ লইয়া গেলা।
পাষাণে বান্ধিয়া পরাণ রহিলাম একেলা ॥

## মনসুর বয়াতি

* * *

লক্ষ্মী না আঘন মাসে ধানের দাওয়া মারি।
খসম মোর আনে ধান, আমি নাড়ি চাড়ি ॥
দুই জনে বসিয়া পরে ধানে দেই উনা।
টাইল ভরে রাখি ধান, করি বেচা কেনা।
এহেন পরাণের খসম এমন করিয়া।
কোন্ পরাণে রহিলে আজ আমারে ছাড়িয়া ॥

পৌষ মাসে যখন ছা'বে শালি ধানের ক্ষেত।
আমি অভাগীর পরে যত লেৎ খেৎ ॥
হুকায় পুরিয়া পানি তামাক ভরিয়া।
খসমের লাগিয়া থাকি পন্থ পানে চাহিয়া ॥
ক্ষেত পেঁকিয়া খসম যখন দেয় গুছি।
ভাত রান্ধিয়া তার লাগি' থাকি আমি বসি' ॥
জালা আগাইয়া দেই আলের কিনারে।
কত তারিফ করে খসম ফিরে আসি' ঘরে ॥
দারুণ মাঘ মাসের শীতে কাঁপয়ে পরাণী।
ভোরে উঠি' খসম দেয় শাইল্ ক্ষেতে পানি ॥
আগুন লইয়া আমি যাই ক্ষেতের পানে।
শীতে কাঁপিয়া আগুণ তাপাই দুই জনে ॥
শাইলের দাওয়া মারি যতনে তুলিয়া।
সুখে দিন যায় রে আমার নিদান ভুলিয়া ॥

সেই ত সুখের কথা যখন হয় মনে।
মদিনার বয় পানি অঝোর নয়নে ॥

—দেওয়ান-মদিনা

---

## জামায়েৎ উল্লাহ্ বয়াতি

### ব্রহ্মপুত্র

এ দেশের উত্তর মাথালে আছে নদী বরাবর।
নদী নয় রে, সাত সমুদ্র, দেখতে ভয়ঙ্কর ॥
দেশের লোকে ডাকে তারে ব্রহ্মপুত্র কয়।
আওয়াজ করে ব্রহ্মদৈত্য পানির তলে রয় ॥
হায় রে গাঙের কী বাহার ॥
ওরে তার এ পার আছে, ও পার নাই কো,
চক্ষে মালুম হয় না পাড়।
ওরে তার পানির তলে পাক পড়েছে,
দেখ্‌তে লাগে চমৎকার ॥
বাও চালাইলে তুফান ছোটে, নাও ছাড়ে না কর্ণধার।
চালি-সমান গড়ান্ ভাঙে, ফেনা উঠে মুখে তার।
গাছ-বৃক্ষ চুবন্ খাইয়া ভাস্যা যায় রে পূব-পাহাড় ॥
হায় রে গাঙের কী বাহার ॥

---

## অজ্ঞাত

### তুফান

তুফান হৈল সে-বছর খোদার গজব।
সাগরের জলোচ্ছ্বাসে ভাসি' গেল সব ॥
জল-স্থল একাকার করল মওলাজি।
ঢলের পানিতে ডুবি' মৈল যত নায়ের মাঝি ॥

শতে শতে মর্‌ল মানুষ, কা'রে কেবা চায়।
ঘরের চালে ভাসি' কেহ পড়্‌ল দরিয়ায়॥
গরু মর্‌ল, মহিষ মর্‌ল, তুফান হৈল ভারী।
ধানের দর চড়িয়া হৈল টাকায় পাঁচ আড়ি॥
কেহ বেচে স্ত্রী পুত্র, কেহ বেচে মেয়ে।
পেট ফুলিয়া মরে কেহ সিদ্ধ পাতা খেয়ে'॥

নুরন্নেহার ও কবরের কথা

---

## পরীদিয়ার চর

দক্ষিণ সাগরে চর 'পরীদিয়া' নাম।
সেই জায়গাতে ছিল আগে পরীর মোকাম॥
আস্‌মান হইতে পরী আসিত উড়িয়া।
মানুষের সঙ্গে হৈত কত পরীর বিয়া॥
ক্রমে ক্রমে হৈল কিবা, শোন বিবরণ।
নানান্‌ দেশের মানুষ চরে কর্‌ল আগমন॥
ধাইয়া গেল যত পরী, না রহিল আর।
মানুষের বস্তি হৈল, বসিল বাজার॥
যত জেলে মাছ ধরে বেমান সাগরে।
শুকাইয়া লয় তাহা পরীদিয়া চরে॥

বেমান্‌ দরিয়ার বামে মাঝে মাঝে চর।
সেই চরেতে নারিকেল বন, দেখ্‌তে মনোহর॥
ঝরি' ঝরি' পড়ে নারকেল, মানুষে নাহি খায়।
লাখে লাখে ফেনার মতন ভাসে দরিয়ায়॥
কোনো চরে ধূ ধূ বালু, নাই রে কোনো ঘাস।
হাজারে হাজারে তায় কুমীরের বাস॥



৮

মস্ত মস্ত আণ্ডা পাড়ি' বালু ঝাপাই দিয়া।
চাহি' রয় মাদী কুমীর উপরে বসিয়া॥
আরো কিছু পশ্চিমেতে আছে এক চর।
যে-শুমার সাপ থাকে, নাম কালন্দর॥
পেরা-বনে বাঘ ভালুক কত জানোয়ার।
এক চর হ'তে আর চরে সাঁতারি' হয় পার॥

—নছর মালুম

---

## পাঠশালা

তোলবা-খানায় ছাত্র শতেক রাখিয়া
গাজী পালে সে-সকলে অন্ন-বস্ত্র দিয়া॥
সন্দ্বীপের অন্ধ এক হাফেজ আনিয়া
কোরাণ পড়ায় সবে পুণ্যের লাগিয়া॥
হিন্দুস্থান হৈতে এক মৌলভী আনিল
আরবী এলেম্ ছাত্রগণে শিখাইল॥
জুগদিয়া হৈতে এক গুরুবর আনি'
শিখাইল ছাত্রগণে বাঙ্গালার বাণী॥
ঢাকা হ'তে মুন্সী আনি' ফারসী পড়ায়
হেন মতে নানা ভাষায় এলেম্ শিখায়॥
দিন-মধ্যে নিয়ম করিল হেন মতে
দশ দশ দণ্ড ধরি' দু'ভাগে পড়িতে॥
ভোর রাত্রি চারি দণ্ড আগাজ প্রহর
পাঠের সময় করি' দিল গাজিবর॥

—শমসের গাজীর পুঁথি

---

# আবদুল করিম

## চম্পাবতী

চম্পাবতি দাঁতে যবে মিশি লাগাইত।
সৌদামিনী কোলে আহা চন্দ্র লুকাইত॥
জবা ফুল লজ্জা পায় যবে পান খায়।
তাহার তুলনা আর না হেরি ধরায়॥
খঞ্জন জিনিয়া আঁখি, বঙ্কিম লোচন।
নয়ন হেরিলে তা'র ভুলয়ে ভুবন॥
কালো মেঘ জিনি' তার দীর্ঘ কেশ মাথে।
নাগিনী লুকায় গড়ে তাহার শঙ্কাতে॥
কেশরী জিনিয়া তা'র মাঝাখানি সরু।
বনেতে লুকায় বাঘ মানি' তা'রে গুরু॥
নিতম্ব হেরিয়া তা'র মেদিনী গম্ভীর।
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে হইয়া অস্থির॥

সাত ভাই মাঝে সেই ছোট চম্পাবতি।
সবার দুলারী কন্যা বড় বুদ্ধিমতী॥
দ্বাদশ বৎসর যবে বয়স তাহার।
ঘুমায়ে গোলাপী পান করেন আহার॥

---

## গাজীর লড়াই

দলে দলে কত বাঘ সাজিয়া আইল।
বাঘের গর্জ্জনে ধরা কাঁপিতে লাগিল॥
কত রূপ এল বাঘ, কি ক'ব কথায়।
লাল বাঘ, ধলা বাঘ, জটাধারী কায়॥

বেড়া-ভাঙা বাঘ এল ভীষণ বিশাল।
অসুর ও সিংহ মারি' দেয় রসাতল ॥
দানেওয়ারা বাঘ আসে কুর্দ্দন করিয়া।
গগনের সূর্য্য যায় খাইতে ধরিয়া ॥
ভৃঙ্গরাজ বাঘ সাজে পর্ব্বত-আকার।
পাতালে বাসুকী কাঁপে গর্জ্জনে যাহার ॥
চিলা-চক্ষু বাঘ সাজে চক্ষু পাকলিয়া।
মানুষ ধরিয়া খায় চিবিয়া গিলিয়া ॥
মোনী বাঘ এল সবে আঁখি লাল ক'রে।
শৃগাল কুকুর পেলে ঘাড়ে গিয়া ধরে ॥
পেঁচা-মুখো বাঘ বাঁকা এল বাঘ খেড়ী।
আগুন বাগুন এল চিতা নাগেশ্বরী ॥
কত রঙ্গ বাঘ সাজে কত ক'ব নাম।
সে সব লিখিলে কিছু নাহি পরিণাম ॥
দলে দলে চলে বাঘ ব্রাহ্মণা নগরে।
সঙ্গেতে চলিল গাজী আষা ল'য়ে করে ॥
তর্জ্জনে গর্জ্জনে বাঘ হুঙ্কারিয়া চলে।
যেমন ঘেরিল লঙ্কা বানর সকলে ॥

ভয় পেয়ে মহারাজ কি করে তখন।
দক্ষিণা রায়ের কাছে করিল গমন ॥
সাজিয়া দক্ষিণা রায় রণ-মাঝে গেল।
তফাতে থাকিয়া গাজী দেখিবারে পেল ॥
বাহান্ন হাজার ওঠে কুম্ভীর ভাসিয়া।
দক্ষিণার সঙ্গে রণে চলিল হাসিয়া ॥

সকলে কহিল, রায় এনেছে কুম্ভীর।
বাঘ লয়ে পালাইবে এখনি ফকির॥
কুমীরে কহিল রায় বাঘ ধরিবারে।
তাহা শুনি' গাজী শাহা কহে গোস্বা ভরে॥
'যত বাঘ আছে মোর চলহ সাজিয়া।
সকল কুম্ভীরে যেয়ে ফেলহ মারিয়া॥'
গাজীর হুকুম পেয়ে যত বাঘ ছিল।
কুম্ভীর সহিত তা'রা সংগ্রাম জুড়িল॥
বাঘের হুঙ্কারে কাঁপে মেদিনী তামাম।
কাঁপিয়া দক্ষিণা রায় গায়ে বহে ঘাম॥
হুঙ্কার মারিয়া বাঘ লেজ বক্র ক'রে।
কুমীরের উপরেতে লাফ দিয়া পড়ে॥
তবে ত কুমীরগণ ক্রোধেতে কাঁপিয়া।
ধরিল বাঘের পাও দশনে চাপিয়া॥

—কালু গাজী চম্পাবতী

---

## আবদুল গফ্ফার

### শূন্য বিহার

জ্বিন পরি-জাত কিম্বা দৈত্য যদি হয়।
মনুষ্য যে সেই সবে দেখিতে না পায়॥
তবে যারে দেখা দেয়, পায় সে দেখিতে।
নতুবা কেহ না দেখা পায় কোন মতে॥—
এ বাক্যে প্রভুর নাম করিয়া স্মরণ।
পরী 'পরে নূরবক্ত কৈল আরোহণ॥

সেই স্থান হৈতে পরী রাজসুতে নিয়া।
বাতাস ভরেতে উড়ি' ফেরেন ভ্রমিয়া॥

সবে অপরূপ দেখে, বাক্য নাহি সরে মুখে,
মনে অতি লাগিলেক ধন্ধ।
মনুষ্য সে কি প্রকারে উড়িতেছে শূন্য ভরে,
কভু ইহা না হয় পসন্দ॥

—নুরবক্স-নওবাহার

---

# কমরুদ্দিন আহ্‌মদ

## পরীর নাট

শূন্য ভরে হাওয়া 'পরে রথে আরোহিয়া।
সাজ করি' সব পরী পৌঁছিল আসিয়া॥
সত্যকাল ছিল ভালো, সত্য আচরণ।
দৈত্য পরী না লুকাত মনুষ্য-সদন॥
পরী জাতি এল ভাতি মানব-সভায়।
উজালা হইল দিক, তিমির লুকায়॥
দিনমান হৈল যেন দীপ্ত পৌর্ণমাসী।
দেখি' সবে স্তব্ধভাবে হইল হুতাশী॥
মৃদঙ্গ মন্দিরা বাজে ঢোলক তবলা।
সোনার নুপুর পায়ে পরী করে খেলা॥
একে ত সুন্দরী পরী, তাতে অঙ্গে সাজ।
এ দশ হাজার পরী নাচে সভা মাঝ॥
পরীর সুরত্ কোথা দেখেছে মানবে।
সেদিন দেখিয়া হেন, রহে স্তব্ধ সবে॥

ধ্যানভাবে রহিলেক হেরি' পরিগণ।
মাটির মূরতি-মতো বর্জ্জিত-জীবন ॥
আঁখি প্রকাশিয়া নারে দেখিতে সে নাট।
নয়নে রবির জ্যোতিঃ হেন লাগে ছাট ॥

যুবতী কামিনী সবে ছাড়ি' নিজ ঘর।
নাচ দেখি' মনে সুখী, উদাস অন্তর ॥
ঝমকে ঝমকে বাজে বাদ্য সুললিত।
দেখিয়া আশ্চর্য্য নাট সবে আকুলিত ॥

—শাহে এমরান চন্দ্রভান

---

# মফিজ উদ্দীন আহ্‌মদ

## শাহ্‌জাদা ফিরোজের কেচ্ছা

ফিরোজ শা'জাদা দেখে করিয়া গওর।
নামিল কলের ঘোড়া ছাদের উপর ॥
শাহ্‌জাদা ঘোড়া হৈতে ছাদে উতারিয়া।
সেই বালাখানা বিচে গেল সিঁড়ি দিয়া ॥
বাদশার মকান এক দেখে নজরেতে।
সাহস করিয়া গেল তার ভিতরেতে ॥
দেখে বাতি জ্বলিতেছে তামাম কামরায়।
দিনের মাফিক তার আলো দেখা যায় ॥
বেলওয়ারি ঝাড় জ্বলে কান্দিল্ ফানুস।
মকানে দেখিতে নাহি পাইল মানুষ ॥
মনে ভাবে, হবে জ্বিন পরীর মকান।
কেননা দেখিতে পাওয়া না যায় ইনসান্ ॥

এইরূপ ভাবে ফেরে তালাশ করিয়া।
তার বাদে দেখে থোড়া আগেতে যাইয়া ॥
খুবসুরাত বিবি এক পালঙ্ক উপর।
শুয়ে নিঁদ যাইতেছে হ'য়ে বে-খবর ॥
সখিগণ শুয়ে' আছে তাহাকে বেড়িয়া।
অঙ্গেতে বসন নাহি, প'ড়েছে খুলিয়া ॥
রূপের বয়ান আমি কি কহিব তা'র।
বদনে তাহার রূপ আফতাব-আকার ॥
মস্তকের কেশ তার ভ্রমর সমান।
সে কেশে কয়েদ থাকে আশকের প্রাণ ॥
তামাম বদন তার গোলাবের মতো।
খোশবু ওজুদে তার ভ্রমর-গুঞ্জিত ॥
খসিয়া প'ড়েছে যেন চাঁদ পূর্ণিমার।
ঘুমায়ে র'য়েছে সেই পালঙ্ক মাঝার ॥

অস্থির হইল দেখে শা'জাদা আপনি।
পায়ের তলায় তার শুইল তখনি ॥
সে সময় শাহ্‌জাদা ঘুমেতে অস্থির।
আপনার বুকে রাখে দু'পাও বিবির ॥
নিজের সিনায় রেখে' রমণীর পদ।
কিছু তার ঝুট-সাঁচ মিলিল আমোদ ॥
চেতনা পাইল বিবি দণ্ড এক গেলে।
পুরুষ-রতন দেখে শুয়ে' পদতলে ॥
জেগে' ওঠে শাহ্‌জাদী হৈয়া এলোথেলো।
পুরুষ-রতনে দেখি' চমকি উঠিল ॥

—আলেফ-লায়লা

## মোহাম্মদ দানেশ

### বন্ধুকৃত্য

আপন মকান্ জেনে গেলাম ভিতর।
বাদ্শাহী সামান্ দেখি বড় ঘটা ঘোর॥
দেউড়ায় দারোয়ান খাড়া নকীব চোপদার।
দেওয়ালে দেওয়ালে দেখি ফানুস্ বেলোয়ার॥
গালিচা তুলিচা কত গের্দ্দা সামিয়ানা।
সাটিন মখ্মল শোভে জরির বিছানা॥
পান-দান পিক-দান কত গোলাব-পাশ।
সুবাসে মোহিত মন হইল উদাস॥
তোড়া বান্ধি' কত ফুল কাতারে কাতার।
খাঞ্চায় ভরিয়া মেওয়া আছে বে-শুমার॥

না দেখি বিবিকে সেই ঘরের ভিতর।
চারিদিকে তালাসিনু হইয়া কাতর॥
পরে দেখি বিবি বসে' বাবুর্চ্চি-খানায়।
মাথায় রুমাল বাঁধা, লাল কোর্ত্তা গায়॥
আজব ডৌলে বিবি করে নেঘাবানি।
বাতাইয়া দেয় সব দেখিয়া আপনি॥
ডেগ্ বাজে ঠন্ ঠন্, পাকায় আবজোশ।
দম্ দিল কত দেগে, দেখে' হৈনু খোশ্॥
কোপ্তা কালিয়া কোর্ম্মা কতেক কাবাব।
তামাম্ তৈয়ার আছে যতেক আস্‌বাব॥
সোনা রূপার ঘড়া তাহে পানি বরফের।
বিবি বলে, কর গিয়া দোস্তের খাতের॥

—চাহার দরবেশ

---

## ফকির মোহাম্মদ শা

### সেকালের বীরাঙ্গনা

বুড়িকে বিদায় দিয়া হানিফা মর্দ্দানা
ঘোড়ায় সোয়ার হৈল ভাবিয়া রব্বানা।
হাজার মণের গোর্জ্জ বগলে দাবিয়া
বাজারের রাহে মর্দ্দ খাড়া হৈল গিয়া।
গোস্বায় গুজুদ্ কাঁপে, দুই আঁখি লাল ;
কিরূপে লড়াই হ'বে, করেন খেয়াল।

দাসীর মুখেতে বিবি শুনিয়া এ হাল,
ভাবিল : সে থাগ্নি বুড়ী বাঁধাল জঞ্জাল।
সোনাভান বলে : দাসী, শুন ফরমান্ ;
সেতাবী আনিয়া দেহ, করি জলপান।
এ-কথা শুনিয়া দাসী করিল গমন ;
কলসী ভরিয়া আনে দুধ বিশ মণ।
দুধে জলে ত্রিশ মণ করি' জলপান,
আশি মণ খানা ফের খায় সোনাভান।
হাজার মণের গোর্জ্জ তুলি' নিল হাতে ;
আছিল লোহার জেরা, পরিল গায়েতে।
শৃঙ্গার করিয়া বিবি বামে বাঁধে খোঁপা ;
তার পরে গুজে' দিল গন্ধরাজ চাঁপা।
রাহেতে চলিল দন্ত করি' কড়মড় ;
এমন জোরেতে চলে, বহে যেন ঝড়।
সোয়ার হইয়া বিবি ঘোড়ার উপরে
ময়দানে চলিল বিবি হানিফা হুজুরে।

হানিকারে দেখি হাঁক মারে সোনাভান ;
হুঁশিয়ার হৈল মর্দ্দ হানিফা পালোয়ান।
আসি বিবি হানিফার ধরিল কোমর ;
উঠাইয়া ঘুরাইল শিরের উপর।
বিবি বলে, মারি যদি মারিয়া আছাড়,
খান্ খান্ হৈয়া যাবে হানিফার হাড় ;
ইহাকে ফেকিয়া দিব মদীনা শহরে।—
এত বলি' হানিফাকে ফেকি' দিল জোরে॥

—বিবি সোনাভান

---

## সৈয়দ হামজা

### মিলন-মাধুরী

কত দিন হানিফা জৈগুন
পোহাইল দুঃখের আগুন।
দুই জনে দেখা হ'ল যদি,
তরঙ্গিত হৈল প্রেম-নদী।
যত ছিল বিরহ-আগুন,
দেখিয়া বাড়িল দশগুণ।
খুশীতে মাতিয়া দুই জন
কাঁদে দোহে খুশীর কাঁদন।
ক্ষণে হাসে ক্ষণে কাঁদে দোহে
ক্ষণে পেরেশান্ হালে রহে।
ক্ষণে দোঁহাকার কহা শোনা,
ক্ষণে যায় ভুলিয়া আপনা।

—বড় জৈগুনের পুঁথি

---

## এরাদত-আলী

### নায়িকার প্রশ্ন

'সূর্য্য-উজাল্ বিবি' যদি সূর্য্য পানে চায়।
দেখিয়া আস্মানের সূর্য্য সেহ লজ্জা পায়॥
সূর্য্য-উজাল্ বিবির এয়ছাই অঙ্গ লাল।
আস্মানের চন্দ্র দেখে' হয় ময়লা হাল্॥
হানিফার পয়দাসেতে আল্লা ছিল সখা।
কোনো ছলে সেই বিবির সাথে হৈল দেখা॥

বিবি বলে : এক কথা কহ তো আমায়।
নবীর খান্দান্ বলি' দিলে পরিচয়॥
নবী নানা, বাপ আলী, ফাতেমা জননী।
কা'র জন্ম কোথাকারে, কহ দেখি শুনি?
বিশ্বরূপে শূন্যাকারে যবে পরওয়ার।
আছিল তখন কোথা দীনের পয়গম্বার?
কোথা ছিল চন্দ্র সূর্য্য স্বর্গ মর্ত্ত্য ক্ষিতি?
কোথা ছিল লক্ষ তারা, কোথা ছিল স্থিতি?
ভবসিন্ধু কেমনে হইবে বল পার?
কয় চিজে জান্ পয়দা হয়েছে তোমার?
আব্ আতস্ খাক্ বাত্ চারি চিজে তন্।
হায়াৎ মওত্ কথা কহ বিবরণ।
লাঠি হাতে আজ্রাইল মোর সাথে ফেরে।
তা'র কিছু ভেদ কহ, তবে পাবে মোরে॥

—ছহি বড় সূর্জ্জউজাল বিবী

---

## তাজ্জিন মহাম্মদ

### মহাম্মদী নুর

পুছিলেন ইয়ার সব, কহ আলমপানা !
কোন চিজ্ আগে পয়দা করিল রব্বানা ?
কহিলেন রসুলুল্লা সবার হুজুর,
আগে আল্লা পয়দা কৈল আপনার নুর।
গুপ্ত রূপে একা যবে ছিল পর্ওয়ার,
সেই নুর বিনে ছিল সব নৈরাকার।
আপন কুদ্‌রৎ আগে করিতে জাহের,
সে নূরে আমার নুর পয়দা কৈল ফের।
আমার নূরেতে পয়দা তামাম্ জাহান্,
আরশ কুরসি আদি লওহ লা-মাকান্।
বেহেস্ত দোজখ আর ফেরেস্তা সবায়
আমার নূরেতে পয়দা করিল খোদায়।
চন্দ্র সূর্য্য তারা আদি আকাশ পাতাল
আমার নূরেতে সব হয়েছে বহাল।
এক লাখ চব্বিশ হাজার পয়গম্বার,
আমার নূরেতে পয়দা কৈল পরওয়ার।
লাল মোতি সোনা রূপা যত জওয়াহের,
আমার নূরেতে হৈল সকলি জাহের।
চৌদ্দ ভুবন মাঝে যত কিছু রয়,
আমার নূরেতে জন্ম সকলেরি হয়।

—ছহি কাছাছল-আম্বিয়া

---

## মৃত্তিকার জন্ম

রসুলুল্লা কহিলেন সবার সদন,—
পানির ফেনাতে হৈল জমিন সৃজন।
পহেলা এলাহি আল্লা করিম রব্বানি
আপন কুদ্‌রতে পয়দা করেছিল পানি।
তারপরে হাওয়া পয়দা করে সোব্‌হান,
পানির উপরে দিল ফুঁকিতে তুফান।
হুকুম পাইয়া হাওয়া বহিল এয়ছাই,
ঢেউয়েতে ঢেউয়েতে ফেনা হৈল ঠাঁই ঠাঁই।
তার পরে আল্লাতা'লা আগ্ পয়দা করে,
ধুয়া নিকলিল সেই পানির উপরে।
সেই ধুয়া সাত হিস্সা করে সোব্‌হান,
তাহা দিয়া বানাইল সাত আস্‌মান।
হরেক আস্‌মান দূর হইল এমত,
মধ্যখানে পাঁচ শত বৎসরের পথ।

তারপরে আপনি এলাহি আল্লা সাঁই,
সেই যে পানির ফেনা ছিল ঠাঁই ঠাঁই,
সেই ফেনা জমা করি' আপে রব্ পা'ক,
তাহা দিয়া বানাইল আরজুনা খাক্।
ফেনাতে হইল মাটি, এলাহির কাম ;
কিন্তু পানি 'পরে মাটি ভাসে যেন দাম্।
পানির উপরে মাটি ঘুরিয়া বেড়ায়,
এক ঠাঁই স্থির হৈয়া থাকিতে না পায়।

হেনকালে আল্লাতা'লা করিয়া বিচার
পাহাড়ের মেখ্ ঠুকে চারি পাশে তা'র।
পাহাড়ের ভারে মাটি রাখে বে-নিয়াজ,
যেমন কায়েম্ থাকে নোঙরে জাহাজ।
প্রথম মাটির জন্ম হইল যেথায়
কা'বা শরিফের ঘর হইল সেথায়।

—ছহি কাছাছল-আম্বিয়া

---

## মহাম্মদ খাতের

### আছ্‌হাব কাহাফের ঘুম

তাহারা কহিল, ভাই, আমা সবাকার
খানা-পিনা কিছুই গরজ নাহি আর।
গরজ নাহি ক আর দুনিয়া মকাম;
মোদের ভরসা খালি এলাহির নাম।
এই বলে' শুইল ফের খন্দকের বিচে;
আজ তক্ আছে শুয়ে', কেতাবে লিখেছে।
কেয়ামত তক্ তা'রা সেই হালে র'বে।

এখানে সে বাদ্‌শা আর লোকজন সবে
কোন রূপে খন্দকের পথ না পাইয়া
আখেরে ফিরিয়া আসে নৈরাশ হইয়া।
পাহাড়েতে আছ্‌হাব্ কাহাফের তরে
ফেরেস্তা রাখিল আল্লা মোকরর্ ক'রে।
তা'দিগে শোয়াবে তা'রা করট করিয়া,
হামেশা ডাহিনে বামে দিবে ফিরাইয়া।

বেহেস্তের পাংখা হৈতে হাওয়া বহে গায় ;
গর্ম্মি আর সর্দ্দি সেথা না লাগে কাহায়।
আল্লার কুদ্রত্ হ'তে সেই মকানের
রৌদ্র না উপরে আসে, কেতাবে জেকের।
বরিষা, বরফ কিছু নাহি সেথা আছে,
তঙ্গ্ আর ফারাগত্ নাহি তার বিচে।
শুয়ে' আছে, তাহাদের আঁখি খোলা রয় ;
জাগিয়া কি নিঁদে আছে, কহা নাহি যায়।

লিখেছে, খন্দকে তা'রা প্রবেশে যখন,
হজরৎ ঈশার ওক্ত না হৈল তখন॥

—ছহি কাছাছল-আম্বিয়া

---

## সোহ্‌রাব-রুস্তম

সোহ্‌রাব কহিল, "যদি করিলে খেয়াল,
শোন তবে, একে একে কহি সব হাল।
শামগা-শাহের বেটি জননী আমার,
আমা বিনে বেটা-বেটি নাহি ক তাহার।
রুস্তম আমার বাপ বড় পালোয়ান,
যার হাঁকে জমি কাঁপে, আলম্ হয়রান ;
দেওয়ের মুল্লুক জুড়ে' কৈল ছারখার,
কত দেশ কত বাদশা হৈল তাঁবেদার।
মায়ের পেটেতে আমি ছিলাম যখন,
রুস্তম সেখান হৈতে আসিল তখন।
এত দিন পরে আমি হইনু সেয়ানা,
নাহি গেল শামগায় রুস্তম মর্দ্দানা।

এ-কারণে মোর সাথে দেখাশোনা নাই।—
একদিন পুছি আমি জননীর ঠাঁই,
'বাপ মোর কোথা আছে, কি নাম তাহার,
বাতাইয়া দেহ, যাব করিতে দিদার।'
শুনিয়া জননী মোর বয়ান করিয়া
রুস্তমের হাল সব দিল বাতাইয়া;
নাম ধাম নিশানি পাইয়া সব তার
আসিনু বাপের সাথে করিতে দিদার।
হায়, হায়, আফ্‌সোস্‌ রহিল এয়ছাই,
না পাইনু দেখা তা'র, পরাণ হারাই।"

রুস্তম শুনিল যদি এয়ছা খবর,
'হায়' বলি' ঘিরে' গেল জমিন উপর।
কান্দিয়া কান্দিয়া মর্দ্দ শিরে মারে হাত,
কহে, "হায় সোহ্‌রাব! শুনালি কী বাত্‌?"
ইহা বলি' হুঁশ-হারা হৈল পালোয়ান,
ঘিরিল শোকেতে ভূমে মৃতের সমান।

কিছুক্ষণ বাদে ফের হুঁশেতে আসিয়া,
সোহ্‌রাবে উদ্দেশি' কহে কান্দিয়া ভাসিয়া,—
"শামগার বেটি যদি তোমার জননী,
দেখাও আমারে তুমি তাহার নিশানি।
আমি সে রুস্তম, মোর কপালেতে ছাই;
আপনা খাইয়া বাছা করিনু বুরাই।
হায়, হায়, কি করিনু, হায় রে সোহ্‌রাব!
ছাতি ফেটে' যায় তোর দেখিয়া বেতাব।

কলিজা হইল কালি, আঁখি হৈল ঘোর ;
দুনিয়া আঁধার দেখি আলাপনে তোর।
হেন কাজ কেবা কোথা করে দুনিয়াতে,
বেটাকে খঞ্জর মারে আপনার হাতে!
হায়, হায়, না বুঝিয়া কী কাম করিনু ;
হেন পালোয়ান বেটা মারিয়া ডারিনু!
হায় রে সোহ্‌রাব, তোর দেখি' চাঁদ-মুখ
কলিজা উঠিল জ্বলি', ফেটে' যায় বুক।"

রুস্তম এ-কথা কহি' কান্দিতে কান্দিতে
সোহ্‌রাবের জেরা খোলে আপনার হাতে।
শামের মোহর দেখি' বাজু 'পরে তা'র
'হায়' বলি' ঘিরে' গেল রুস্তম সর্দ্দার।
কহে, "হায়, হায়, রে সোহ্‌রাব! কী করিনু!
বিনা দোষে আমি তোরে খঞ্জর মারিনু।
যতদিন বেঁচে' র'ব, ছিনা হ'তে মোর
বাহির নাহি ক হ'বে শোকের খঞ্জর।
কেয়ামত তক্ ছিনা জ্বলিবে আমার,
নাহি ক হইবে ঠাণ্ডা শোকেতে তোমার।"

—ছহি বড় শাহ্‌নামা

---

# আজহার আলী

## হায়দরী হাঁক

“আল্লা চাহে, তোমার হাতে কেল্লা ফতে হ’বে,
ইস্‌লামের ঝাণ্ডা মোর খয়বরে উড়িবে ॥”

এতেক্ বলিয়া নবী হাতে আপনার
সাজায় যুদ্ধের বেশ আলী-মর্ত্তুজার ॥

জুল্‌ফিকার তেগ্ ল’য়ে বাঁধিল কোমরে।
নিজের কোমর-বন্ধ দিল তা’র তরে ॥

ইস্‌লামী ঝাণ্ডা দিয়া মর্ত্তুজার হাতে
কহিলেন রসুলোল্লা এমনি ভাষাতে ॥

“আল্লা চাহে, ফতে পাবে ময়দান মাঝার ;
ইহুদীরা হ’বে জের হাতেতে তোমার ॥”

ওহেলা হারেস্ নামে ইহুদী সর্দ্দার
আপনার দল ল’য়ে ময়দান মাঝার ॥

কমিনা হারেস হোথা আপনার বলে
মমিন লস্কর ’পরে তেগ্ মেরে’ চলে ॥

তাহাতে কয়েক জন শহীদ্ হইল।
হজরৎ আলী তাহা দেখিতে পাইল ॥

গোস্বায় ভরিয়া চলে কাছে হারেসের।
হাঁকিল হায়দরী হাঁক এলাহির শের ॥

আল্লাহু আক্‌বর ব’লে এয়ছা হাঁক মারে,
ঝঞ্ঝনা পড়িল যেন সকলের শিরে ॥

এয়ছা জোরে হেঁকেছিল আলী পালোয়ান।
ভাবিল খয়বরী-লোক ফাটিল আস্‌মান ॥
সওয়ারী ও ঢালী কত পালাইল ঘোড়া।
হাতী উট ভাগে ভয়ে, নাহি রহে খাড়া ॥
দৈত্য ও রাক্ষস ভাগে শুনিয়া সে হাঁক।
জঙ্গলের বাঘ ভাগে বুঝিয়া বিপাক ॥
পাহাড়ের চূড়া খসে হাঁকের ধমকে।
আজ্‌দাহা লুকায় গড়ে পড়িয়া চমকে ॥
হাঁকের আঘাতে কেহ বেঁহুশ হইল।
ভয়েতে ইহুদীগণ কাঁপিতে লাগিল ॥
এমন সময় আলী হানে জুল্‌ফিকার।
এক চোটে মারা গেল হারেস্‌ গোঙার ॥

—জঙ্গে রসুল্‌ ও জঙ্গে আলী

---

# আজিমদ্দিন আহ্‌মদ

## খালেদের অভিষেক

উটের পিঠের 'পরে রসদ বোঝাই
করিছে রুমীয়গণ মিলিয়া সবাই।
আছে সেথা ছয়শত রুমীয় পল্টন;
খালেদ কহিল, "শোন মুসলিমগণ!
ওয়াদা করেছে খোদা কোরাণ মাঝার,
মদদ্‌ করিবে তিনি তোমা সবাকার।
তোমাদিগে তোমাদের দুশ্‌মনের 'পরে
ফতে দিবে, কহে আল্লা কোরাণ ভিতরে

জেহাদ্ ফরজ্ হ'ল দুশ্‌মনের সাথে,
ফরমায়েছেন আল্লা পাক্ কালামেতে।
নিশ্চয় খোদার দোস্ত জানিবে তাহারা,
একযোগে তাঁর পথে আসিবে যাহারা।
দুশ্‌মন উপরে হাম্‌লা করিতেছি আমি,
আমার সঙ্গেতে সবে হও অনুগামী।"
এ বলি' করেন হামলা খালেদ জোয়ান্;
সাথে সাথে হাম্‌লা করে যত মুসল্‌মান।

"আস্‌মানের দর্‌ওয়াজা গিয়াছে খুলিয়া,
বেহেস্ত সাজানো হ'লো মোদের লাগিয়া;
হুরগণ আসিতেছে নিকটে চলিয়া,
আর কেন দেরী, যাও তৈয়ার হইয়া!"—
এ বলি' খালেদ বীর হয় আগুয়ান,
রুমীদের দলে পড়ে বাঘের সমান।
ইস্‌লামী সিপাহিগণ মারে রুমীদিগে;
বহু রুমী মারা গেল, বাকী গেল ভেগে'।

লুটিল রসদ আদি বহু ধন মাল;
আমর সর্দ্দার দেখি' হইল খোশহাল।
দেয় আবু-ওবায়দারে খুশীর খবর;
পৌঁছায় আরেক খত খলিফা বরাবর।

খত পেয়ে খুশী হন্ সিদ্দিক আকবার;
অবশেষে পুছেন হাল আবু-ওবায়দার।
আমর কহেন, "তিনি শামের সীমায়
লাচার হালেতে বসে' আছেন তথায়।

কারণ, শুনেছেন তিনি, রুমী সেনাগণ
আজনাদীনে জড় হ'ল অসংখ্য অগণন।
মুস্‌লিমগণের তরে ভাবিছেন তিনি ;
দুশমন চড়াও করে, মনে এই গণি'।
দুশমন গালেব হয় তাহাদের 'পরে,
বড়ই ফেকেরে তিনি আছেন এরি তরে।"

আমরের মুখ্ হাল শুনিল যখন.
মনে মনে ভাবিলেন খলিফা তখন—
'আবু-ওবায়দা বড় নরম মেজাজ,
রুমীদের সাথে লড়া নহে তার কাজ।'
তখন এরাদা তিনি করেন অন্তরে,
খালেদ-বিন্-ওলিদেরে লড়াইয়ের তরে।
সর্দ্দার বহাল্ তিনি করেন তাহারে ;
দুশমন হালাক্ হ'বে তা'র তরবারে।
খালেদেরে লিখিলেন খলিফা তখন,
"সালাম জানিবে তুমি, তারিফ-বচন।
রুমীয়দিগের সাথে করিতে লড়াই,
সর্দ্দার করিয়া আমি তোমাকে পাঠাই।
অতএব শীঘ্র তুমি হও অগ্রসর,
কতল্ করিয়া এস দুশমন-লস্কর !
মুস্‌লিমগণের আর আবু-ওবায়দার
উপরে করিনু আমি তোমারে সর্দ্দার।
এই দোওয়া করি আমি অন্তরে সদায়,
তোমা সবে সালামতে রাখুন খোদায়।"

—মজমুয়ে ফতুহশাম

## মীর মশার্‌রফ হোসেন

### ঈশ্বর-নির্ভরতা

শক্তিশালী যোদ্ধা এক কোরেশ-প্রধান,
বড়ই দুর্দ্দান্ত সে যে মহা-বলবান।
কিছু দূর চলে' যেতে দেখে' তাকাইয়া,
কে যেন গাছের তলে রয়েছে শুইয়া।
আর কিছু দূর গিয়ে দেখে নিরখিয়ে,
হজরত বিভোর ঘুমে রয়েছেন শুয়ে।
দেখিয়ে কোরেশ ভাবে হ'য়ে হরষিত,—
"আমার সুকীর্ত্তি ভবে হইবে ঘোষিত।
কোরেশের মহাশত্রু, দেবতার অরি,
পাইয়াছি হাতে আজ, ছাড়িব না ধরি'।
ধরিয়া লইলে পাছে কি জানি পালায়,
এখনি মারিব প্রাণে তরবারি-ঘায়।
লটকাইয়া দিব শির মন্দিরের দ্বারে,
দেখিবে দেবতাগণ হাসিবে অন্তরে।
হাজার হাজার বীর হাজার সওয়ার,
পারিল না যাহা, আমি ধরি' তরবার
সেই কার্য্য একা একা করিয়া সাধন
জগতে নূতন কীর্ত্তি করিব স্থাপন।"

এই কথা মনে করি' ভার্থার চলিল,
পরম উৎসাহে অশ্ব তেজে চালাইল।

অশ্ব-পদধ্বনি গিয়ে পশিল কর্ণেতে,
হজরতের নিদ্রা-ভঙ্গ হইল তাহাতে।
দেখিলেন চক্ষু মেলে'—ঘোর চক্ষু লাল,
অশ্বে চড়া, গোঁপ মোড়া, হাতে খাঁড়া ঢাল।
কোমরে কাটার আর পৃষ্ঠেতে তূণীর,
বাম পার্শ্বে ধনু ঝোলে, তূণে তীক্ষ্ণ তীর।
বর্ম্মে আঁটা বীর বপু, শিরেতে উষ্ণীষ,
চক্ষু ফেটে তেজ সহ ক্ষরে যেন বিষ।
হাঁক ছেড়ে' এসে পড়ে হজরত উপরে,
খরধার তরবারে মাথা কাটিবারে।
তরবারি উচ্চ করি' হাঁকে এ বচন,—
"বল মোহাম্মদ, তোকে কে রক্ষে এখন?"

প্রশ্নমাত্র হজরত করেন উত্তর,—
"রক্ষিবেন এ-দাসেরে জীবন্ত ঈশ্বর।"
এই ক'টি শব্দ যেন বজ্রধ্বনি সম
পশিল ডার্থার-কাণে, লাগিল বিষম।
ভয়েতে বিহ্বল হয়ে হৃদয় কাঁপিল,
হস্ত হ'তে তরবারি মাটিতে পড়িল।
অজ্ঞান অচল বৎ খাড়া হয়ে রয়,
কোন কথা নাহি মুখে, যেন কত ভয়।
ত্রস্ত হস্তে হজরত করে অসি লয়ে'
বলিলেন এই কথা অসি উত্তোলিয়ে :—
"বল্ তো কাফের, তোরে কে রক্ষে এখন,
এক ঘাতে যায় যদি তোর এ জীবন?

যেই বারিতা'লা সর্ব্ব-দয়ার আধার,
তিনিই সকল হ'তে শ্রেষ্ঠ সবাকার।
তাঁহারই আদেশে হয় জয়-পরাজয়;
মানবের বাহু-বল কিছু নয় নয়।"

—মোস্লেম বীরত্ব

---

# মোজাম্মেল হক্

## উদ্দীপনা

যাও কর্ম্মভূমে ত্বরিত গমনে,
জীবনের ব্রত সাধ প্রাণপণে,
শুভদা বিদ্যার বিমল কিরণে
আলোকিত করো হৃদয়-ধাম।
পরস্পরে সবে হইয়া মিলিত
চির-ভ্রাতৃভাব করহ স্থাপিত,
উন্নতির পথে হও হে ধাবিত—
সমুজ্জ্বল করো জাতীয় নাম॥
তবে ত হইবে কলঙ্ক মোচন,
তবে ত দেখিবে সুখের বদন,
যশঃ-মান-ধন প্রীতি-সম্ভাষণ
চারিদিক্ হ'তে স্বতঃই পা'বে।
দেখিয়া জগৎ মানিবে বিস্ময়,
চমক লাগিবে দেখে' অভ্যুদয়,
মানব বলিয়া দিয়া পরিচয়
তখন সকলে মহিমা গা'বে॥

—জাতীয় ফোয়ারা

## জমজম্

এ কি কথা আজি, হায়, স'রার বদনে!
শুনে' ইব্রাহিম ব্যথা পাইলেন মনে।
নির্ম্মম হইয়া হিয়া বাঁধিয়া পাষাণে,
হাজেরারে আর তাঁর দুধের সন্তানে
নিয়ে ত্বরা গৃহ হতে হইলা বাহির।
কোথা যাবে? কোন্ দিকে? নাহি কিছু স্থির।

চলিতে চলিতে দূরে মক্কার প্রান্তরে,
উপনীত হইলেন চিন্তিত অন্তরে।
বিজন মরুভূ সেই অতীব ভীষণ,
নরের পদাঙ্ক তথা পড়ে না কখন।
হেন স্থানে সুতসহ প্রাণের কামিনী—
করিলেন নির্ব্বাসিত আহা একাকিনী।

এদিকে সরলা সাধ্বী হাজেরা সুমতি
স্নেহের কুমারে বুকে ধরি' পুণ্যবতী
বসিলেন ধরাসনে, হায় রে কপাল!
সতীর উপরে এত ক্লেশের জঞ্জাল!

অকস্মাৎ কোথা হতে অনিল-নিস্বনে
পশিল আওয়াজ এক তাঁহার শ্রবণে।
ক্ষণ পরে ধর্ম্মরতা হাজেরা সুন্দরী
অদূরে ঐশিক এক দূতে দৃষ্টি করি'

যত দুঃখ কহিলেন মলিন বদনে ;
দূতবর আদ্যোপান্ত শুনে' স্থির মনে
প্রকাশিলা আহা সমবেদনা বিস্তর,
কহিলেন সান্ত্বনার বাক্যে অতঃপর—
"পুণ্যবতি ! ক্ষুণ্ণমতি নাহি হও আর,
ঐশিক আশ্রয়ে সুখে থাকো অনিবার।"

কথোপকথন-কালে হাজেরার সনে
দূতবর কী ভাবিয়া আপনার মনে
পদাঙ্গুলে ধরাতল করেন খনন ;
ক্ষুদ্র সেই ভূ-বিবর সুক্ষণে তখন
হাজেরার পুণ্যবলে উৎসের আকারে
দেখা দিল, শুভ্র স্বাদু-স্নিগ্ধ জলধারে।
স্ফটিক সমান সেই অতি নিরমল
স্বাদু নীর পিয়ে' সতী স্থির সুশীতল।

এই উৎস পুণ্য-পয়ঃ বিশ্ব-ধরাধামে
হইয়াছে সুবিখ্যাত 'জম্‌জম্' নামে।
কতকাল গত হ'ল কাল-পারাবারে,
সংঘটিল পরিবর্ত্ত কত এ সংসারে ;
পর্ব্বত সরিৎ কত হ'ল তিরোধান,—
কিন্তু এ পবিত্র কূপ আজো বর্ত্তমান।
আজো সে প্রাচীন কথা স্মরিয়া মানসে
পুণ্যজল পিয়ে' সবে মজি' ভক্তিরসে।

—হজরৎ মোহাম্মদ

---

# কায়কোবাদ

## মহাশ্মশান

পুরাতন দিল্লী-প্রান্তে কানন ভিতরে
একটি প্রকাণ্ড গৃহ কাল-অস্ত্রাঘাতে
জীর্ণতম, অগণিত চূড়া মনোহর
ভগ্নপ্রায়, গতপ্রায় শোভা অনুপম।

স্থানে স্থানে কক্ষে ছাদে প্রাচীর উপরে
সুদীর্ঘ অশ্বত্থ-বৃক্ষ বাহু প্রসারিয়া
ক্রমশঃই ঊর্দ্ধ শিরে ছুঁইছে গগন।

গৃহ মাঝে স্তূপাকারে আবর্জ্জনা-সহ
মূষিক-মৃত্তিকা-রাশি, জম্বুক-পুরিষে
বিমিশ্রিত, অঙ্কুরিত তৃণ-গুল্ম কত
মাঝে মাঝে, অবিশ্রান্ত ঘনবৃষ্টিজলে
প'ড়েছে শেওলা ভগ্ন প্রাচীরের গা'য়।

কোথা ঊর্ণনাভ-জাল, কোথা টিকটিকি
পেচক বাদুর ঘুঘু বহু বিহঙ্গম
বৃক্ষ 'পরে, ক্ষুদ্র ঝোপে প্রাচীর-কোটরে
নির্ব্বিবাদে পাতিয়াছে রাজত্ব আপন।

মাঝে মাঝে ভগ্নপ্রায় ইষ্টক-নির্ম্মিত
অসংখ্য সমাধি, ক্ষুদ্র গহ্বরে তাহার
কতরূপ হিংস্র জন্তু বিকট-দর্শন।

জনশূন্য পুরী, নাহি লোক-সমাগম ;
তাড়াইয়া সংসারের ঘোর কোলাহল
জাগিছে চৌদিকে শুধু গভীর স্তব্ধতা।
পার্শ্বদেশে ক্ষুদ্রাকৃতি মসজিদের মত
একটি অত্যুচ্চ গৃহ, অভ্যন্তরে তার
একটি সমাধি ভগ্ন ; গিয়াছে খসিয়া
আস্তর, বৃষ্টির জলে প'ড়েছে শেওলা।
সম্মুখে প্রবেশ-দ্বার, কালের কুঠারে
ভগ্ন সে কপাট এবে, পরিবর্ত্তে তার
উর্ণনাভ-জাল এবে স্থাপিত সে দ্বারে।
নিম্নে পদতলে ভগ্ন সমাধি-গহ্বরে
মানব-কঙ্কালরাশি। সমীর-স্বননে
কে যেন অদৃশ্যভাবে কহিছে মানবে
এ শ্মশানে, "এ জগত নিশার স্বপন ;
সকলি অনিত্য ভবে, শুধু নিত্য তিনি
যাঁহার নিয়তি-তন্ত্রে বাঁধা এ-ভুবন।"

বায়ু-শব্দে, শকুনির পক্ষ-সঞ্চালনে
ধ্বনিত দিবসে এই ভীষণ প্রান্তর।
কত রাজা, কত প্রজা, কত যে সম্রাট্
হিন্দু মুসলমান, হায়, এ জন্মের মত
রয়েছে মিশিয়া এই ভীষণ শ্মশানে
অই ধূলাবালি-সহ ; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে
এ মহাশ্মশান-দৃশ্য বীভৎস বরণে
কত বিভীষিকা-মূর্ত্তি করি' প্রদর্শন
উৎপাদিছে মহাভীতি মানব-হৃদয়ে!

একবার দাঁড়াইলে মুহূর্ত্তের তরে
ঐ শ্মশানে, আপনার অস্তিত্ব ভুলিয়া
মিশিয়া যাইবে তুমি অনন্তের সনে।
হিন্দুর সৌভাগ্য-লক্ষ্মী মহাপরাক্রমে
প্রতিষ্ঠিয়া আর্য্যধর্ম্ম ভারতের বুকে
মিশিয়া গিয়াছে এই চিতাভস্ম সনে।
সেই শ্মশানের 'পরে, সেই চিতাভস্মে
মোস্‌লেমের নবরাজ্য হইল স্থাপিত
নবভাবে; এই জাতি ভীষণ বিক্রমে
উত্থানের শীর্ষদেশে করি' আরোহণ
শাসিল-ভারত যবে, শত জয়ধ্বনি
উঠিল আকাশ-পথে প্লাবিয়া ভারত;
ভারতে ইসলাম-ভিত্তি হইল পত্তন।

বিধির অনন্ত লীলা, পশ্চিম আকাশে
সাজিল প্রবল মেঘ, বর্ষিল ভীষণ
বিদ্যুতাগ্নি, সে অনলে হল দগ্ধীভূত
ইস্‌লামের মহাশক্তি দেখিতে দেখিতে,
হইল পতন তার সেই ভস্মস্তূপে।

এই দিল্লী হিন্দুদের ভীষণ শ্মশান;
এই স্থানে মোস্‌লেমের পাঁচটি সাম্রাজ্য
মিশিয়া গিয়াছে অই ধূলা-বালি সনে।
মোসলেমের ইতিহাস, উত্থান-পতন
অঙ্কে অঙ্কে বিজড়িত এ মহাশ্মশানে।
ঐ শ্মশান মানবের মহাশিক্ষা-স্থল।

ভগ্নস্তূপে মহাকাব্য, প্রতিরেণু সনে
সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মহাতত্ত্বরাশি
সংজড়িত, সুনির্ম্মল দর্পণের মত
মানব-অবস্থা-রাশি বিম্বিত এখানে।
এই স্থানে—এ গভীর ভীষণ শ্মশানে
কত কবি, কত বীর, কত রাজ্যেশ্বর,
ধর্ম্মাত্মা পাপাত্মা কত প্রেমিক প্রেমিকা
নিদ্রিত জন্মের মত ;—দিল্লীর অদৃষ্টে
সমাধির পরে হায় সমাধি কেবল।
ইহাই ত ধ্বংস-নীতি ? এ নীতি বিহনে
জগত উন্নতি-পথে যাইত কেমনে ?
ধ্বংস বিনা জগতের ঘোর অমঙ্গল।
এই ধ্বংস-গর্ভে সৃষ্টি লভিছে জনম।
এই নীতি জগতের সৃষ্টির কারণ।
এ নীতি ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী, জড়ে ও অজড়ে
চেতনে উদ্ভিদে হায় সর্ব্বত্র প্রকাশ।

—মহাশ্মশান কাব্য

---

## সৈয়দ আবুল হোসেন

### একটি স্থানের বর্ণনা

এই বৃক্ষে করে প্রেত নিশায় উৎপাত।
ঐ সরসীর তীরে জটাময়ী কটাকেশী শুকায় চিকুর ;
তারি পাশে বিল্ববৃক্ষে মাথা-কাটা মহাবীর রহে আরোহিয়া।
ঐ শ্মশানের পাশে গভীর নিশায়
কোকাইয়া কাঁদে শিশু অদ্ভুত মায়ায়।

—স্বর্গারোহণ কাব্য

# এস্‌মাইল হোসেন সিরাজী

## এজিদের সভায় মন্ত্রণা

সুরম্য বিশাল কক্ষ, স্তম্ভাবলী শিরে
স্বর্ণবর্ণ পুষ্পপর্ণ-বিখচিত ছাদ
শোভিতেছে, শোভে যথা মেঘরেখা-শূন্য
ঋক্ষজালে সমাকীর্ণ শারদ গগন।
স্তম্ভে স্তম্ভে পুষ্পমালা, মুক্তামালা-সহ
দুলিছে পবন-দোলে,—দীপাবলী-প্রভা
কর্ব্বূর-কিরণ-পুঞ্জ করি' বিকীরণ
বিচিত্র বরণে গৃহ করেছে প্রোজ্জ্বল।

হেন হর্ম্ম্যতলে বসি' রাজেন্দ্র এজিদ
দ্বিরদ-রদ-রচিত বিচিত্র আসনে
ফুল্ল অরবিন্দ সম প্রফুল্ল বদন;
কিন্তু চিন্তা-ভ্রমরের সুতীব্র দংশনে
ঈষৎ মলিন যেন। সম্মুখে আসীন
মন্ত্রণা-কুশলী মন্ত্রী, বামে সেনাপতি।

নিস্তব্ধ গম্ভীর গৃহ। রাজেন্দ্র এজিদ
কহিতে লাগিলা ধীরে সম্ভাষি' সচিবে:
"মন্ত্রীবর! মনোভীষ্ট সিদ্ধ এতদিনে;
আমি এবে রাজ্যেশ্বর, এরাক আজম
মিশর, তাতার, শ্রাম করতলগত;
সবাই শরণাগত; বিশাল সাম্রাজ্যে

নাহি ক কণ্টক কিছু। কিন্তু এক ভয়,
দুর্ম্মতি স্পর্দ্ধিত শত্রু আলীর তনয়
হোসেনের তরে শুধু। কি জানি কখন্
কিবা ষড়যন্ত্র করে! তেজঃদীপ্ত সিংহ;
পিতৃহীন, ভ্রাতৃহীন, ঘোর নিরাশ্রয়;
কিন্তু কি দারুণ দম্ভ! কি ভীষণ স্পর্দ্ধা!
অনুমাত্র ভীত নহে, এখনও সগর্ব্বে
বিচরিছে মদীনায়, ক্ষুব্ধ সিংহ যথা
যূথভ্রষ্ট হ'য়ে, হায়, বিচরে কাননে।
মনে তাই সদা ভয়। কনিষ্ঠ এমামে
দাসত্বের দৃঢ় পাশে আবদ্ধ করিয়া
মদীয় অনুসরণে না করিলে ব্রতী,
কিসের গৌরব মম? দামেস্ক-রাজের
কী গৌরব? যদি নাহি মানিল তাঁহারে
প্রেরিত-পুরুষশ্রেষ্ঠ-বংশ-অবতংস?"

এতেক কহিলা যদি রাজেন্দ্র এজিদ্,
উত্তরিলা মন্ত্রী তবে বিনম্র বচনে,—
"মহারাজ! যা কহিলে, সত্য সমুদয়।
সকলি বিদিত দাস। কিন্তু কোন্ হেতু
ভাসিতেছ, হে রাজন! চিন্তার সাগরে?
কি ছার হোসেন সেই আলীর তনয়,
রাজ্যহীন, বলহীন, কী শকতি তার?
ইচ্ছা যদি, হে ভূপেন্দ্র! সহস্র হোসেনে
পলকে বাঁধিতে পার দাসত্ব-নিগড়ে।

অগণন সেনা তব, লক্ষ লক্ষ বীর
শির দানে অগ্রসর আদেশে তোমার।
যদি সে আলীর পুত্র বিনত মস্তকে
তব অধীনতা নাহি করয়ে স্বীকার,
পাঠাও তা হ'লে ত্বরা অযুতেক সেনা
নাশিতে সবংশে তা'রে, মদীনা নগর
ভাসাইতে রক্তস্রোতে,—উম্মিয়া-বংশের
শত্রুকুল নিরমূল হোক একেবারে।"

এতেক কহিতে মন্ত্রী সেরাজুল রোমী,
ভাষিলা সেনানী তবে বিনীত বচনে,—
"হে ভূপাল-কুলচূড়! আজ্ঞা যদি দেহ,
সমগ্র মদীনাবাসী নরনারী-সহ
হোসেনে আনিতে পারি বাঁধিয়া শৃঙ্খলে।
কিম্বা যদি আজ্ঞা হয়, মদীনা নগরী
অশ্বখুরাঘাতে করি' রেণু পরিণত
লোহিত সাগর-জলে পারি ভাসাইতে।
কিবা শঙ্কা, হে রাজেন্দ্র! মৃগেন্দ্র কখন
ডরে কি কুরঙ্গে বিশ্বে? দাবানল-শিখা
পরাঙ্মুখ পুড়াইতে কবে শুষ্কতরু?"

—মহাশ্মশান কাব্য

---

# মোহাম্মদ হামিদ আলী

## কারবালা-প্রান্তরে

কার্ব্বালার এই সেই মরু ভয়ঙ্কর।
চারিদিকে শব্দ এক মিশি' বায়ু-সনে
ধ্বনিতেছে 'হায়' 'হায়'! প্রকৃতি সুন্দরী
ভবিষ্য বিপদে যেন নবীর বংশের
কাঁদিতেছে বিলাপিয়ে 'হায়' 'হায়' রবে।

কলকল স্বরে ওই ফোরাত-প্রবাহ
তপ্ত বালি-তাপে তাপি' যেন কেঁদে কেঁদে
চলেছে সাগর পানে—বিরাম-আগারে।

এ-সংসার মায়াস্থল বড়ই ভীষণ।
ভীষণ, ভীষণতর লীলা বিধাতার!
বিজ্ঞ হইলেও নর না পারে মুছিতে
ললাট-লিখন! আহা! ওই হোথা হের—
ইমাম হোসেন, ষষ্টি সহস্র সৈনিক
পুরুষ সহিত, ভুলি' কুফার সরণি
জনপ্রাণীহীন এই মাঠে উপনীত।

কালস্রোতে ভাসমান মদিনা-অধিপ
পাইলা গমনে বাধা পথে এক স্থানে;
প্রবেশিল ভূমিগর্ভে স্বীয় অশ্বপদ।
তেকারণে অশ্ব হ'তে নামি' চতুর্দ্দিক
নিরখিলা স্থিরনেত্রে চিন্তিত হৃদয়ে।

কিছুক্ষণ পরে নৃপ সম্বোধি' সকলে
কহিলেন মিষ্টভাষে উৎকণ্ঠিত স্বরে,—
"সৈন্যবর্গ, সৈন্যাধ্যক্ষ, এ কি মহাভুল !
এ কি ঈশ্বরের লীলা, এ কি খেলা তাঁর ?
কুফাপথে আসিয়াছি এই মরুভূমে।
গূঢ়তর তত্ত্ব এক শুন তবে বলি ঃ
কোনোকালে মাতামহ—জীবিত যখন—
সম্বোধি' বলেন মোরে—'অশ্ব-আরোহণে
চলিতে চলিতে পদ তোমার অশ্বের
প্রবেশিবে যেই স্থানে, সে ভীষণ স্থান
মম বংশ-রক্তস্রোতে হইবে রঞ্জিত।
বিধির এ-বিধি, বৎস ! নহে লঙ্ঘনীয়।
দেখ, সে বিপদ-কালে অধীর কখন
হইও না ক্ষণ তরে। বিপদ-সময়ে
স্মরিবে ঈশ্বরে সদা, বীরকুলোত্তম !'
তাই অনুমানি, এই ভীষণ মরুতে
ফলিবে ভবিষ্য-বাণী মহাপুরুষের।
ভয়াবহ স্থান এই, শূন্য জনপ্রাণী,
না আছে ভরসা কভু লভিবারে জল—
বিন্দু পরিমাণ জল এহেন মরুতে।"

—কাসেমবধ কাব্য

# সৈয়দ এমদাদ আলী

## সেকেন্দ্রা

এইখানে মোগলের মুকুট-রতন
শায়িত শান্তির মাঝে ; পথিক সুজন
নেহারিয়া এ-সমাধি ভক্তিপ্লুত মনে
সম্ভ্রমে নোয়ায় শির ; হৃদয়-গগনে
ভাসে তা'র কত ছবি, কত পুণ্য-কথা,
কত বরষের, হায়, কত শত ব্যথা !

মনে পড়ে অতীতের দিল্লী-দরবার,
মোগলের শত হর্ম্ম্য সুষমা-আগার !
মনে পড়ে, এই পথে এমনি সময়ে
বীর-যোদ্ধা অগণন উৎফুল্ল হৃদয়ে
চলি' যেত অবিরাম ; আর আজি, হায় !
ভাঙ্গিতে এ নীরবতা ঝিল্লি ভয় পায়।

যে জন শায়িত হেথা অন্তিম-শয্যায়,
কত রাজা মহারাজা তাঁহারি সভায়
অবিরল কলভাষে কহিত কাহিনী,
কত বীর-আস্ফালনে কাঁপিত মেদিনী ;
কত কবি ঝঙ্কারিয়া সুমধুর তান
নিয়ত তুষিত কত মহাজন-প্রাণ !
সেই সভা-মাঝে নিত্য ফয়েজী, ফজল,
বীরবল, তোডরমল, অমাত্য-সকল,

প্রকৃতি-পুঞ্জের হিতে দিবসে নিশায়
সমদর্শী সম্রাটের সঙ্গে থাকি', হায়,
কত নীতি শুভঙ্করী করিত রচনা,
প্রজা-হিতে নৃপ-হিত করিয়া কামনা।

মোস্‌লেম হিন্দুরে বাঁধি' প্রেমের বন্ধনে,
প্রতিষ্ঠিত এক ক্ষেত্রে অভিন্ন পরাণে
চেয়ে' ছিল দেখিবারে যেই মহাজন,
সেকেন্দ্রা তাঁহার অস্থি করিছে ধারণ॥

—ডালি

---

## মোহাম্মদ মেহেরউল্লাহ্

### মেয়েলী পাঁচালী

মেয়েলী পাঁচালী আর কি লিখিব, হায়!
লিখিতে লেখনী মোর শিহরে ঘৃণায়।
ঝুলি-কাঁথা পুঁজি-পাটা সকলি বেচিয়া
বানায় গহনা-আদি বিবির লাগিয়া।
পরিয়া সে-সব বিবি আপন শরীরে
ঢুলিয়া ঢুলিয়া যবে মোহে মিএাজীরে,
তখন প্রকৃতি কহে ঘোর উপহাসে—
মূর্খতার শোভা কোথা এ বিশ্ব-আবাসে?

—ইস্‌লামী বক্তৃতামালা

---

## শেখ ফজলুল করিম

### আহ্বান

ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে' যায়—দামাল ছেলের মত ;
ডাক দে' বলে, "আয় রে তোরা আয়,—ডাক্‌ব তোদের কত !
মুক্ত মাঠের মিষ্টি হাওয়া জোটে না যা' ভাগ্যে পাওয়া,
হারাস্‌ নে ভাই অবহেলায় রে,—দিন যে হ'লো গত।"
ধানের ক্ষেতে বাতাস নেচে' যায়—চপল ছেলের মত ॥

ছোট্ট নদী কোন্ সুদূরে ধায়—বক্ষে রজত-ধারা ;
ডাক দে' বলে, আয় রে ছুটে আয়,—রুগ্ন, সাহস-হারা !
লাগ্‌লে মাথায় বৃষ্টি-বাতাস উল্টে যায় কি সৃষ্টি আকাশ,
রোদের ভয়ে থাকৃলে শুয়ে' রে—নৌকা বাইবে কা'রা ?"
ছোট্ট নদী কোন্ সুদূরে ধায়—বক্ষে রজত-ধারা ॥

সবুজ বনের শীতল কোলের কাছে—একটি খড়ো ঘর ;
ডাক দে' বলে, "ভুলেছ ভাই মোরে,—তাই ভেবেছ পর।
ইটের পাঁজায় চক্ষু বুজে' নিত্য নূতন অভাব খুঁজে'
শেষ হ'বে তোর জীবনধারা যে,—থাকৃবে বালুচর।"
সবুজ বনের শীতল কোলের কাছে—একটি খ'ড়ো ঘর ॥

সাত-সকালে ঝাঁপী-মাথায় চাষী—মাঠের দিকে যায় ;
ডাক দে' বলে, "এই ত তাদের পথ, বাঁচতে যারা চায়।
পেটের ক্ষিদে মিটে না যার     এই ধরাতে ঠাঁই কোথা তার ?
বাঁচ্‌তে হ'লে লাঙল ধর রে—আবার এসে গাঁয়।"
সাত-সকালে ঝাঁপি-মাথায় চাষী—মাঠের দিকে যায়॥

---

# মিসেস্ আর্ এস্ হোসেন

## চাঁদ

নিঠুর নিদয় শশি।     সুদূরে গগনে বসি'
কি দেখিছ ? জগতের হিংসা পাপরাশি ?
—মোরে দেখে পায় তব হাসি ?

যখন তাপিত প্রাণে     চাহি তব মুখ পানে,
তোমার এ হাসি দেখে হিংসা হয় চিতে।
—আমি কেন পারি না হাসিতে ?

জগতের দুঃখ-ভয়     তোমাদের সঙ্গী নয়,
পাপ-তাপ তোমাদের কাছে নাহি যায়।
—তা'রা কেন আমারে কাঁদায় ?

তুমি নীলিমার দেশে     যথা ইচ্ছা যাও ভেসে,
অনন্ত আকাশ যেন তোমারি আলয়।
—আমি কেন পাই না আশ্রয় ?

—পদ্মরাগ

---

# মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্

## তাজা ব-তাজা

মত্‌রিবে খোশ্‌-নাওয়া বিগো তাজাঃ ব-তাজাঃ নও ব-নও।
বাদ এ দিল্‌কুশা বি-জো তাজাঃ বতাজাঃ নও ব-নও ॥

—হাফিজ

গাও হে গায়ক মধুর সুতান
তাজা তাজা নিতুই নূতন।
লাও পেয়ালা, খুলুক পরাণ—
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥
পুতুল-পারা কান্তা সাথে
সুখে ব'সে নিরালাতে
প্রাণ ভ'রে তার চুমু দান
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥
রূপোর বরণ সাকী আমার!
ঢালো শরাব, নেশা নাই আর,
পূর্ব পেয়্‌লা কাণা-প্রমাণ
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥
মুর্খ রে! তোর বেঁচে কি কাম
শরাব যদি করলি হারাম?
তার খেয়ালে শিরাজী টান্‌
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥
মনচোরা মোর প্রিয়া যে, ভাই!
আমার তরে করে সদাই
বেশ-ভূষা রঙ সাজ কতখান
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥

বও যদি ধীর প্রভাত-সমীর
গলি দিয়ে সেই পরীটির,
শুনিয়ো তা'রে হাফিজী গান
তাজা তাজা নিতুই নূতন ॥

—দীওয়ান-ই-হাফিয

## মোহাম্মদ লুৎফর রহমান

### জীবন-হর্ম্ম্য

তুমি না-কি ভালো শিল্পী, করিছ প্রচার ?
গড়িয়াছ তুমি না-কি হর্ম্ম্য চমৎকার ?
বৃথা অহঙ্কার ; ত্রুটী হের শত শত
প্রাচীর-পিধানে তব আছে জুড়ি' কত !
ও-গুলি পড়ে না বুঝি দৃষ্টিতে তোমার ?
ও-ত্রুটী পুণ্যের হেরি আঁধার বিকার।
অসম্পূর্ণ রহিয়াছে তব অট্টালিকা ;
গড়ি' পুনঃ পরো শেষে বিজয়-মালিকা।

—প্রকাশ

## মোহাম্মদ আকরম খাঁ

### পথ

ফিরে চল ফের ভাই কোরাণের পানে
নিজেরা বুঝিয়া তাহা, বুঝাও মোমেনে।
পথ পা'বে, আলো পা'বে, চিনিবে মঞ্জিল
আল্লা হ'বে সাথী ফের আসান্ মুস্কিল ॥

—পাকিস্তান-নামা

# কাজী আবদুল ওদুদ

## নবী-প্রশস্তি

‘লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্’, রদনেতে, চরিতে তোমার,
হে মহান্, হে নরগৌরব !
মরুভূমে মরুত্থান, ভীমকান্ত দরশন তব,
উৎসারিত আত্মার সৌরভ !
যারা যত দীন হীন, অন্ধ মূক, পুঙ্গ দিশাহারা,
জন্ম তব তাহাদেরি ভিতে ;
জড়তায় রূঢ়স্পর্শ, অন্ধকারে বজ্রদীপ্তি তুমি ;
জয় গাহে কবি মুগ্ধচিতে ।

যে-‘তৌহিদ’ বিঘোষিলে তন্দ্রাহত জগতের কাণে,
বীর্য্যবান্ সে যে বীর্য্যবান্ ;
সমস্ত অন্তর মাঝে ফুৎকারিয়া দেয় অগ্নিকণা,
কহে ঃ “নাহি আল্লা ভিন্ন আন্ ।
সে-আল্লার ভাতি, সে তো নহে শুধু ধেয়ানীর চিতে,
নহে শুধু ভকতের বুকে,
জাগ্রত দেখহ তাঁ’রে সর্ব্ব কর্ম্মে, সর্ব্ব প্রেমে তব,
সর্ব্ব ভয়ে, সর্ব্ব বন্ধ-দুখে ।”

হে অমর ‘পয়গম’-বহ, হে মহাতাপস,
সংকট-বন্ধনোচ্ছিন্ন হে সৃষ্টির চিরদীপ্ত প্রাণ !
মহাকালকণ্ঠশোভী অম্লান রতন,
প্রত্যহ-বিগ্রহ মূর্ত্ত, কর কর ভব ছন্দ দান ।

মূঢ় মূক, ন্যুব্জ-পৃষ্ঠ, নিরানন্দ, নিবীর্য্য শ্রীহীন
এ সুন্দর পৃথ্বীবুকে পুনঃ সেই শরণে তোমার,
বজ্র হানি' কহ পুনঃ, "মিথ্যা কথা, অসম্ভব কথা,
আত্মা কভু নহে ক্ষুদ্র, নহে দীন প্রকাশ তাহার।"

—নব-পর্য্যায়

---

# শেখ হবিবর রহমান

## গজল

কাফেরে এশ্‌কম্‌ মুসলমানী মেরা দরকার নিস্ত্‌;
হর্‌ রগে মন্‌ তার্‌ গশ্‌ত হাজতে জুন্নার্‌ নিস্ত্‌।

—আমির খসরু

আমি ত কাফের প্রেমের বাজারে, ধরম তোমার চাই না।
দেহের ধমনী উপবীত মম, উপবীত আর চাই না॥
নির্ব্বোধ হেকিম, যাও যাও দূরে, এ-রোগীর পাশে এস না;
প্রেমের ব্যথায় ব্যথিত যে আমি, তা হ'তে নিস্তার চাই না।
সেই ত ব্যাধির অমোঘ ওষুধ, তা'রে পেলে সব ভুলিব;
যাও যাও দূরে, হও হে বিদায়, তব কারবার চাই না।
প্রেমের বেদনা কত মধুময়, তুমি কি হে তাহা বুঝিবে?
প্রেমের কাঁটায় বিঁধিব এ-প্রাণ, স্বর্গীয় মন্দার চাই না।
মোদের তরীতে নাই কর্ণধার, ক্ষতি তাহে কিছু নাই হে;
মোদের আছেন 'পাক্‌-পরোয়ার', কর্ণধার আর চাই না।
বলিছে খসরু 'প্রতিমা-পূজক',—প্রকৃতই আমি তাই হে;
প্রতিমা-পূজক আমি তোমাদের কোনো কারবার চাই না॥

—আবে-হায়াত

# ফজলুল হক্ সেলবর্সী

## সেণ্ট্ হেলেনা

আজো ডোবে রবি, আজো ওঠে চাঁদ,
আজো বয় সেথা সাগর-ধারা ;
'উইলো'র বনে প্রদোষে প্রভাতে
কেঁদে যায় হাওয়া পাগল-পারা।
ঊর্ম্মির পর ঊর্ম্মি উতলা, সঘনে গরজি' আঘাতে' মহী,
কোন্ অজানার ওপার হ'তে সে নিয়ে আসে কার বারতা বহি'।
বিপুল বারিধি-বক্ষ ভেদিয়া সুনীল আকাশে তুলিয়া শির,
দৈত্যের মতো দাঁড়াইয়া ওই 'সেণ্ট্ হেলেনা' স্তব্ধ থির।—

ঊর্ম্মি-প্রহত একটি চূড়ায় অভাগা বন্দী বসিয়া একা,
পাষাণ-মূরতি দৃষ্টি খুঁজিছে দূর ফ্রান্সের ধূসর রেখা।
গত জীবনের কত না কাহিনী, সুখ-দুখময় কত না কথা
গত রজনীর স্বপনের মতো পরাণে হানিছে নিযুত ব্যথা।
মনে পড়ে আজি 'কর্সিকা'-তীর, বিজন গুহাটি জাগিছে মনে,
মনে পড়ে শুধু 'রোমোলীনা'-স্নেহ, মনে জাগে শিশু অনাথগণে।
কোথা 'ব্রীণ' কোথা খেলার সাথীরা,
কোথা সে তুষারে দুর্গ-গড়া ;
কোথা 'যোসেফিন্', কোথা 'পেরিসিন',
কোথায় 'টুলন' কানন-জোড়া ?
'জয় স্বাধীনতা, জয় সাধারণ !'—কই সে বিপুল আরাব আজ,
কাঁপায়ে আরশ হুঙ্কারি' ঘন লুকাল কোথা সে আওয়াজ-বাজ ?
'ওয়াটার্লু'-নিশি কবে সে পোহালো, জীবন-যামিনী হইল ভোর ;
চির-স্বাধীনতা মুক্তি-গরিমা চিরতরে ওরে লভেছে গোর।

ভাবিতে ভাবিতে হেরিলা বন্দী ফরাসী হইতে হেলেনাবধি
সাগর-মেখলা সেতু-বাঁধ এক উঠায়েছে শির ভেদি' উদধি।

ফরাসীর যত বীর-সুত তা'রা সেতুপথ বাহি' আসিয়া আজ
কৃপাণ ছাড়িয়া চরণ চুমিয়া দাঁড়ায়ে সুমুখে খুলিয়া তাজ।
"ঋতুরাজ বিনে আঁধার কুঞ্জ, প্রকৃতি ধরেছে রুক্ষ বেশ!
হায় নেপোলিয়ঁ।! কাঁদে ফরাসীয়া, দুষমণ মা'র টানিছে কেশ!
মহিমায় যার সাজালে শীর্ষ, পতাকা ঊর্দ্ধে ধরিলে যার,
হের আজ যত ফেরুপাল আসি' বুকের বসন ছিড়ে সে মা'র।
ওঠ ওঠ বীর, খোল তরবার, এ জগৎ নহে ধ্যানের ঠাঁই;
মায়ের শিকল কাটিবে ফরাসী, জননী তোমারে ডেকেছে তাই!"

সহসা বন্দী উঠিলা শিহরি', সুখের স্বপন ফুরালো, হায়!
পাগল ঊর্ম্মি কখন কাঁদিয়া ঢেলে' গেছে বারি সারাটি গা'য়।
বীরের অশ্রু ঝরিল ধরায়, টুটিল নিমেষে ধ্যানের পুর,
উদাস পবন 'উইলো'-কুঞ্জে গেয়ে' গেল সেই ব্যথার সুর॥

—মোস্‌লেম ভারত

---

## মোহাম্মদ মোজাম্মেল হক্

### হিন্দু-মুসলমান

আজি শুভলগ্নে ভাই, ভুলি' যাও মম
অতীতের শত অপরাধ;
আমিও তোমারে ক্ষমি' প্রীতিভরে আজি
ভাঙ্গিতেছি ভিন্নতার বাধ।
তোমার যে দেশ, সে যে আমারো স্বদেশ—
উভয়ের এক জন্মভূমি;
এক গঙ্গাজলে তোষে দোহে চিরদিন
হিমাদ্রির পাদদেশ চুমি'।

---

## গোলাম মোস্তফা

### রবীন্দ্রনাথ

আকাশে ভুবনে বসেছে যাতুর মেলা,
নিতি নব নব খেলিতেছে যাত্বকর ;
রবি-শশী-তারা ঝঞ্ঝা-অশনি-খেলা
লুকোচুরি কত চলিছে নিরন্তর।

আমরা বসিয়া দেখিতেছি সারা বেলা,
বুঝি না ক কিছু, বিস্মিত অন্তর।
হাসা-কাঁদা আর ভাঙা-গড়া হেলাফেলা
সকলেরি মাঝে ভরা যাত্ব-মন্তর।

কবি! তুমি সেই মায়াবীর ছোট ছেলে,
পিতার ঘরের অনেক খবর জান ;
কেমন করিয়া কিসে কোন্ খেলা খেলে,
তুমি সেই বাণী গোপনে বহিয়া আন।

দর্শক মোরা, কিছু জানা-শোনা নাই,
যাহা বল, শুনি অবাক্ হইয়া তাই॥

—রক্তরাগ

---

### কুড়ানো মাণিক

আন্‌মনে একা একা পথ চলিতে
দেখিলাম ছোট মেয়ে ছোট গলিতে ;
হাসি-মাখা মুখখানি, চির-আত্বরী,
ঝরে'-পড়া স্বরগের রূপ-মাধুরী।

ফণিনীর মতো পিঠে বেণী দুলিছে,
চঞ্চল সমীরণে চুল্ ছুলিছে ;
মঞ্জীর-ধ্বনি বাজে চল-চরণে,
মিহি নীল ফুরফুরে শাড়ী পরণে।

বস্ত্রের আবরণ-কারা টুটিয়া
অঙ্গের হেম-আভা পড়ে লুটিয়া।
মিষ্টি-মধুর আঁখি, দৃষ্টি চপল ;
বঙ্কিম ক্ষীণাধর, রক্ত কপোল।

চলে' গেল পাশ দিয়ে ক্ষিপ্র পদে—
বিজলীর রেখা যেন নীল নীরদে !
শিহরিয়া উঠিলাম ঘন পুলকে,
হারাইয়া গেনু কোথা কোন্ দ্যুলোকে !

পথ মাঝে কুড়াইয়া পেনু যে মণি,
সে যে মোর হৃদি-মাঝে হরষ-খনি ॥

---

## সন্ধ্যারাণী

সন্ধ্যারাণি ! সন্ধ্যারাণি !
এই যে মোদের গোপন মিলন, কেউ জানে না, আমরা জানি।
পশ্চিমের ঐ গগন-কোণে
এলে তুমি সংগোপনে,
উড়িয়ে দিলে মৃদুল্ বায়ে রেশ্মি মেঘের আঁচলখানি।
রক্ত-রাঙা মুখের 'পরে অসীম-ছাওয়া ওই যে নীলা
ও ত তোমার এলিয়ে-দেওয়া মুক্ত-কেশের সহজ লীলা !

শান্ত নদীর মুকুর-তলে
দেখছ কি মুখ কুতূহলে ?
সীমন্তে কে পরিয়ে দিল হীরক্-টিপ ওই কখন আনি' ?

তোমায় আমায় এম্‌নি ক'রে নদীর ধারে নিতুই দেখা,
লক্ষ লোকের চোখের তলেও আমরা দু'জন একা-একা !
তোমায় আমি, ওগো প্রিয়া !
ভালবাসি হৃদয় দিয়া ,
শুনেছি গো তোমার মুখে ভালবাসার মৌন বাণী ॥

---

## প্রিয়া

প্রিয়ার মোর চক্ষের অচঞ্চল দৃষ্টি,
রিণিক্ ঝিন্ কঙ্কণ কী সুন্দর মিষ্টি !
কানের দুল দুল্‌দুল্,
খোঁপার চুল উল্‌ঝুল্,
রঙীন গাল তুলতুল ধরার সার সৃষ্টি !
নধর তার চাঁদমুখ,
অধর লাল টুক্‌টুক্,
মাতায় মোর মন্-দিল্
হাসির শেষ রেশ টুক্ !
বুকের নীল অঞ্চল
উতল বায় চঞ্চল,
শিরীণ সুর কণ্ঠের ঝরায় প্রেম- বৃষ্টি !

—সাহারা

## শাহাদাৎ হোসেন

### বৈশাখ

স্বাগত তোমারে আজি, হে নূতন উদ্দণ্ড বৈশাখ,
ঋতুরূপী রুদ্রের পিনাক !
বসন্ত বিদায়-মুখে
ধরণীর বুকে
জাগিয়াছে তোমার আহ্বান
মর্ম্মরিত শুষ্কপত্রে চিরন্তন আগমনী গান।
উৎসবের হোলি-শেষে আজি এই দিনান্ত-বেলায়
দিক্-চক্রে কালরূপী জটার লেখায়
আগমের দিয়াছে আভাস,
নিখিলের পুঞ্জীভূত তপ্ত দীর্ঘশ্বাস
বরণের মাঙ্গলিক তব,
স্বাগত হে চিরন্তন—চির-অভিনব !

স্বাগত স্বাগত আজি, হে দুর্ব্বার দুরন্ত বৈশাখ,
লক্ষ শঙ্খধ্বনি-মুখে আসিয়াছে ডাক।
জীবন্ত গৈরিক ওগো বিশীর্ণ দানব।
জটাবন্ধে বেঁধে এস মৃত্যুর আসব।
ধরিত্রীর দীর্ণ বুকে নেচে যাও উলঙ্গ তাণ্ডবে,
জটার ঝাপট-ঝঞ্ঝা জ্বেলে' দিক ধ্বংসের আহবে।
মারণের যজ্ঞে তুমি কাল-পুরোহিত
ধ্বংসের হুঙ্কার মুখে—জয় সুনিশ্চিত।

## শাহাদাৎ হোসেন

কম্পমান যজ্ঞ-বেদী—ভিত্তিমূল কাঁপে ধরণীর,
টলটল রসাতল, দীর্ণ স্বর্গ ফাটলে চৌচির।
ব্যোমচর নেমে আসে,
মহা-ত্রাসে
উদ্বেল উল্লোল সিন্ধু আছাড়ি লুটায়,
অর্দ্ধরাত্রে ধাত্রী-ধরা আতঙ্কে লুকায়।
বিদ্যুতের অগ্নি-জ্বালা বজ্রের হনন
অবিশ্রাম উন্মত্ত রণন
তোমার প্রলয়-যজ্ঞে রুদ্র মাঙ্গলিক,
হে ধ্বংস-প্রতীক!
সৃষ্টিরে আহুতি দাও নিশ্চিহ্নের বুকে
কাল-অগ্নি-মুখে।

## শাহ্‌জাহানের মৃত্যু-স্বপ্ন

[ স্থান—আগ্রার দুর্গ-প্রাসাদ। কাল—জ্যোৎস্নারাত্রি। অন্তিম শয্যায় শায়িত সম্রাট শাহ্‌জাহান। পার্শ্বে সেবারতা জাহানারা ]

শাহ্‌জাহান— জাহানারা!
জাহানারা— বাবা!
শাহ্‌জাহান— রাত্রি কত?
জাহানারা— দ্বিপ্রহর
হোয়েছে অতীত, দুর্গ-শীর্ষে তুর্য্যধ্বনি
এইমাত্র ঘোষিল বারতা।
শাহ্‌জাহান— সত্য! সত্য!
জাহানারা! দ্বিপ্রহর হোয়েছে অতীত!

জাহানারা— সত্য, বাবা! সপ্তমীর চাঁদ যমুনার
কেন্দ্র-বুকে লীলায় বিহরে। নীল জলে
কল-ভঙ্গে বিখণ্ডিত চন্দ্রকলা। চেয়ে'
দেখ পিতা,—ওই পরপারে কৌমুদীর
ললিত কলায় স্মৃতির মর্ম্মর-স্বপ্ন
রূপ লভিয়াছে!

[ তাজের দিকে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিয়া দেখাইলেন, শাহ্‌জাহান মুক্তগবাক্ষ-পথে এক দৃষ্টে তাজের পানে চাহিয়া রহিলেন। ]

শাহ্‌জাহান— সত্য! সত্য! জাহানারা!
স্মৃতির মর্ম্মর-স্বপ্ন রূপ লভিয়াছে।
চিরন্তন এই রূপ, আমার মর্ম্মের
স্মৃতি আদি-অন্ত রহস্যের অন্তহীন
বিচিত্র মায়ায় যুগে যুগে ফুটে র'বে
পুঞ্জিত অশ্রুর শুভ্র শান্ত মহিমায়।
প্রেমের এ তীর্থ-কেন্দ্রে অনাগত কাল
ভবিষ্যের বংশধর দুই ফোঁটা তপ্ত
আঁখি-নীর শ্রদ্ধায় অঞ্জলি দিবে—জানি
আমি স্থির। নহে তোর জননীর শুধু—
জগতের প্রেমিক প্রেমিকা—চ'লে গেছে—
আসিবে যাহারা—সবার প্রেমের স্মৃতি
রূপ লভিয়াছে আমার মর্ম্মের মাঝে।
তারি এ-প্রকাশ মূর্ত্ত, শোন্ জাহানারা—
অশ্রুর মর্ম্মর কাব্য অমর কাহিনী।

[ বলিতে বলিতে সম্রাট্ উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। জাহানারা চক্ষু মুছিলেন। ]

জাহানারা— জানি পিতা সব। মর্ম্মের কাহিনী তব
গাঁথা আছে আমার মরমে। কিন্তু—

শাহ্‌জাহান— আর কিন্তু নয়, জাহানারা! শেষ কথা
শোনাবার অবসর হবে না কো আর।
শোন্ বলি ঃ এই মাত্র দেখিয়াছি তা'রে,
—স্বপ্নঘোরে! রত্ন-সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা
জননী তোমার—নেমে আসে জ্যোতির্লোক
হ'তে! নার্গিসের রক্তরাগে বিম্বাধর
রাঙা, সেই হাসি-হাসি-মুখ, নয়নের
ভাতি তেমনি উজল শান্ত সুদূরের
স্বপন-বিলাসী। নেমে' আসে ধীরে—অতি
ধীরে—আমার প্রাণের তাজ—এ বিশ্বের
কেন্দ্রীভূত সৌন্দর্য্যের আলোক-প্রতিমা।
হাতছানি দিয়া ডাকে ঃ এস এস প্রিয়!
-এস গো মধুর! শূন্য এ অন্তর-লোক,
কতকাল ছেড়ে র'বে আর? অনন্তের
যাত্রী-পথে আজি হেথা মিলন-লগন।
আর নয়—আর নয়—আর নয়, প্রিয়!

[ বলিতে বলিতে সম্রাট্ সহসা উন্মাদের মত শয্যায় উপর উঠিয়া বসিলেন। ]

ওই—ওই—ওই আসে, জাহানারা! ওই
আসে জননী রে তোর মণিমাল্য-হারা
ফেরদৌসের রূপলক্ষ্মী ওই আসে নেমে'।
দেখ্ দেখ্ জাহানারা!—সেই—সেই—সেই।

[ অতিরিক্ত উত্তেজনা-বশে মূর্চ্ছিত হইয়া শয্যার উপর লুটাইয়া পড়িলেন। তাঁহার সে-মূর্চ্ছা আর ভাঙিল না। ]

# কাজী নজরুল ইস্‌লাম

## ফাতেহা-ই-দোয়াজ্-দহম্

( আবির্ভাব )

নাই তাজ
তাই লাজ ?
ওরে মুসলিম, খর্জ্জুর-শীষে তোরা সাজ !
করে তস্‌লিম হর্ কুর্নিশে শোর্ আওয়াজ,
শোন্ কোন্ মুঝ্‌দা সে উচ্চারে 'হেরা' আজ
ধরা মাঝ।
উর্‌জ্ য়্যামেন নজ্‌দ হেযাজ তাহামা ইরাক শাম্
মেসের ওমান তিহারান স্মরি' কাহার বিরাট নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্লাম !"

চলে আঞ্জাম্,
দোলে তাঞ্জাম্,
খোলে হুর-পরী মরি ফিরদৌসের হাম্মাম।
টলে কাঁখের কলসে কওসর-ভর্ হাতে আব্-জমজম-জাম
শোন্ দামান্ কামান্ তামাম্ সামান নির্ঘোষি' কার নাম
পড়ে "সাল্লাল্লাহু আলায়্‌হি সাল্লাম।"

মস্‌তান !
ব্যস্ থাম !
দেখ মশগুল আজি শিস্তান বোস্তান,
তেগ গর্দ্দানে ধরি' দারোয়ান রোস্তাম।

বাজে  কাহারবা-বাজা, গুল্‌জার গুলশান গুলফাম !
দক্ষিণে দোলে আরবী দরিয়া খুসীতে সে বাগে-বাগ,
পশ্চিমে নীলা 'লোহিতে'র খুন-জোশীতে রে লাগে আগ,
মরু  সাহারা গোবিতে সব্‌জার জাগে দাগ !

সুরে  কুর্শির
পুরে  "তুর"-শির্

দূরে  ঘুর্ণীর তালে সুর বুনে হুরী ফুর্ত্তির,
ঝুরে  সুর্খীর ঘন লালী উষ্ণীশে ইরাণী দুরাণী তুর্কীর !
আজ  বেদুঈন তা'র ছে'ড়ে দিয়ে ঘোড়া, ছুড়ে ফেলে বল্লম
পড়ে  "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম।"

সাবে-ঈন্
তাবে-ঈন্

হয়ে'  চিল্লায় জোর, "ওই ওই না'বে দীন্ !"
ভয়ে  ভূমি চুমে 'লাত্‌মানাত্‌'-এর ওয়ারেশীন্।
রোয়ে  'ওযযা হোবল' ইবলিস খারেজিন্,
কাঁপে জীন্ !

জেদ্দার পূবে মক্কা মদিনা চৌদিকে পর্ব্বত
তারি মাঝে 'কাবা' আল্লার ঘর দুলে আজ হর্ ওক্ত,
ঘন  উথলে অদূরে 'জমজম'-শরবত।

পানি  কওসর,
মণি  জওহর

আনি'  'জিবরাইল' আজ হরদম দানে গওহর,
টানি'  'মালিক-উল্-মৌত্' জিঞ্জির বাঁধে মৃত্যুর দ্বার লৌহ'র।

হানি'　　বরষা সহসা 'মিকাইল' করে ঊষর আরবে ভিঙ্গা,
বাজে　　নব-সৃষ্টির উল্লাসে ঘন ইস্‌রাফিলের শিঙ্গা।

জঙ্গাল
কঙ্কাল
ভেদি',　　ঘন জাল মেকী গণ্ডীর পঞ্জার
ছেদি',　　মরুভূতে একি শক্তির সঞ্চার!
বেদী-　　পঞ্জরে রণে সত্যের ডঙ্কার
ওঙ্কার!
শঙ্কারে করি লঙ্কার পার কার ধনু-টঙ্কার
হুঙ্কারে ওরে সাচ্চা সরোদে শাশ্বত ঝঙ্কার?
ভূমা-　　নন্দে রে সব টুটেছে অহংকার!

মর-　　মর্ম্মরে
নর-　　ধর্ম্ম রে
বড়　　কর্ম্মরে দিল ইমানের জোর্ বর্ম্ম রে,
ভর্　　দিল্ জান্ পেয়ে শান্তি নিখিল্ ফিরদৌসের হর্ম্ম্য রে।
রণে　　তাই ত বিশ্ব-বয়তুল্লাতে মন্ত্র ও জয়নাদ—
"ওয়ে　　মার্‌হাবা ওয়ে মার্‌হাবা এয়্ সরওয়ারে কায়েনাত্।"

শর্‌ওয়ান
দর্‌ওয়ান
আজি　　বান্দা যে ফেরাউন শাদ্দাদ্ নমরুদ মারোয়ান;
তাজি　　বোর্‌রাক হাঁকে আসমানে পরওয়ান,—
ও যে　　বিশ্বের চির সাচ্চারই বোর্‌হান—
'কোর-আন'!

"কোন যাদুমণি এলি ওরে,' বলি' রোয়ে মাতা আমিনায়
খোদার হবিবে বুকে চাপি,' আহা, বেঁচে থাক, স্বামী নাই।'
দূরে আব্দুল্লার রুহু কাঁদে, "ওরে আমিনারে 'গমি' নাই—
দেখ সতী তব কোলে কোন চাঁদ, সব ভরপুর, 'কমি' নাই।"

"এয়্ ফরজন্দ্—"
হায় হর্‌দম্
ধায় দাদা মোতালেব কাঁদি'—গায়ে ধূলা কর্দ্দম!
"ভাই কোথা তুই", বলি' বাচ্চারে কোলে
কাঁদিছে হামজা দুর্দ্দম!
ওই দিক্‌হারা দিক্‌পার হ'তে জোর শোর আসে,
ভাসে 'কালাম'—
"এয়্ শামসোজ্জোহা বদ্‌রোদ্দোজা কামারোজ্জামাঁ। সালাম।"

---

## ফাতেহা-ই-দোয়াজ-দহম্

(তিরোভাব)

এ কি বিস্ময়! আজ্‌রাইলেরও জলে ভর-ভর চোখ।
বে-দরদ দিল্ কাঁপে থর-থর যেন জ্বর-জ্বর-শোক।
জান্-মারা তার পাষাণ-পাঞ্জা বিল্‌কুল ঢিলা আজ,
কব্‌জা নিসাড়, কলিজা সুরাখ, খাক্ চুমে নীলা তাজ!
জিব্‌রাইলের আতশী পাখা সে ভেঙে যেন খান্ খান্,
দুনিয়ার দেনা মিটে যায় আজ তবু জান্ আন্-চান্।
মিকাইল অবিরল
লোনা দরিয়ার সবি জল
ঢালে কুল্ মুল্লুকে, ভীম বাতে খায় অবিরল ঝাউ দোল।
এ কি দ্বাদশীর চাঁদ আজ সেই? সেই রবিয়ল আউওল?

ঈশানে কাঁপিছে কৃষ্ণ নিশান,
ইস্‌রাফিলেরও প্রলয়-বিষাণ আজ
কাৎরায় শুধু। গুমরিয়া কাঁদে কলিজা-পিষানো বাজ!
রসুলের দ্বারে দাঁড়ায়ে কেন রে আজাজিল শয়তান!
তারও বুক বেয়ে আঁসু ঝরে, ভাসে মদিনার ময়দান!
জমিন-আসমান জোড়া শির্ পাঁও তুলি' তাজি বোর্‌রাক,
চিখ্ মেরে কাঁদে 'আরশে'র পানে চেয়ে' মারে জোর হাঁক।

হুর-পরী শোকে হায়
জল- ছল-ছল চোখে চায়।
আজ জাহান্নামের বহ্নি-বারিধি নিবে' গেছে ক্ষরি' জল,
যত ফের্‌দৌসের নার্গিস্-লালা ফেলে আঁসু-পরিমল।

মৃত্তিকা মাতা কেঁদে মাটী হ'ল বুকে চেপে মরা লাশ,
বেটার জানাজা কাঁধে যেন—তাই বহে ঘন নাভি-শ্বাস।
পাতাল-গহ্বরে কাঁদে জিন, পুনঃ ম'লো কি রে সোলেমান
বাচ্চারে মৃগী দুধ নাহি দেয়, বিহগীরা ভোলে গান।
ফুল পাতা যত খ'সে পড়ে, বহে উত্তর-চিরা বায়ু,
ধরণীর আজ শেষ যেন আয়ু, ছিঁড়ে গেছে শিরা স্নায়ু!

মক্কা ও মদিনায়
আজ শোকের অবধি নাই।
যেন রোজ-হাশরের ময়দান, সব উন্মাদ সম ছুটে।
কাঁপে ঘন ঘন কাবা, গেল গেল বুঝি সৃষ্টির দম টুটে'!

নকীবের তুরী ফুৎকারি' আজ বারোয়াঁর সুরে কাঁদে,
কার তরবারি খান্ খান্ ক'রে চোট মারে দূরে চাঁদে!
আবুবকরের দর-দর আঁসু দরিয়ার পারা ঝরে,
মাতা আয়েষার কাঁদনে মূরছে আসমানে তারা ডরে!
শোকে উন্মাদ ঘুরায় ওমর ঘূর্ণীর বেগে ছোরা,
ালে, "আল্লার আজ ছাল তুলে নেবো মেরে' তেগ্,
দেগে' কোড়া।"
হাঁকে ঘন ঘন বীর—
"হবে জুদা তার তন্ শির,
অ[illegible]জ যে বলিবে, নাই বেঁচে হজরত—
যে নেবে রে তাঁরে গোরে।"
আর দারাজ দস্তে তেগ হাতিয়ার
বোঁও বোঁও ক'রে ঘোরে!

গুম্বজে কে রে গুমরিয়া কাঁদে মস্‌জিদে মস্‌জিদে?
মুয়াজ্জিনের হুশ নাই, নাই জোশ চিতে, শোষ হৃদে!
বেলালেরও আজ কণ্ঠে আজান ভেঙে যায় কেঁপে কেঁপে,
নাড়ী-ছেঁড়া এ কি জানাজার ডাক হেঁকে চলে ব্যেপে' ব্যেপে'!
ওস্‌মানের আর হুঁশ নাই, কেঁদে কেঁদে ফেনা উঠে মুখে,
আলী হায়দর ঘায়েল আজি রে বেদনার চোটে ধুঁকে।
আজ ভোঁতা সে দু'ধারী-ধার
ঐ আলীর জুল্‌ফিকার;
আহা রসুল্-দুলালী আদরিণী মেয়ে মা ফাতেমা ঐ কাঁদে,
"কোথা বাবাজান!" বলি' মাথা কুটে' কুটে'
এলো-কেশ নাহি বাঁধে!

হাসান হুসেন তড়পায় যেন জবে-করা কবুতর;
"নানাজান কই!"—বলি' খুজে' ফেরে কভু বা'র কভু ঘর।

নিভে গেছে আজ দিনের দীপালি, খ'সেছে চন্দ্র-তারা,
আঁধিয়ারা হ'য়ে গেছে দশ দিশি, ঝরে মুখে খুন-ঝারা !
সাগর-সলিল ফোঁপায়ে উঠে' সে আকাশ ডুবাতে চায়,
শুধু লোনা জল তার আঁসু ছাড়া কিছু রাখিবে না দুনিয়ায় !
খোদ খোদা সে নির্ব্বিকার,
আজ টুটেছে আসনও তাঁর ।
আজ সখা মহবুবে বুকে পেতে দুখে কেন যেন কাঁটা বেঁধে,
তা'রে ছিনিবে কেমনে যার তরে মরে নিখিল সৃষ্টি কেঁদে' ।

বেহেশ্ত সব আরাস্তা আজ, সেথা মহা ধুম-ধাম,
গাহে হুর-পরী যত : "সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম ।"
কাতারে কাতারে করযোড়ে সবে দাঁড়ায়ে গাহিছে জয়,—
ধরিতে না পেরে ধরা-মা'র চোখে দর-দর ধারা বয় !
এসেছে আমিনা আবদুল্লা কি, এসেছে খদিজা সতী ?
আজ জননীর মুখে হারামণি-পাওয়া-হাসি হাসে জগপতি !
"খোদা, এ কি তব অবিচার !"
বলে' কাঁদে সুত ধরা-মা'র ।
আজ অমরার আলো আরো ঝলমল,
সেথা ফোটে আরও হাসি,
শুধু মাটীর মায়ের দীপ নিভে গেল,
নেমে এলো অমা-রাশি !

*    *    *    *

আজ স্বরগের হাসি ধরার অশ্রু ছাপায়ে অবিশ্রাম
ওঠে একই ঘন রোল—সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম ।"

—মোসলেম ভারত

দিকে দিকে পুনঃ জ্বলিয়া উঠেছে
দীন্-ই-ইস্‌লামী লাল মশাল।
ওরে বে-খবর, তুইও ওঠ জেগে,
তুইও তোর প্রাণ-প্রদীপ জ্বাল্॥

গাজী মোস্তফা কামালের সাথে
জেগেছে তুর্কী সুর্‌খ তাজ,
রেজা পাহ্‌লভী সাথে জাগিয়াছে
বিরাণ মুলুক্ ঈরাণ আজ!
গোলামী বিসরি' জেগেছে মিশরী
জগ্‌লুল সাথে প্রাণ-মাতাল॥

ভুলি' গ্লানি আজ জেগেছে হেজাজ
নেজ্‌দ্ আরবে ইব্‌নে-সাউদ,
আমানুল্লাহ্‌র পরশে জেগেছে
কাবুলে নবীন আল্-মাহ্‌মুদ।
মরা মরক্কো বাঁচাইয়া আজি
বন্দী করিম রীফ্-কামাল॥

জাগে ফয়সল ইরাক আজমে
জাগে নব হারুণ-অল্-রশীদ;
জাগে বায়তুল-মকাদ্দস্ রে
জাগে শাম দেখ টুটিয়া নিঁদ!
জাগে না কো শুধু হিন্দের দল
কোটি মুস্‌লিম বে-খেয়াল॥

মোরা আস্‌হাব কাহাফের মতো
হাজার বছর শুধু ঘুমাই,
আমাদের কেহ ছিল বাদ্‌শাহ্‌
কোন্ কালে; তারি করি বড়াই।
জাগি যদি মোরা দুনিয়া আবার
কাঁপিবে চরণে টাল্‌মাটাল॥

—সওগাত

---

## গজল

দুরন্ত বায়ু পূরবাইয়াঁ
বহে অধীর আনন্দে।
তরঙ্গে দুলে আজি নাইয়াঁ
রণ-তুরঙ্গ ছন্দে॥
অশান্ত অম্বর মাঝে,
মৃদঙ্গ গুরু গুরু বাজে;
আতঙ্কে থর থর অঙ্গ
মন অনন্তে বন্দে॥
ভুজঙ্গী দামিনীর দাহে
দিগন্তে শিহরিয়া চাহে,
বিষণ্ণ ভয়ভীতা যামিনী—
খোঁজে সেতারা চন্দে॥
মালঞ্চে এ কি ফুল-খেলা
আনন্দে ফোটে যূথী বেলা,
কুরঙ্গী নাচে শিখী সঙ্গে
মাতি' কদম্ব-গন্ধে॥

—কল্লোল

---

## গজল-গান

কেন কাঁদে পরাণ কী বেদনায় কারে কহি।
সদা কাঁপে ভীরু হিয়া রহি রহি ॥
সে থাকে নীল নভে, আমি নয়ন-জল-সায়রে,
সাতাশ তারার সতীন্ সাথে সে যে ঘুরে' মরে,
কেমনে ধরি সে চাঁদে, রাহু নহি ॥

কাজল করি' যারে রাখি গো আঁখি-পাতে,
স্বপনে যায় সে ধুয়ে' গোপন অশ্রু সাথে!
বুকে তায় মালা করি' রাখিলে যায় সে চুরি,
বাঁধিলে বলয়-সাথে মলয়ায় যায় সে উড়ি';
কি দিয়ে সে উদাসীর মন মোহি ॥

—উত্তরা

---

## গান

গানগুলি মোর আহত পাখীর সম
লুটাইয়া পড়ে তব পায়ে, প্রিয়তম!
বাণ-বেঁধা মোর গানের পাখীরে
তুলে' নিয়ো প্রিয় তব বুকে ধীরে;
তোমার চরণে লভিবে মরণ
সুন্দর অনুপম ॥
তা'রা সুরের পাখায় উড়িতেছিল গো নভে,
হায়, তোমার নয়ন-সায়কে বিঁধিলে কবে!
মৃত্যু-কাতর কণ্ঠে তাহার
এ কি এ গানের জাগিল জোয়ার,
মরণ-বিষাদে অমৃতের স্বাদ
আনিলে নিষাদ মম ॥

—জয়তী

---

## চাঁদিনী রাতে

কোদালে মেঘের মউজ উঠেছে গগনের নীল গাঙে,
হাবুডুবু খায় তারা-বুদ্বুদ্, জোছনা সোনায় রাঙে।
তৃতীয়া চাঁদের 'সাম্পানে' চড়ি' চলিছে আকাশ-প্রিয়া,
আকাশ-দরিয়া উতলা হ'ল গো পুতলায় বুকে নিয়া।
নীলিম্-প্রিয়ার নীলা গুল-রুখ্ নাজুক নেকাবে ঢাকা
দেখা যায় ঐ নতুন চাঁদের কালোতে আবছা আঁকা।
সপ্তর্ষির তারা-পালঙ্কে ঘুমায় আকাশ-রাণী,
'লায়লা'-সেহেলি দিয়ে গেছে চুপে কুহেলি-মশারি টানি'।
নীহার-নেটের ঝাপসা মশারি, যেন 'বর্ডার' তারি
দিক্-চক্রের ছায়া-ঘন ঐ সবুজ তরুর সারি।

সাতাশ-তারার ফুল-তোড়া হাতে আকাশ নিশুতি রাতে
গোপনে আসিয়া তারা-পালঙ্কে শুইল প্রিয়ার সাথে।
'উঁহু উঁহু' করি' কাঁচা ঘুম হ'তে জেগে ওঠে নীলা হুরী,
লুকায়ে দেখে তা 'চোখ গেল' ব'লে হাসিছে পাপিয়া-ছুঁড়ি।
'মঙ্গল' তারা মঙ্গল-দীপ জ্বালিয়া প্রহর জাগে,
ঝিকিমিকি করে মাঝে মাঝে, বুঝি বধূর নিশাস লাগে।

উল্কা-জ্বালার সন্ধানী আলো লইয়া আকাশ-দ্বারী
'কাল-পুরুষ' সে জাগি' বিনিদ্র ক'রে ফেরে পায়চারী।
সেহেলীরা রাতে পালায়ে এসেছে উপবনে কোন্ আশে,
হেথা হোথা ছোটে, পিকের কণ্ঠে ফিক্ ফিক্ ক'রে হাসে।
আবেগে সোহাগে আকাশ-প্রিয়ার চিবুক বাহিয়া ও কি
শিশিরের রূপে ঘর্ম্মবিন্দু ঝ'রে ঝ'রে পড়ে, সখি!

নবমী চাঁদের 'সসারে' ও কে গো চাঁদিনী-শিরাজী ঢালি'
বধূর অধরে ধরিয়া কহিছে, "তহুরা পিও লো আলি!"
কার কথা ভেবে তারা-মজলিসে দূরে একাকিনী সাকী
চাঁদের সসারে কলঙ্ক-ফুল আনমনে যায় আঁকি'!

মস্তানা শ্যামা দধিয়াল টানে বায়ু-বেয়ালায় মীড়,
ফর্‌হাদ-শিরী লায়লি-মজনু মগজে ক'রেছে ভিড়!
ছুটিতেছে গাড়ী, ছায়াবাজি-সম কত কথা ওঠে মনে,
দিশাহারা-সম ছোটে ক্ষ্যাপা মন জলে থলে নভে বনে!
এলোকেশে মোর জড়ায়ে চরণ কোন্ বিরহিনী কাঁদে,
যত প্রিয়-হারা আমারে কেন গো বাহু-বন্ধনে বাঁধে!
নিখিল বিরহী ফরিয়াদ করে আমার বুকের মাঝে,
আকাশে-বাতাসে তাদেরি মিলন তাদেরি বিরহ বাজে।

আন্‌মনা সাকি, শূন্য আমার হৃদয়-পোয়ালা-কোণে
কলঙ্ক-ফুল আন্‌মনে সখি লিখো মুছো খনে খনে।

—জয়তী

---

## বন্ধন

অনন্তকাল এ-অনন্তলোকে
মন-ভোলানোরে তা'র খুঁজে' ফিরে মন;
দক্ষিণা বায় চায় ফুল-কোরকে,
পাখী চায় শাখী, লতা-পাতা-ঘেরা বন।
বিশ্বের কামনা এ—এক হ'বে দুই;
নূতনে নূতনতর দেখিবে নিতুই॥

তোমারে গাওয়াত গান যার বিরহ,
এড়িয়ে চলার ছলে যাচিয়াছ যা'য়,
এল সেই সুদূরের মদির-মোহ—
এল সেই বন্ধন জড়াতে গলায়।
মালা যে পরিতে জানে, কণ্ঠে তাহার
হয় না গলার ফাঁসি চারু ফুলহার॥

জলময়, নদী তবু নহে জলাশয়,
কূলে কূলে বন্ধন তবু গাহে গান ;
বুকে তরণীর বোঝা কিছু যেন নয়,—
সিন্ধুর সন্ধানী চঞ্চল-প্রাণ।
দুই পাশে থাক্ তব বন্ধন-পাশ,
সুমুখে জাগিয়া থাক্ সাগর-বিলাস॥

বিরহের চখা চখী রচে তা'রা নীড়,
প্রাতে শোনে নির্ম্মল বিমানের ডাক,
সেই ডাকে ভোলে নীড়, ভোলে নদী-তীর,
সন্ধ্যায় গাহে : 'এই বন্ধন থাক্।'
আকাশের তারা থাক্ কল্পলোকে,
মাটীর প্রদীপ থাক জাগর-চোখে॥*

*আবদুল কাদিরের বিবাহ উপলক্ষে আশীর্ব্বাণী।

## চির-জনমের প্রিয়া

আর কতদিন বাকী ?
বক্ষে পাওয়ার আগে বুঝি, হায়, নিভে যায় মোর আঁখি !
অনন্ত-লোকে অনন্ত রূপে কেঁদেছি তোমার লাগি',
সেই আঁখিগুলি তারা হয়ে আজো আকাশে রয়েছে জাগি'।
চির-জনমের প্রিয়া মোর ! চেয়ে' দেখ দেখ নীলাকাশে
ভ্রমরের মতো ঝাঁক বেঁধে' কোটি গ্রহ তারা ছুটে' আসে
তোমার শ্রীমুখ-কমলের পানে। ওরা যে ভুলিতে নারে,
আজিও খুঁজিয়া ফিরিছে তোমায় অসীম অন্ধকারে।
ওরা তারা নয়, অভিশপ্ত এ বিরহীর ওরা আঁখি,
মহা-ব্যোম জুড়ে' উড়িয়া বেড়ায় আশ্রয়-হারা পাখী !
আঁখির আমার ভাগ্য ভালো গো, পেয়েছিল আঁখি-জল,
তাই আজো তা'রা অমর হইয়া ভ'রে আছে নভোতল।
বাহু দিয়া মোর কণ্ঠ যদি গো জড়াইতে কোনো দিন,
আঁখির মতন এই দেহ মোর হইত মৃত্যুহীন !
তোমার অধর নিঙাড়িয়া মধু পান করিতাম যদি
আমার কাব্যে সঙ্গীতে সুরে বহিত অমৃত-নদী।

পূর্ণিমা-চাঁদ দেখেছ ? দেখেছ তার বুকে কালো দাগ ?
ওর বুকে ক্ষত-চিহ্ন এঁকেছে জান কা'র অনুরাগ ?
কোটি জনমের অপূর্ণ মোর সাধ আশা জ'মে জ'মে
চাঁদ হয়ে হায় ভাসিয়া বেড়ায় নিরাশার মহা-ব্যোমে।
কলঙ্ক হয়ে বুকে দোলে তা'র তোমার স্মৃতির ছায়া,
এত জোৎস্নায় ঢাকিতে পারেনি তোমার মধুর মায়া।

কোন্ সে অতীতে মহাসিন্ধুর মন্থন-শেষে, প্রিয়া,
বেদনা-সাগরে চাঁদ হ'য়ে আমি তোমারে বক্ষে নিয়া
পালাইতেছিনু সুদূর শূন্যে ! নিঠুর বিধাতা পথে
তোমারে ছিনিয়া লয়ে গেল, হায়, আমার বক্ষ হতে !
তুমি চ'লে গেলে, বুকে রয়ে' গেলো তব অঙ্গের ছাপ ;
শূন্য বক্ষে শূন্যে ঘুরি গো, চাঁদ নই—অভিশাপ !
প্রাণহীন দেহ আকাশে ফেলিয়া ধরণীতে আসি ফিরে',
তোমারে খুঁজিয়া বেড়াই গোমতী-পদ্মা-যমুনা-তীরে ।
চিনি যবে হায় গোধূলি-বেলায় শুভ লগ্নের ক্ষণে
বাঁশী না বাজিতে লগ্ন ফুরায়, আঁধার ঘনায় বনে !
তুমি চ'লে যাও ভবনের বধূ, আমি যাই বন-পথে,
মোর জীবনের ঝরা ফুল তু'লে দিই মরণের রথে ।

আজো মুখপানে চেয়ে' দেখি, তব মুখে সেই মধু আছে ;
আজো বিরহের ছায়া দোলে তব চোখের কোলের কাছে !
ডাগর নয়নে আজো পড়ে সেই সাগর-জলের ছায়া,
তনুর অণুতে অণুতে আজিও সেই অপরূপ মায়া ।
আজো মোর পানে চাহ যবে, বুকে ঘন শিহরণ জাগে,
আমার হৃদয়ে কোটি শতদল ফুটে' ওঠে অনুরাগে ।
হেরিলে তোমায় আমার ভুবনে ওঠে রোদনের বাণী,
কাণাকাণি করে চাঁদে ও তারাতে—'জানি গো তোমারে জানি !
রুধিরে আমার নূপুর বাজে গো, কহে—'প্রিয়া, চিনি চিনি ।
একদিন ছিলে প্রেমের গোলকে মোর প্রেম-গরবিণী !
ছিল একদিন—আমার সোহাগে গলিয়া যমুনা হতে,
নিবেদিত নীল পদ্মের মতো ভাসিতে প্রেমের স্রোতে !

ভাসিতে ভাসিতে আসিয়াছ আজ এই পৃথিবীর ঘাটে ;
(আমি) পুষ্প-বিহীন শূন্যবৃন্ত, কাঁটা লয়ে দিন কাটে।

মনে কর, যেন সে কোন্ জনমে বিদায়-সন্ধ্যাবেলা
তুমি রয়ে' গেলে এপারে, ভাসিল ওপারে আমার ভেলা।
সেই নদী-জলে পড়ে' গেলে তুমি ফুলের মতন ঝ'রে ;
কেঁদে' বলেছিলে যাবার বেলায়—"মনে কি পড়িবে মোরে,
জনমিবে যবে আর কি আঁকিবে হৃদয়ে আমার ছবি ?"
আমি বলেছিনু—"উত্তর দেবে আর-জনমের কবি।"
সেই বিরহীর প্রতিশ্রুতি গো আসিয়াছি কবি হ'য়ে,
ছবি আঁকি তব আমার বুকের রক্ত ও আলো ল'য়ে।
ঝাঁকে ঝাঁকে মোর কথার কপোত দিকে দিকে যায় ছুটে'
হংস-দূতীর মতো মোর লিপি ধরিয়া চঞ্চু-পুটে।
হারায়ে গিয়াছে শূন্যে তাহারা ফিরিয়া আসেনি আর,
তাই সুরে সুরে বিধূনিত করি অসীম অন্ধকার।
ভবনে ভবনে সেই সুর প্রতি কণ্ঠ জড়ায়ে কহে,
'যাহারে খুঁজিয়া কাঁদি নিশিদিন, জান সে কোথায় রহে ?'
তারা মরে, ফুল ঝরে সেই সুরে, তুমি শুধু কাঁদিলে না,
আমার সুরের পালক কুড়ায়ে কবরীতে বাঁধিলে না।
আমার সুরের ইন্দ্রাণী ওগো ! ব্যথার সাগর-তলে
দেখেছ কি কত না-বলা বাণীর মুক্তা-মাণিক জ্বলে ?
তোমার কণ্ঠে মালা হয়ে তা'রা মুক্তি লভিতে চায়।
গত জনমের অস্থি আমার নিদারুণ বেদনায়
মুক্তা হয়েছে ; অঞ্জলি দিতে তাই গাঁথি গানে গানে,—
চরণে দলিয়া ফে'লে দিও পথে যদি তা বেদনা হানে।

মনে ক'রো দুঃস্বপ্নের মতো আমি এসেছিনু রাতে,
বহুবার গেছ ভুলিয়া, এবারও ভুলিয়া যাইও প্রাতে।
গেয়ে' যাই যত গান, প্রিয়তমা, মনে ক'রো সব মায়া ;
সাহারা মরুর বুকে পড়ে না গো শীতল মেঘের ছায়া !
মরুর তৃষ্ণা মিটাইবে তুমি কোথা পাবে এত জল ?
বাঁচিয়া থাকুক আমার রৌদ্র-দগ্ধ আকাশ-তল।

—সওগা

---

## নতুন চাঁদ

দেখেছি তৃতীয় আস্‌মানে চিদাকাশে
চির-পথ-চাওয়া মোর নতুন চাঁদ হাসে।
দেহ ও মনের রোজা আমার
'এফ্‌তার' ক'রে গেরেফ্‌তার
করিব তৃষিত বক্ষে মোর ঐ চাঁদে,
সহিতে পারি না বিরহ ওর, মন কাঁদে !
জুড়াব এবার জুড়াব গো,
খুশীর পায়রা উড়াব গো,
নামিবে ও চাঁদ মোর হৃদয়- আস্‌মানে,
মত্ত হইব আনন্দের রস পানে !
বদ্‌লাবে তকদীর আমার,
ঘুচিবে সর্ব্ব অন্ধকার,
পরিব ললাটে, চুমু দেবো, বাঁধ্‌ব তায়
আল্লাহ্‌-নামের রজ্জুতে দিল-কোঠায় !
সাম্যের রাহে আল্লাহের
মুয়াজ্জিনেরা ডাকিবে ফের,

পরমোৎসব হবে সেদিন ময়দানে
সাত আস্‌মান দোল্ খাবে জয়-গানে,
এক আল্লার জয়-গানে,
মহা-মিলনের জয়-গানে,
'শান্তি' 'শান্তি' জয়-গানে!

একঘরে হেথা দশ প্রাচীর,
হিংসা-ক্লৈব্য-বদ্ধ নীড়
ভেঙে যাবে, মন রেঙে যাবে এক রঙে।
এক আকাশের তলে র'ব এক সঙে।
চাঁদ আসিছে রে, নতুন চাঁদ!
অপরূপ প্রেম-রসের ফাঁদ।
বাঁধিবে সকলে এক সাথে গলে গলে,
মিলিয়া চলিব তাঁর পথে দলে দলে।
র'বে না ধর্ম্ম জাতির ভেদ,
র'বে না আত্ম-কলহ-ক্লেদ,
র'বে না লোভ, র'বে না ক্ষোভ অহঙ্কার;
প্রলয়-পয়োধি এক নায়ে হইব পার।
একের লীলা এ, দু'জন নাই,
তাঁহারি সৃষ্টি সবাই ভাই,
কত নামে ডাকি—সর্ব্বনাম এক তিনি,
তাঁরে চিনি না ক, নিজেরে তাই নাহি চিনি।
আলো ও বৃষ্টি তাঁহার দান
সব ঘরে ঝরে এক সমান,

সকলের মাঠে শস্য দেয়  ফুল ফোটায়,
সকল মানুষ তাঁর ক্ষমা  করুণা পায় !

প্রলয়ের রূপ ধরে' যবে
তাঁর ক্রোধ নেমে' আসে ভবে,

সব ধর্ম্মের সব মানব  মরে তখন,
থাকে না হিন্দু-মুসলমানের  আস্ফালন !

এক-কে মানিলে রহে না দুই,
এস সবে সেই এক-কে ছুঁই !

এক সে স্রষ্টা সব-কিছুর  সব জাতির।
আসিছে তাঁহারি চন্দ্রালোক  এক বাতির !

মরিছে যাহারা—তাহারা নয়,
আসিছে—যাহারা বাঁচিয়া রয়,

নিত্য অভেদ উদার-প্রাণ  নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
আস্‌মানে চাঁদ দেয় আজান  নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !
মৃত্যুকে তা'রা করে না ভয়  নৌজোয়ান, নৌজোয়ান,
তাহারা বুদ্ধি-বদ্ধ নয়,  নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !

কাপুরুষ তার্কিক যারা
কেবল বিচার করে তা'রা,

অগ্রে চলে না ক্লীব ভীরু,  ভয় দেখায় ;
যারা আগে চলে, পিছে তাদের  টানিতে চায় !

প্রাণ-প্রবাহের শত্রু সব,
ধূর্ত্ত যুক্তি-শৃগাল-রব

দুইকূলে করে, তবু চলে  নৌজোয়ান, নৌজোয়ান !

মহা-বন্যার তরঙ্গ-সম সম্মুখে দলে দলে
তবু চলে নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
সত্য বলিতে নিত্য ভয়,
যুক্তি-গর্ত্তে লুকায়ে রয়,
ইহারা তাদের দলের নয় নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
এরা জীবন্ত মুক্ত-ভয় নৌজোয়ান! নৌজোয়ান!

ভীরু ইঁদুরের কিচিমিচি
শোনে না কো এরা মিছিমিছি,
এরা শুধু বলে, "চল্ আগে নৌজোয়ান!"
অসম্ভবের অভিযানে এরা চলে,
না চ'লেই ভীরু ভয়ে লুকায় অঞ্চলে!
এরা অকারণ দুর্নিবার প্রাণের ঢেউ,
তবু ছু'টে চলে যদিও দেখেনি সাগর কেউ।
জানে পারাবার, জানে অসীম,
এরাই শক্তি মহামহিম,
এরা উদ্দাম যৌবন-বেগ দুরন্ত,
মুক্তপক্ষ নির্ভয় এরা উড়ন্ত।

নাই ইহাদের অবিশ্বাস—
যা আনে জগতে সর্ব্বনাশ,
প্রতি নিঃশ্বাসে এরা কহে— "মোরা অমর!"
তনুমনে নাই সন্দেহের বিসর্গ অনুস্বর।
হাতের লাট্টু এদের প্রাণ
গুল্‌তির গুলি এদের প্রাণ

বেপরোয়া ছুঁড়ে ছুঁড়ে মারে দিকে দিক,
এদের বুদ্ধি চিক্‌মিকায় না ঘেরা-চিকে।

তিন্তিড়ি গাছে জোনাকি-দল
চাঁদের নিন্দা করে কেবল,

পুচ্ছের আলো উচ্ছের ঝোপে জ্বালায়ে কয়—
"মোরা আলো দেবো, চন্দ্রের দেশে ভীষণ ভয়!"

পাহাড়ে চড়িয়া নীচে পড়ে— নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
অজগর খোঁজে গহ্বরে— নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!
চড়িয়া সিংহে ধরে কেশর নৌজোয়ান।
বাহন তাহার তুফান ঝড়—নৌজোয়ান!
শির পেতে বলে—'বজ্র আয়!'
দৈত্য-চর্ম্ম-পাদুকা পায়,
অগ্নি-গিরিরে ধ'রে নাড়ায় নৌজোয়ান।
দলে দলে তা'রা খুজে বেড়ায়
ভূমিকম্পের ঘর কোথায়—
নৌজোয়ান! নৌজোয়ান!

বিলাস এদের দারিদ্র্য,
গতি ইহাদের বিচিত্র,

দেখেনি ক জ্ঞান-বিলাসীরা এদের পথ,
শুনিলেও কাঁপে বলি-যূপের ছাগের বৎ!
এরাই দেখিবে নতুন চাঁদ জ্যোতিষ্মান,
ইহাদের নাই দেহ ও মন, কেবল প্রাণ!
নৌজোয়ান, নৌজোয়ান!

ঐদেরেই পথ দেখাতে ঐ
নতুন চাঁদের জ্যোৎস্না-খই
আকাশ-খোলায় ফুটিছে ! ভীরুরা যাস্ নে কেউ,
যাদের পিছনে লেগেছে বুদ্ধি ভয়ের ফেউ !
মৃত্যুর ভয় প্রতি পদে ঐ পথে
লঙ্ঘিতে হবে কত সমুদ্র পর্ব্বতে।
বিলাসীরা থাক চুপ ক'রে,
রূপ দেখে' খেয়ো টুপ্ ক'রে,
যাত্রী অরূপ-তীর্থের পথে নৌজোয়ান !
পথ দেখায় যে, সে শুধু কয়— "জীবন দান
জীবন দান, নৌজোয়ান !"
জীবনে না ক'রে নিষ্ঠীবন,
মৃত্যুর বুকে সঞ্চরণ
করে যারা, তা'রা নবযুগের নৌজোয়ান !
তাহাদের পথে এস না ভীরু, আল্লার না-ফর্‌মান !
ওরা দুর্জ্জয় ভয়-হারা,
ওদেরে ভ্রান্ত কয় কা'রা ?
এই মর্ত্ত্যের ভোগের গর্ত্তে যারা মরে ?
অমৃত আনিতে যায়—তা'রে অনাদর করে ?
এক আল্লার সৃষ্টিতে
এক আল্লার দৃষ্টিতে
দেখিবে সবারে দুনিয়াতে নৌজোয়ান !
তলোয়ার তা'র বক্ষে লুকানো নববধূ-সম শয্যাতে—
নৌজোয়ান ! নৌজোয়ান !

—নবযুগ

---

## ঈদের চাঁদ

সিঁড়ি-ওয়ালাদের দুয়ারে এসেছে আজ
চাষা মজুর ও বিড়ি-ওয়ালা;
মোদের হিস্‌সা আদায় করিতে ঈদে
দিল যে হুকুম আল্লাতা'লা!
দ্বার খোলো সাততলা-বাড়ী-ওয়ালা, দেখ কা'রা দান চাহে,
মোদের প্রাপ্য নাহি দিলে যেতে নাহি দেবো ঈদ্‌গাহে!
আনিয়াছে নবযুগের বারতা নতুন ঈদের চাঁদ,
শুনেছি খোদার হুকুম, ভাঙিয়া গিয়াছে ভয়ের বাঁধ্।
মৃত্যু মোদের ইমাম সারথি, নাই মরণের ভয়;
মৃত্যুর সাথে দোস্তি হয়েছে—অভিনব পরিচয়!
যে ইস্‌রাফিল প্রলয়-শিঙ্গা বাজাবেন কেয়ামতে—
তাঁরি ললাটের চাঁদ আসিয়াছে আলো দেখাইতে পথে।

মৃত্যু মোদের অগ্র-নায়ক, এসেছে নতুন ঈদ,
বিদ্রোহের দরজা খুলিব আমরা হয়ে শহীদ।
আমাদেরে ঘিরে' চলে বাঙ্‌লার সেনারা নৌ-জোয়ান,
জানি না, তাহারা হিন্দু কি ক্রীশ্চান কি মুসলমান।
নির্য্যাতিতের জাতি নাই, জানি মোরা মজ্‌লুম্ ভাই—
জুলুমের জিন্দানে জনগণে আজাদ করিতে চাই!
এক আল্লার সৃষ্ট সবাই, এক সেই বিচারক,
তাঁর সে লীলার বিচার করিবে কোন্ ধার্ম্মিক বক?
বকিতে দিব না বকাসুরে আর, ঠাসিয়া ধরিব টুঁটি,
এই ভেদ-জ্ঞানে হারায়েছি মোরা ক্ষুধার অন্ন রুটী।

[illegible]রা শুধু জানি, যার ঘরে ধন রত্ন জমানো আছে,
[illegible]দ আসিয়াছে, জাকাত আদায় করিব তাদের কাছে।
[illegible]সেছি ডাকাত জাকাত লইতে, পেয়েছি তাঁর হুকুম,
কেন মোরা ক্ষুধা-তৃষায় মরিব, সহিব এই জুলুম ?
যক্ষের মতো লক্ষ লক্ষ টাকা জমাইয়া যারা
খোদার সৃষ্ট কাঙালে জাকাত দেয় না, মরিবে তা'রা।
ইহা আমাদের ক্রোধ নহে, ইহা আল্লার অভিশাপ,
অর্থের নামে জমেছে তোমার ব্যাঙ্কে বিপুল পাপ!
তাঁরি ইচ্ছায়—ব্যাঙ্কের দিকে চেয়োনা—উর্দ্ধে চাহ,
ধরার ললাটে ঘনায় ঘোলাটে প্রলয়ের বারিবাহ!
আল্লার ঋণ শোধ করো, যদি বাঁচিবার থাকে সাধ ;
আমাদের বাঁকা ছুরি আঁকা দেখ আকাশে ঈদের চাঁদ!
তোমারে নাশিতে চাষার কাস্তে কি রূপ ধরেছে, দেখ,
চাঁদ নয়, ও যে তোমার গলার ফাঁদ! দে'খে মনে রেখ!

প্রজারাই রোজ রোজা রাখিয়াছে, আজীবন উপবাসী ;
তাহাদেরই তরে এই রহমত, ঈদের চাঁদের হাসি ?
শুধু প্রজাদের জমায়েত হবে আজিকার ঈদ্‌গাহে,
কাহার সাধ্য, কোন্ ভোগী রাক্ষস সেথা যেতে চাহে ?
ভেবো না ভিক্ষা চাহি মোরা, নহে শিক্ষা এ আল্লার,
মোরা প্রতিষ্ঠা করিতে এসেছি আল্লার অধিকার!
এসেছে ঈদের চাঁদ বরাভয় দিতে আমাদের ভয়ে,
আবার খালেদ এসেছে আকাশে বাঁকা তলোয়ার লয়ে!
কঙ্কালে আজ ঝলকে বজ্র, পাষাণের জাগরণ,
লাশে উল্লাস জেগেছে রুদ্র উদ্ধত যৌবন!

দারিদ্র্য-কারবালা-প্রান্তরে মরিয়াছি নিরবধি,
একটুকু কৃপা করনি লইয়া টাকার ফোরাত নদী।
কত আস্‌গর মরিয়াছে, জান, এই বাপ মা'র বুকে ?
সখিনা মরেছে, তোমরা দখিনা বাতাস খেয়েছ সুখে !
শহীদ হয়েছে হোসেন, কাসেম, আস্‌গর, আব্বাস ;
মানুষ হইয়া আসিয়াছি মোরা তাঁদের দীর্ঘশ্বাস !
তোমরাও ফিরে এসেছ এজিদ সাথে লয়ে প্রেত্‌-সেনা,
সে-বারে ফিরিয়া গিয়াছিলে, জেনো, আজ আর ফিরিবে না !
এক আল্লার সৃষ্টিতে আর রহিবে না কোনো ভেদ,
তাঁর দান কৃপা কল্যাণে কেহ হবে না না-উম্মেদ্‌ !
ডাকাত এসেছে জাকাত লইতে, খোলো বাক্সের চাবি ;
আমাদের নহে, আল্লার-দেওয়া ইহা মানুষের দাবী !
বাঁচিবে না আর বেশীদিন রাক্ষস লোভী বর্ব্বর,
টলেছে খোদার আসন টলেছে ; আল্লাহু-আকবর !
সাত আসমান বিদারি' আসিছে তাঁহার পূর্ণ ক্রোধ,
জালিমে মারিয়া করিবেন মজ্‌লুমের প্রাপ্য শোধ !

—নব

---

# দেওয়ান একলিমুর রাজা চৌধুরী

## স্বপন

এখন স্বপন নয় তখন স্বপন
কেমনে বলিতে পার !
অলীক এ কিছু নয়, ভাবো কি তখন
যখন স্বপন হের ?

নদীর পারে ছিল আমার ছোট্ট কুঁড়ে ঘর ;
চালের পাশে খোঁপে ব'সে ডাক্‌ত কবুতর ॥

নদীর জলে হেলে' দুলে' ভেসে' যেত না' ;
পথিক যেত পথে চলে', ধুয়ে' যেত পা' ।
মাঠের মাঝে ধানের ক্ষেত, মধ্যিখানে বিল ;
সেথা হ'তে উড়ে' যেত নীলাকাশে চিল ।
ঘোমটা টেনে' নূতন কণে ধুয়ে' যেত গা',
পলতা লতায় জড়িয়ে যেত কৃষক-বধূর পা' ।
ঢেউয়ের উপর ঢেউটি তুলে' নাচত সরোবর,
চালের পাশে খোঁপে ব'সে ডাক্‌ত কবুতর ॥

আমাদের এই আঙিনাতে ছিল ফুলের রাশ,
ফুট্‌ত কত কুসুম-কলি, ঝর্‌ত বারো মাস ।
জ্যোৎস্না এসে নাম্‌ত হেসে' উজল ক'রে জল,
সোহাগ ভরে স্তরে স্তরে নাচ্‌ত শতদল ।
জলের তলে চাঁদের ছায়া দুলত দোদুল-দোল ;
পুলক যেন দ্যুলোক ছেপে' ভর্‌ত নদীর কোল ।
উজাড় ক'রে ফুলের মধু লুট্‌ত মধুকর ;
ঢেউয়ের উপর ঢেউটি তুলে' নাচ্‌ত সরোবর ॥

---

১৫।

# জসীমউদ্‌দীন

## রূপাই

এই গাঁয়ের এক চাষার ছেলে, লম্বা মাথার চুল,
কালো মুখে কালো ভ্রমর, কিসের রঙিন ফুল!
কাঁচা ধানের পাতার মতো কচি মুখের মায়া,
তা'র সাথে কে মাখিয়ে দেছে নবীন তৃণের ছায়া!
জালি লাউয়ের ডগার মতো বাহু দু'খান সরু;
গা-খানি তা'র শাঙন মাসের যেমন তমাল তরু!
বাদল-ধোয়া মেঘে কে গো মাখিয়ে গেছে তেল,
বিজলি-মেয়ে লাজে লুকায় ভুলিয়ে আলোর খেল!
কচি ধানের তুল্‌তে চারা হয়তো কোনো চাষী
মুখে তাহার ছড়িয়ে গেছে কতকটা তার হাসি!

কালো চোখের তারা দিয়েই সকল ধরা দেখি,
কালো দ'তের কালি দিয়েই কেতাব কোরান লেখি
জনম কালো, মরণ কালো, কালো ভুবনময়;
চাষীদের ওই কালো ছেলে সব করেছে জয়।
সোনায় যেজন সোনা বানায়, কিসের গরব তার;
রঙ পেলে ভাই গড়তে পারি রামধনুকের হার।
কালোয় যেজন আলো বানায়, ভুলায় সবার মন,
তারি পদঃরজের লাগি' লুটায় বৃন্দাবন।
সোনা নহে, পিতল নহে, নহে সোনার মুখ,
কালো বরণ চাষীর ছেলে জুড়ায় যেন বুক!

যে কালো তার মাঠেরই ধান, যে কালো তার গাঁও,
সেই কালোতে সিনান করি' উজল তাহার গাও।
আখ্‌ড়াতে তা'র বাঁশের লাঠি মানে অনেক মানী,
খেলার দলে তা'রে নিয়েই সবার টানাটানি।
জারীর গানে তাহার গলা উঠে সবার আগে,
শাল সুন্দি বেত যেন ও,—সবার কাজেই লাগে।
বুড়োরা কয়, ছেলে নয় ও, পাগাল-লোহা যেন,
রূপাই যেন বাপের বেটা, কেউ দেখেছে হেন!
যদিও রূপা নয় গো রূপাই, রূপার চেয়ে দামি;
এক কালেতে ওরই নামে সব গাঁ হবে নামী॥

—নক্সীকাঁথার মাঠ

---

## গ্রামের দাঙ্গা

শোন ভাই সকলে কুতূহলে করি নিবেদন,
নমু-মুসলমানের দাঙ্গা করিব বর্ণন।
সন তের শো উনত্রিশে, মাঘ মাসের রাতে,
কাজীর গাঁয়ে পড়লো নমু শড়কী ল'য়ে হাতে।
মশাল জ্বালি' হাজার ঢালী ঘুরিয়ে রাম দাও—
জিলকি-দেয়া সঙ্গে ল'য়ে আস্‌ল যেন বাও।
মৌলুদের ম'ফিল ছেড়ে উঠ্‌ল তেড়ে যতেক মুসলমান,
'আলী' 'আলী' শব্দ করি' ভাঙিল আস্‌মান।
লাগ্‌ল আগুন, জ্বল্‌ল দু'গুণ জগৎ-জোড়া শিখা,
কপালেতে পড়্‌ছে যেন জাহান্নামের টিকা!
আস্‌ল ছুটে' মানুষ জুটে' নানান্ গ্রামের থেকে,
সেই আগুনের তপ্ত শিখা বুকের পাঁটায় এঁকে'।

নায়েব মশায় ছিলেন সদয় যতেক নমুর 'পরে;
তেলীহাটীর পরগণাতে এলেন দাওয়াৎ ক'রে।
মোহনপুর, কেষ্টপুর, মাধবদিয়া ছাড়ি'
পঙ্গপালের মতো নমু ছুট্‌ল তাড়াতাড়ি।
ঢাকার নবাব দিলেন জবাব, হাজার মুসুলমান
পদ্মা নদী পার হইয়া ঘিরিল আসমান।
এলো কাজেম খুনী, শব্দে শুনি' বন্দুকেরই গুলী
আল্লীর নামে ডাক্ ছাড়িয়া মুখেই নিত তুলি'।
এলো ছদন মাল, জুতার ফাল বিঁধ্‌ত না যার চা'মে,
সাত আট দিন লড়াই ক'রে গা নাহি যা'য় ঘামে।
এলো বচন মিঞা, কোরাণ লিয়া এসমে-আজম্ পড়ি'
ফুক্ ছাড়িলে হাজার লেঠেল গড়্‌ত গড়াগড়ি।

নমুর মাঝে সকল কাজে আগে যাহার ঠাঁই
তেলী-হাটীর গদাই মাল, তুলনা তার নাই।
গদাই মাল দেয় ফাল আট কাঠা ভুঁই জুড়ে',
আকাশ চিরে' বিজলী ছুটে বর্শা যখন ছুঁড়ে।
এলো রামহাতি, যুদ্ধে মাতি' থাপড় মারে বুকে,
বোশেখ মাসের ঠাঠা যেমন গিরির বুকে ঠুকে!
এলো নিধিরাম, যেমন নাম তেমন তাহার কাম,
বন-সজারুর মতন তাহার সকল গায়ের চাম;
বারুদ-গুলী মুখে তুলি' চিবোয় যেন মুড়ি,
দশটা কাইজা শেষ করে সে দিয়ে হাতের তুড়ি।
এলো মোহন রায়, পূবের জয় মন্ত্র ছুঁড়ি' ছুঁড়ি'—
ষোল শ ডাক-ডাকিনী তা'র সঙ্গে নাচে ঘুরি'।

এমনি ক'রে দিনের পরে যতই দিবস চলে,
নমু-মুসলমান মাতিল রণের কোলাহলে।
গ্রাম জ্বালিল, ঘর পুড়িল, দেশ হ'ল ছারখার ;
কিন্তু নমু-মুসলমানের হুঁশ নাহি ক আর।
এই এল রে, এই গেল রে, ধর্ মার্ মার্, ভাই !
জাহান্নামের আগুন-দোলা তুলিয়ে দোল খাই !
সকল মানুষ হদ্দ বেহুঁশ পতঙ্গেরই মতো,
আপন হাতে জ্বল্‌ল আগুন, আপনি হতে হত।
মায়ের বুকের দুধের খোকন, আছ্‌ড়িয়ে তায় মারি'
ক'রছে সব পথে-ঘাটে লাঠিয়েল নাম জারি।

হায় হাহাকার উঠ্‌ল এবার ভরি' সকল দেশ,
রোজ-কেয়ামত তক্ যেন এর হবেই না ক শেষ।
শ্মশান-ঘাটায় রাত্র দিবা চিতার পরে চিতা
সাজিয়ে এবার কতই মাতা কাঁদছে ব্যথায় ভীতা।
যেথায় চাহি মানুষ নাহি, শুধুই কবর-খানা,
শিয়াল শকুন গৃধিনীরা ফির্‌ছে দিয়ে হানা।

দিনের পরে দিন গুজরে, নিব্‌ল চিতার জ্বালা ;
কবর 'পরে দুর্ব্বা-ঘাসে মেল্‌ল পাতার ডালা।
জনম-দুখী পোড়ার-মুখী রইল বেঁচে' যারা
তাদের বুকের কবরে ঘাস মেল্‌ল না ক চারা।
বাতাস থেকে চিতার থেকে উড়্‌ল শুধু ছাই,
বুকের চিতার দ্বিগুণ আগুন জ্বালিয়ে দিল তাই।

—সোজন বাদিয়ার ঘাট

## রঙিলা নায়ের মাঝি

আরে ও রঙিলা নায়ের মাঝি !
তুমি এই ঘাটে লাগাইয়া রে নাও
নিগূম্ কথা কইয়া যাও শুনি ।
তোমার ভাইটাল সুরের সাথে সাথে
কান্দে গাঙের পানি,
ও তার ঢেউ লাগিয়া যায় ভাসিয়া
কাঙ্খের কলসখানি ।
পূবালি বাতাসে তোমার নায়ের বাদাম ওড়ে,
আমার শাড়ির অঞ্চল ধৈরয না ধরে ।
তোমার নি পরাণ রে মাঝি হরিয়াছে কেউ ;
কলসী ভাসায়ে জলে গণেছে নি ঢেউ ॥

---

## গহিন গাঙের নাইয়া

ও আমার গহিন গাঙের নাইয়া !
ও তুমি অফর বেলায় নাও বাইয়া যাও রে—
কার পানে বা চাইয়া ।
( আরে আরে ও দরদী ! )
ভাটীর দেশের কাজল মায়ায়
পরাণটা মোর কাইন্দা বেড়ায় রে —
আব্ছা মেঘে হাতছানি ছ্যায়
কে জানি মোর সয়া ।

সাজেদা খাতুন

এই না গাঙের আগের বাঁকে আমার বঁধুর দেশ,
কলা-বনের বাউরী বাতাস দোলায় মাথার কেশ।
কইও খবর তাহার লাইগা
কাইন্দা মরে এক অভাইগা রে—
ও তার ব্যথার দেয়া থাইকা থাইকা
ঝরে নয়ান বাইয়া॥

---

# সাজেদা খাতুন

## তোমার দান

আমার বলিতে যাহা কিছু দেখি, সকলি তোমার দান।
হে বিপুল, হে মহান্!
কত না রতনে যতন করিয়া
আমার ভুবন দিয়াছ ভরিয়া হে!
আমি করি ভোগ, তুমি কোথা গিয়া করিছ অধিষ্ঠান?
হে অতীত, হে মহান্!
চিরদিন শুধু করেছি গ্রহণ
অভাগিনী আমি পারি নাই কিছু দিতে;
পাও নাই কিছু, চাও নাই কিছু,
সেই ব্যথা প্রিয় অঙ্কিত আজি চিতে।
তবু চোখে ও কি স্নেহ-করুণ দৃষ্টি
শুধু প্রেম ক্ষমা করিছ বৃষ্টি হে!
রক্ষা করিছ আমার সৃষ্টি, দিতেছ আমার প্রাণ।
হে প্রেমিক, হে মহান্!

—মোসলেম ভারত

---

## বন্দে আলী মিয়া

### মিলন

আঁধারের বক্ষ চিরি' মেঘে মেঘে জাগে গরজন,
বেগে ধায় অশান্ত পবন।
অসীম শূন্যতা ভরি' কলস্বরে ঝরে বৃষ্টিধারা
গতিময় বাধাবন্ধহারা।
নীরন্ধ্র জমাট মেঘ নভঃপটে করিয়াছে ভিড়,
উতলা সুরভি বাহি' আসে হেথা পূবালী সমীর ;
অশ্রান্ত ঝিল্লীর ধ্বনি কাণে এসে করিছে আঘাত,
ক্ষণে ক্ষণে কেঁপে ওঠে রাত॥
সেই জলধারা মাঝে আপনা পাশরি ঘুম-ঘায়
এলায়িত শুভ্র বিছানায়
অতনু-শিহর তনু তব, স্পর্শি' ভাঙাইনু ঘুম,
ফুটাইনু মনের কুসুম।
অন্তরে বাহিরে মোর উঠিলো সে কী-যে কলরব !
অঙ্গ বাহি' এলো ঝড়, দেহে জাগে মধু-মহোৎসব !
সবার অলক্ষ্যে তুমি ধরা দিলে দু'হাতে আমার,
তুমি-আমি—কিছু নাই আর॥

---

### কল্‌মিলতা

এলোমেলো বায়ে দুলে নিরবধি কল্‌মি-লতা,—
তারি মাঝে কাঁপে বিলের বুকের গোপন কথা।
বিহানের রোদে টল্-মল করে বিলের পানি,
বুক জুড়ে' ভাসে রূপে ডগমগ কল্‌মি-রাণী।

থোকা থোকা লতা, পাতা গুছি গুছি—কাজল-কালো,—
দলমলে রূপে সারা ঝিলখানি করেছে আলো।
দামের আড়ালে পানকড়ি নামে মিলিতে ঝাঁকে,
মাঝে মাঝে তারি হেথায়-হোথায় কোথায় ডাকে।
শ্যাওলার ফাঁদে পথ খুঁজে' কাঁদে বকের মেয়ে,
সাদা-মেঘে-ধোওয়া রঙটি কোথায় গিয়েছে চেয়ে'!
ঘেরি' চারিধার টলমল করে কাজল জল,—
তারি কোলে কাঁপে নীল আসমান অথই তল।

কলমির ফুল-কুমারীর দল খুসিতে ভরা,
চোখে চোখে যেন রূপের কাজল পাগল-করা!
বেগুনী রঙের রসে-ঢলঢল দু'খানি ঠোঁটে
মরমের মধু উথলি যেন বা উছলি' ওঠে!
ছোট আর বড় কলমির কুঁড়ি সরমে নত—
অতি ধীরে যেন ফোটে বাঙলার বধূর মত।
পল্লী-মায়ের বুকের দুলালী কলমিলতা,—
দূরে বসে' আজি মনে ভাবি তোরি মনের কথা!

—ময়নামতীর চর

---

## দিদারুল আলম

### চির-চপল

স্বপনের কল্পগাথা-সম—
আমার নিঝুম প্রাণে জাগাইয়া ছবি অনুপম,
কেন তুমি দিলে সুর, ছন্দহারা বেদন-বেহাগ্?
কেন শুধু হিয়া-পটে জ্বালাইলে অগ্নি-রাঙা রাগ?

আমার হৃদয়-কোণে সঞ্চারিয়া মন্দাকিনী-সুধা,
জাগায়েছ হিয়া মাঝে চির-চাওয়া কাঙালের ক্ষুধা।
ওরে মোর চিরাদৃত চির-স্নিগ্ধ ইপ্সিত বিধাতা!
তোমার পরশে আজ মনোবীণে নবারুণ-গাথা
ঝঙ্কারিয়া তুলিয়াছে সুর;
উচ্ছ্বসিত হিয়া মোর, কণ্ঠ-ভরা ব্যথা।
এ কি শুভ্র অনাবিল পূত ধারা প্রশান্ত নিঝুম,
হৃদয়ের প্রতি স্তরে ফুটে' ওঠে কুঙ্কুম-কুসুম।
তারি পাশে ভেসে' ওঠে স্বপনের সীমন্তিনী বালা ...
নিশার সমাধে যেন রেঙে' ওঠে বারিধির বেলা।—
এ কি শান্তি মন্দাকিনী, এ কি ক্ষুধা দুরন্ত দুর্ব্বার!
কভু শান্ত তৃপ্ত মন, কভু গাহে গান নিরাশার।
অভিমানে গুঞ্জরিয়া কয়—
আমার বিলাপ-গানে কেন শান্তি দিলে অসময়?
আমি চাই বিদায়ের যুগ-প্রসূ অশ্রু-ভাঙা ভাষা।
অনাদৃত নিঃস্ব কবি, মিটিবার নহে কভু আশা।
আমার মনের মাঝে তুলিয়াছ যেই হারা-তান,
তারি মাঝে সুপ্ত মম ব্যথা-কুঞ্জ—প্রলয়-বিষাণ।
তাই শুধু বাজাইও, প্রভু, তব অকাজের বাঁশী,—
আমার সুষুপ্ত প্রাণে জাগে যেন ক্ষুধার্ত্ত সন্ন্যাসী।
ওগো মোর আত্মাশক্তি, ওগো মোর রক্তাম্বর প্রিয়!
কামনার বরলাভে অবসাদ নাহি মোরে দিও।
দিও তব অগ্নিখেলা, বিরহের তপ্ত আঁখি-জল,—
আমার উচ্ছ্বল গানে কাঁপে যেন সৃষ্টি টলমল।

---

# হুমায়ুন কবির

## অযোধ্যা

শুনিনু নিদ্রার ঘোরে অযোধ্যার নাম।
হেরিলাম স্বর্ণপুরী। পথে পথে তা'র
শত শত নরনারী কাঁদে অবিরাম,
আর্ত্তকণ্ঠে নভোতলে ওঠে হাহাকার।

তরুণ দেবতা সম কিশোর কুমার
যৌবনে সন্ন্যাসী সাজি' চলিয়াছে বনে,—
সীতার বিরহ-ভয়ে পুরী অন্ধকার,
গগন শ্বসিয়া ওঠে নিরুদ্ধ ক্রন্দনে।

চমকি' উঠিনু জাগি'। তপ্ত নিদাঘের
মূর্চ্ছিত ভুবন ভরি' রৌদ্রানল জ্বলে।
স্টেশন-অঙ্গনে ডাকে গ্রীষ্মাতুর স্বরে
অযোধ্যার নাম। ধূসর ধুলির 'পরে
ব'সে আছে বানরের দল। দূরে ঝলে
সূর্য্যালোকে স্বর্ণচূড়া ভগ্ন মন্দিরের॥

—অষ্টাদশী

---

## যাত্রা

কারাভাঁর যাত্রা হ'ল শুরু।
শঙ্কিল সংকীর্ণ পথে গোধূলির অস্পষ্ট আলোকে
কোন্ দূর দিগন্তের অপ্রকাশ আহ্বানের টানে
অবেলায় অসময়ে কারাভাঁর যাত্রা হ'ল শুরু?

'পিছনে রহিল পড়ে' পরিচিত প্রাচীন জগৎ।
স্বপ্নপুরী-সম তা'র সুপ্তিময় গৃহ,
ইষ্টকের খণ্ডে খণ্ডে স্মৃতির পশরা,
কঙ্কালের অস্থিচূর্ণ মৃত্তিকার কণায় কণায়,
আশা-আশঙ্কার গন্ধে উন্মন বাতাস,
সমাধির অচঞ্চল স্থৈর্য্য শান্তিময়
অবসাদ ছড়াইছে আকাশে আকাশে,
পরিপূর্ণতার ভারে আড়ষ্ট নিশ্চল প্রাণধারা,
যৌবন-বিস্মৃত পাণ্ডু পক্কতায় মৃত্যুর আভাষ।

শ্মশানের শান্তি সেথা—
সুপ্তির আহ্বানে ডাকে মৃত্যু ছদ্মবেশী।
বিধ্বস্ত মুমূর্ষু প্রাণ বহি' সংগোপনে
দ্বিধায়, আশংকা-ভরে, আশা-নিরাশায়
অজানিত ভবিষ্যের পানে
স্মৃতির কঙ্কাল টানি' কারাভাঁর যাত্রা হ'ল শুরু

মরুভূমি তরুলতাহীন
নিষ্ঠুর আকাশ-তলে দিগন্তে বিলীন,
অনিশ্চিত কম্প্র আলো, অস্পষ্ট মলিন চক্রবাল,
পথের ইঙ্গিত নাহি, মহাকাল বাধাবন্ধহারা—
আদিম অনন্ত শূন্য রেখেছে বিছায়ে।
ঊর্মিল বন্ধুর ভূমি বালুস্তূপময়
চঞ্চল আবর্ত্ত-সম পরিচয়হীন
স্মৃতির সমাধি রচি' ক্ষুধিত রাক্ষসী যেন জাগে।

## হুমায়ুন কবির

দিশাহীন ছেদহীন লক্ষ্যহীন সে-অসীম ভেদি'
মৃত্যুর আহ্বান ঠেলি' কারাভাঁর যাত্রা হ'ল শুরু।

মরুভূমি গোধূলির অনিশ্চয় অসীমে হারালো ?
অকস্মাৎ বিভীষিকা সমুদ্রের তরঙ্গে তরঙ্গে
মূর্চ্ছাহত বালুকণা জাগালো কি মৃত্যুর আহ্বান ?
অন্ধকারে প্রেতদল পথপাশে অট্টহাসি হাসে ?
কঙ্কালের শ্বেত নগ্ন অস্থি-র গহ্বরে
প্রাণঘাতী বিভৎস রাগিনী ?
মৃত্যু, শঙ্কা, মূর্চ্ছা, গ্লানি আচ্ছন্ন গগন
মানুষের দুরাশার অভিযানে টানি' দিল ছেদ ?
অদৃশ্য আলোর দীপ্তি অজানিত কোন্ নভোতলে
সহসা চমকি' ওঠে উদ্ভাসিয়া অন্তরের ছায়া ?
মরুভূমি-পরপারে কোথা স্বর্ণদ্বীপ
প্রলোভন-সম রক্তে ছন্দ দেয় আনি',
তারি পানে উন্মীলিয়া সকল হৃদয়
গোধূলির অন্ধকারে তিমির রাত্রির বক্ষ ভেদি'
পথহীন প্রান্তরের নামহীন বিপদে উত্তরি'
অজ্ঞাত উষার পানে কারাভাঁর যাত্রা হল শুরু ?

—চতুরঙ্গ

---

# মোতাহের হোসেন চৌধুরী

## কবি

আমি কবি, সুন্দরের গাহি জয়গান,
রূপের অঞ্জন আঁকি যুগল নয়নে ;
সন্ধ্যারক্তরাগসম দীপ্ত মোর প্রাণ,
নিত্য সেথা ফোটে ফুল বিচিত্র বরণে।

এ-বিশ্বের যত শোভা গন্ধ গান সবি
প্রাণের দুয়ারে মোর অর্ঘ্য দেয় নিতি,
আঁখির প্রসাদ যাচি' হাসে রাঙা রবি,
তারায় তারায় কাঁপে অনির্ব্বাণ গীতি।

এ-আকাশ, এ-আলোক, চন্দ্র-সূর্য্য-তারা,
নৃত্যপরা এ মোদের সুন্দর ভুবন
শিরায় শিরায় ঢালে আনন্দের ধারা,
চোখের তারায় আনে সোনার স্বপন।

মধুর এ বিশ্ব মাঝে লভিয়াছি ঠাঁই,
নিত্য তাই সঙ্গীতের কুসুম ফুটাই ॥

---

## উতলা রজনী

আজ রাতে সখি জোছনা ঝরিছে মাঠের 'পরে,
জোছনা ঝরিছে হাওয়ায় দোলান' ঝাউয়ের শাখে,
মুচ্‌কি হাসিয়া চাঁদ উকি মারে মেঘের ফাঁকে,—
কালো আর আলো কোলাকুলি করে পুলক ভরে।

সুন্দরী ধরা রূপালী আলোর বসন পরে,
সারা দেহ তার শিউলি ফুলের সুরভি মাখে,
পথ-তরুতলে কুসুম-গন্ধ ঘুমিয়ে থাকে,—
উতলা পবন নিয়ে যায় তা'রে সকল ঘরে।

আজ রাতে মোরা ঘুমাব না, সখি, জাগিয়া র'ব,
ছিপ্ ছিপে তব হাতখানি দাও আমার হাতে ;
ফিস্‌ফিস্ ক'রে কাণে কাণে দোঁহে কথা যে ক'ব,
মনের গহনে স্বপন রচিব কথার সাথে।

বন-মর্ম্মর শুনেছি গোপন মনের মাঝে :
উতলা রজনী, আজ কি মোদের ঘুমান সাজে !

---

# কাজী কাদের নওয়াজ

## মাজার-ই-সিরাজউদ্দৌলা

প্রশ্ন তোমায় করেছি আজ বাঙ্‌লার শেষ স্বাধীন নবাব,
গোর 'পরে তাই কাণ পেতে রই, শুন্‌তে যে মোর কথার জবাব ॥
পাইনে কেন একটু সাড়া,
ঝিল্লিরা সব ঝিঁঝিট্-হারা,
যে দিকে চাই, নীরব নিঝুম তাকিয়ে আছে অযুত তারা ;
গহিন রাতেই মাজার ধরি' দাঁড়িয়ে ফেলি অশ্রু-ধারা।

ভেবেছিলাম আজকে রাতে সফল হবে আমার খোয়াব,
কুর্নিশ যে ক'রব হেরি' বাঙলার শেষ স্বাধীন নবাব !

'মাজার' ধরি' কাঁদতেছি তাই,
তিলেক দেখা পাই যদি পাই,
ব'সতে দিয়ে প্রাণের আসন বল্‌বো ভাসি' নয়ন জলে—
আর দিব না যেতে, সিরাজ! খোশ্‌বাগের ঐ মাটীর তলে।

ব্যর্থ হ'ল আশার স্বপন, দেখছি চেয়ে' 'মাজার' 'পরে,
নিবু নিবু মোমের বাতির অঝোর যেন অশ্রু ঝরে।
উড়্‌ছে শুধু রাতের পাখী
সজল যেন চাঁদের আঁখি,
তরল হয়ে জ্যোৎস্না যে তাই পড়ছে ঝরি' কবর 'পরে;
ঘুমায় 'সিরাজ', শীতল হাওয়ায় চামর ঢুলায় তার শিয়রে।

ঐ যে 'আলিবর্দ্দী' ঘুমান্, পাশেই 'সিরাজ' রয় ঘুমায়ে,
দাত্থ তাহার আদর করি' বুলায় না হাত তাহার গায়ে।
"আমার মাণিক আমার যাদু"—
বলছে না কই আর ত' দাছু,
আর ত' জেগে দেখছে না তা'র মাণিক ঘুমায় মাটীর তলে;
মখ্‌মলের সে শয্যা কোথায়? ধূলায় শয়ন তার বদলে!

নিয়তিরই এই কি লিখন? অকালে তাই চাঁদ ডুবেছে;
'পলাশীর'ই প্রান্তরে হায়, সূর্য্য মোদের অস্ত গেছে!
'সিরাজের' এ নয় ক 'মাজার',
আমাদেরই পাপের সাজার
চিহ্ন এ যে, হায় রে ব্যথায় বৃথাই ঝরে এ মোর আঁখি!
কাঁদিস কেন? শোন্‌ রে ও মন! এখনও দিন অনেক বাকী॥

———

# আবদুল কাদির

## সনেট

১

আমার অঙ্গন ঘেরি' ঘনায়েছে বাদলের রাত,
সমস্ত আকাশ ভরি' কাঁদে বায়ু বর্ষণ-মুখর।
নিঃশব্দ ভুবনে মোর ভেসে' আসে বনের মর্ম্মর ;
মনে পড়ে দূর-স্মৃতি ঃ ছায়া তব দেখি অকস্মাৎ !—
মধ্যরাত্রে কী চাহিয়া মোর কাছে বাড়ায়েছ হাত,
ঘুম ভাঙি' এলে কোন্ সমুদ্রের শুনি' হাহা-স্বর ?
শিহরে অন্তর মম, বন-কুঞ্জে কদম্ব-কেশর ;
বক্ষে তব বহ্নিজ্বালা, ক্ষণ পরে হেরি অশ্রুপাত।

শ্রাবণ-নিশীথে মোর বিশ্বতলে মরণ-উৎসব ;
কী চাহিছ হেন লগ্নে, হে আমার বিষন্ন ভিখারী !
ঝড়ের তাণ্ডবে আজি ম্লান মম যৌবন-সৌরভ,
প্রেমের আনন্দ-লোকে পঙ্গু পাখা কেমনে প্রসারি ?
মেঘস্তূপে লুপ্ত এবে জীবনের অগ্নি-অনুভব,
বিদ্যুতের হাহাকার শোনো বৃথা চাহি' স্নেহ-বারি ॥

২

বাতায়ন দুলি' ওঠে ক্ষণে ক্ষণে বায়ুর নর্ত্তনে,
তরঙ্গিত মেঘ-সম ঝড়ে অঙ্গে ওড়ে নীলাম্বরী।
তারি মাঝে এলে তুমি বৈশাখীর অশ্বরাজে চড়ি',—
সিন্ধুপারে কোথা মোরে সঙ্গে নিয়ে যাবে সঙ্গোপনে ?
কাঁপিছে মন্দির মম মুহুর্মুহু অশান্ত পবনে,—
হে দুরন্ত দস্যু মোর ! লুণ্ঠি' সব নিয়ে যাবে হরি' ?
বক্ষোভাণ্ডে রেখেছিনু যত সুধা সযত্নে আবরি',
সমস্ত ভাসায়ে নিবে আজিকার অশ্রান্ত বর্ষণে ?

বনে বনে চম্পাতলে বাদলের প্রমত্ত প্রলাপ ;
বিদ্যুতের ক্ষীণালোকে হেরি হেথা তব বজ্রমুঠি।
পুরাতন গৃহ তরে মোর সব বিফল বিলাপ,—
টুটিয়া অর্গল-দ্বার তুমি মোরে নিয়ে যাবে লুঠি' !
আত্মার আসঙ্গে ভুলি' সংসারের তুচ্ছ অভিশাপ
কলঙ্কের পঙ্ক হ'তে পদ্ম-সম উঠিব প্রস্ফুটি' ॥

---

## কোনো মেয়ের প্রতি

শোনো লাবণ্যলতা,
শারদ নিশীথে স্মরিছে শেফালি বসন্ত-ব্যাকুলতা।
অতীত ঊষার ছায়া দোলে আজি সহসা সন্ধ্যারাগে,
আকাশের নীল আঁখির কাজলে জ্যোৎস্না-স্বপন জাগে
শীতল গোধূলি পরিছে সোনালী সীমন্তে শশীলেখা,
ধূসর পাহাড়ে ধূমায়িত বায়ে শিহরিছে বনরেখা।
মাতাল মাঠের ফসলিত মুখে শ্যাম মদিরার মায়া,
তীরে তৃণ-ফুলে শিশির রচিছে তারার অশ্রুছায়া।
স্বপনের সুরা চন্দ্র-চকোরী পান করে সারারাত,—
মোর চিদাকাশে কৌমুদী-বাসে ভরেছে অকস্মাৎ ॥

শোনো লাবণ্যলতা,
শরীরে তোমার সুরভির মতো ক্লান্তির কোমলতা।
যৌবন তব উছসি' পড়িছে ছাড়ায়ে তনুর সীমা,
নবীন কান্তি জাগায় অঙ্গে শ্রান্তির মাধুরিমা।
শিথিলিত দেহ এলায়ে দিয়েছ পালকের গালিচাতে,
শুভ্র কাঁধের উপরে চাঁদের কণিকা ঝরিছে রাতে।

শীতল সিন্ধু তুমি, সেথা জাগে কোজাগরী নিশি মম,—
রহস্য-নীল অন্তর তোলো কুঞ্চিয়া কেশ-সম !
জোয়ার জাগুক, ঢেউয়ে ঢেউয়ে হৃদি সিকতে পড়ুক ভাঙি';
ফেন-বুদ্বুদ বিচিত্র রঙে আবার উঠুক রাঙি ॥

শোনো লাবণ্যলতা,
তনু-তরঙ্গে কল্লোলি' কহ সাগরের কী বারতা !
সন্ধ্যার ঢেউয়ে আগুনের ফুল নাচায়ে শতেক রূপে
শ্যাম নিশীথেরে সুরভিত করি' এসো স্বপনের ধূপে !
জলের ছন্দে হৃদয়ের 'পরে কাঁপিতেছে নীল আশা :
তোমার শিখায় পাবে প্রজাপতি প্রণয় সর্ব্বনাশা ।
আমার তারারা জ্বলেছিল যবে অস্ত-চিতাগ্নিতে,
পূবের পাহাড় পূরিল সহসা সূর্যোদয়ের গীতে ।
দূর প্রভাতের শুক্তারা জ্বলে তব রাঙা সিঁথি-মূলে ;
আঁধার-ঝটিকা তরঙ্গি' ওঠে তোমার চূর্ণ-চুলে ॥

শোনো লাবণ্যলতা,
তোমারে ঘেরিয়া জাগে জীবনের বিস্মৃত কলকথা ।
প্রভাতে ভুলিনু প্রদীপের প্রীতি, শ্রাবণে ফাগুন-দিনে ;
অবিস্মরণী মণিদীপ হাতে তুমি এলে আশ্বিনে ।
বুকের বরফে বিষাদের মতো শুয়ে আছে শ্বেতপরী,—
ব্যথার আলোকে খুঁজি কোথা মোর স্বপনের সহচরী !
তারার মতন অজস্র আশা কাঁপিছে মনের হ্রদে :
মরুপথে শুধু হেরি মরীচিকা, তবু ভুলি মৃগমদে ।
উদার আকাশ নিতি থাক্ মোর কুটীরের পানে চেয়ে',—
প্রাণের গানের সুরধারা যাক্ কালের প্রান্ত বেয়ে ॥

শোনো লাবণ্যলতা,
আকাশ আজিকে সাগরের বুকে অনুরাগে অবনতা।
কিরণ-কিরীট পরি' চন্দ্রিকা নিশীথ-বাসরে জাগে ;
ভয়-বাসনার ছায়া দোলে তবু তোমার দিঠির আগে।
প্রতি রজনীতে ভাবি তব সাথে নূতন বিবাহ মোর,—
শূন্য শয়নে নিশিভোরে দেখি ছিন্ন কুসুম-ডোর।
প্রেমের পাত্রী, ফুল-গীতি গাও ফড়িঙের মতো তুলি',
আমার মনে যে সাগর জেগেছে সে-কথা রহিলে ভুলি'!
তোমার আকাশে আছাড়িয়া কাঁদে জীবনের ঝড় মম ঃ
দূর-গ্রহলোকে শঙ্কিত-চোখে লুকাও কপোতী-সম॥

শোনো লাবণ্যলতা,
নয়নে লেগেছে নীল নেশা তবু রহিলে শরমাহতা!
আত্মায় তব সূর্য্য-সুরভি, দেহে বৈশাখী-শিখা ;
বর্ষার সুরে এসেছ সিঁথায় আঁকি' বিদ্যুৎ-টীকা।
বেদনা-অনলে স্নেহ-বারি গলে তোমার মানস-মেঘে,
মুকুতার মতো ঝলসিছে মন মমতা-শিশির লেগে'।
জোয়ারের জলে গলিছে তোমার চাঁদিনী চিন্তারাশি ঃ
ভাগ্যে আমার অমানিশা লেখা, অথবা পৌর্ণমাসি?
আলো-ঝর্ণায় সপ্তঋষিরা তব সাথে করে স্নান,—
তারার তরীতে আমি গেয়ে' ফিরি ভাটী সাগরের গান॥

শোনো লাবণ্যলতা,
তব কথা স্মরি' বক্ষে আমার বাজে সুখ-সম ব্যথা।

নয়নে তোমার মমতার ছায়া ঃ মরুমায়া দিশাহারা ;
তব তনু 'পরি আমার স্বপন ভেঙে সদা হয় সারা।
মোর হিয়াতলে প্রলয় তুলিছে, দুখের ফোয়ারা জাগে ;
জীবন-পাত্রে স্বপ্ন-মদিরা পান করি অনুরাগ।
রাতের সত্য দিনে দেখি মিছে, তবু আনন্দভরে
অশ্রুজলের পিয়ালা ভরেছি পৃথিবীর খেলাঘরে।
বিরহের দাহ বাড়ায়েছ জ্বালি' শোণিতে বহ্নিশিখা,—
প্রেমের পরম পরিচয় তব দুখের আখরে লিখা॥

---

## রেজাউল করীম

### কুলকাঠি স্মরণে

ব্রাণ্ডি-শাসিত কুল্‌কাঠি, তুমি বঙ্গের নব জালিনাবাগ ;
তোমারি বক্ষে জেহাদ-যুদ্ধে মুসলিম দেহ করেছে ত্যাগ।
কুলকাঠি-বুকে হৃত প্রাণ যত, দলিত মথিত শহীদগণ,
মরিয়াও আজ অমর হয়েছে, পাইয়াছে যেন নব-জীবন।
রক্তে-আলুদা কুর্‌তা পরিয়া ঐ দেখ দূরে হোসেন বীর—
আলী আস্‌গর ! দেখ চেয়ে' তব বক্ষে এখনো বদ্ধ তীর !
কারবালা-রণে শহীদ বীরেরা এক সাথে তোমা ডাকিছে আজ,
এ ছার ধরণী ত্যাগ করি' ত্বরা চল, চল সেথা, পর'গো সাজ !
হোসেন মরেনি, মরেছে এজিদ, পূরেনি ক তার মনস্কাম,
কত কারবালা-রক্তনদীতে গোসল করেছে এ ইস্‌লাম !
তোমাদেরও এ ত হত্যা নহে গো, শক্তির এ যে উদ্বোধন,
রক্তে ডুবায়ে ইস্‌লামে আজি ঊর্দ্ধে করেছ উত্তোলন॥

— মোহাম্মদী

## মাহ্‌মুদা খাতুন সিদ্দিকা

### আমরা

ইন্দ্রধনুকের রঙে রাঙাইয়া মনের আকাশ
রচিবারে চাহি নিজ নীড়,
ভেঙে' যায় টুটে' যায় বাস্তবের নিষ্ঠুর আঘাতে,—
আমরা কঠিন পৃথিবীর।

সুদীর্ঘ চলার পথে অশ্ব-খুর উদ্দাম অধীর,
ধূলিজাল ওড়ে অবিরল ;
সহসা পথের পাশে কণ্টকের কুটিল আঘাত,
দু'নয়নে অশ্রু টলমল।
সূর্য্যকে ঘিরিয়া নিত্য আমাদের আকাঙ্খার পাখা
উর্দ্ধাকাশে উড়িবারে চাহে,
কভু বা মৃত্যুর মুখে শঙ্কাহীন ঝাঁপাইয়া পড়ে
দুর্নিবার প্রাণের প্রবাহে।
প্রাণের নির্য্যাস বহে শ্যামল সুন্দর এ-ধরণী
বিধাতার অমোঘ বিধানে ;
মনের শিকড়-শাখা মৃত্তিকার গহন গভীরে—
মাটী তাই অবিরত টানে।

বাসনা-তারকাগুলি রাত্রিদিন খণ্ড খণ্ড করি'
ভেঙে গড়ে চলিয়াছে ভিড় ;
আমরা মোদের নহি, চিরকাল রূঢ় বাস্তবের,
—আমরা কঠিন পৃথিবীর॥

---

## মহীউদ্দীন

### কালের জোয়ার

অন্ধকার নামিয়াছে পৃথিবীর বুকে।
পিঙ্গল ধোঁয়াটে কালো নির্ম্মম আকাশ—
ধ্বংস আর মৃত্যুর আঘাত
হেনে' চলে মৃত্তিকার 'পরে।
পশ্চাতে আড়াল করি' ভীতা ধরণীরে
দাঁড়ায়ে রয়েছি একা!
সম্মুখে প্রলয়-রাত্রি—
ঝড় ঝঞ্ঝা বন্যা আর বিদ্যুতের বহ্নিশিখা জ্বালি'
প্রচণ্ড আঘাত হেনে' পড়িতেছে বুকে।
নীড়ের আশ্রয় মোর উড়ে' গেল দিক্‌হারা শূন্য দিগন্তরে,—
দুরন্ত বন্যার স্রোতে ভেসে গেল আরাম-শয়ন।

কালের জোয়ার চলে—
চলে ধ্বংস মৃত্যুর তুফান!
সৃষ্টির বুদ্‌বুদ্‌গুলি মুহূর্ত্তে মিলায়ে যায় কোথা!—
যত কথা, যত সুর, স্বপ্ন ইতিহাস,
তোমার চলার পথে নিশ্চিহ্ন মুছিয়া যায় সব।
ব্যাকুল মিনতি-ভরা ব্যথাতুর কাতর প্রার্থনা,
সবলে আঁকড়ি' ধরি পৃথিবীর মাটী।
এই যে নিবিড় ক'রে বাঁচার বাসনা
তোমার কঠিন হস্ত ছিন্ন ক'রে নিয়ে যায় তা'রে

তরঙ্গে তরঙ্গে তা'রে নাচায়ে তাণ্ডব নৃত্যে,
ঝঞ্ঝার দাপটে তা'রে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে
শূন্য মাঝে দাও মিশাইয়া।

ধ্বংসের সারথি তুমি প্রলয়ের অশ্বারোহী সেনা,
নিঃসঙ্গ তোমার পথে আমি হবো সাথী।
পৃথিবীর জোনাকি-আলোতে
ভয় আর ভীরু যত ভাবনার জালে
জড়ায়ে মাকড়-সম মরা হয়ে আছি।
মাকড়শার সেই জাল ছিন্ন ক'রে দাও—
তোমার ঝড়ের পাখে ঝাপটি' টানিয়া নাও মোরে।
প্লাবনে ভাসায়ে নাও—
আকাশে উড়ায়ে নাও আলোতে আঁধারে লোকে লোকে
যুগ হ'তে যুগান্তরে, কাল হতে মহাকাল-পানে।

---

## আড়িয়ল বিল

আ'ড়ল বিলের কাজল ছায়া সবুজ ধানের ক্ষেত,
ছেলেবেলার স্বপন জাগায় মনে।
হেথা শালুক শাপলা বনে
সেদিন অকারণে
পরাণ আমার নাচতো কিশোর আমন ধানের সনে॥

ফটিক জলের মুকুর যেন কালো বিলের পানি ;
আড়জালা ওই ধনচে গাছের ডালে
ফিঙে পাখী নাচে আমি জানি।
পার-বাঁধা ওই ডাঙার পাশে বুড়ো হিজল গাছ

দাঁড়িয়ে হাঁটু জলে ;
ডালে বসে' ঝিমায় শালিক শীতল ছায়াতলে।

দোল্‌-দোলা ওই দোলে বিলের বোবা ঢেউয়ের দোলায়,
আমার মনের মৌন ব্যথার পরশ যেন বুলায়।
শাদা মেঘের পাহাড়-ঘেরা আকাশ গাঢ় নীল,
শান্ত আ'ড়ল বিল।
ময়ূরকণ্ঠী দু'ঘন্টি পাল উড়িয়ে পূবান্ বায়
বকের মতো যায় উড়ে' যায় হাজার পান্‌সি নাও ;
পরাণ টানে দূরের পানে আব্‌ছা-কালো গাঁও।

আমার মনের বাবুই পাখী বিবাগী কার লাগি' ?
হারিয়ে-যাওয়া কিশোর-বেলার সোনার পৃথিবীরে
আবার যেন নূতন ক'রে নিতে চায় সে আঁকি'।
উদার আকাশ তলে যেথায় ডাঙার সবুজ ঘাসে
শাদা বকের ভিড়—
তারি পাশে একটি বিজন কোণে
বাঁধতে চায় সে নীড়॥

—স্বপ্ন, সংঘাত, যুদ্ধ ও বিপ্লব

---

## আশ্‌রাফ আলী খান্

### ঈদ

"ঈদের যে আর হপ্তা খানেক বাকী আছে, তা' কি মনে নাই ?
নায়েব সাহেব, তপশীলে যাও, টাকা চাই ঢের টাকা চাই।
খোকা-খুকীদের জুতা ও কাপড়ে
কমের পক্ষে দু'শ' টাকা গড়ে—

ওদের মায়ের একারই তিনশ', কম নহে তার এক পাই ;
শালা-শালী আর চাকর-বাকরে পাঁচশ' বাজার-খরচাই।"

নায়েব নিলেন দাখিলার বহি, লাঠিটা লইল পেয়াদা ;
পাঁচশত আজ আনতেই হবে, না-ও যদি হয় জেয়াদা।
পাড়ায় পাড়ায় পড়ে' গেল হাঁক,—
"ওরে রে সলিম, ডাক সবে ডাক,
সারা বছরের খাজনা বাবদ যত টাকা আছে বে-আদা,
সব যদি শোধ না দিতে পারিস্, আজিকার মত দে' আধা।"

দয়ালু নায়েব সময় দেছেন তিনটা দিবস কুল্লে,
কাহারো ভিটার থাকিবে না মাটী জমিদার রাগে ফুল্লে।
ভয়ে ভয়ে কেউ হালের গরুটা
বেচে' ফেলে' দেও সিকি দামে ঝুটা,
কেউ বা তাহার গোলার ধান্য বেচে' ফেলে আধা মূল্যে ;
খাই বা না খাই, টাকা দিতে হবে, চলিবে না তাহা ভুল্লে।

সাঁঝের আকাশে দেখা দেয় চাঁদ, ঘরে ঘরে লাগে ধুম,
সারা রাত ধরি' চলে উৎসব, কারো চোখে নাই ঘুম।
মওলভী ক'ন্ঃ "আল্লার শা'ন্,
ঈদে হয় তাজা সকলের প্রাণ !"
প্রজা কেঁদে কয়—"ঈদের জুলুমে মরিল গরীব মজলুম।"
"ঈদ একেবারে ব্যর্থ হইল"—আল্লা ভাবেন হয়ে গুম্॥

---

# বেগম সুফিয়া কামাল

## রজনীগন্ধা

কবরীতে মোর পরেছিনু ক'টি শিথিল রজনীগন্ধা
বাদল-ব্যাকুল দুপুর-বেলায়। যখন আসিল সন্ধ্যা,
মুদিত কুঁড়ির অন্তর হ'তে বাহিরিল মৃদু বাস।
সহসা কাহার অঙ্গ-সুবাস, একটী দীরঘ শ্বাস
মনে পড়ে গেল। হাতে নিয়ে তা'রে রাখিয়া দিঠির আগে,
সাদরে চুমিয়া শুধাইনু তা'রে: "বলো, এত ব্যথা জাগে
কেন এই সাঁঝে তোমার মৃদুল মধুর সুবাস সাথে?"
কহিল না কথা। চুমিয়া আবার রাখিয়া দিলাম মাথে।

গত হল সাঁঝ। নীরব নিথর। জাগিয়া স্বপন দেখি:
শয়ন-শিথানে রেখেছিনু ফুল, কথা কহিতেছে—সে কি!
বিস্ময়ে ভরি' বুকে ক'রে তা'রে চুমিয়া শুধানু পুনঃ।
সুবাসের ভাষা মৃদুগুঞ্জনে কহিল: তা'হলে শুন!
মিলন-মধুর অনুরাগে রাঙা লাজে যে গোলাব ফুল
চুমিয়া তাহারে বন্দনা গাহে প্রিয় তা'র বুলবুল।
কমলে কিরণ-পরশ দানিয়া রবি রাঙাইয়া তোলে।
মলয়-পরশে শ্যামল মাধবী সোহাগ-লতায় দোলে।
দীপ্ত দিবসে গৌরবে ভরি' সুখে সাধে ভরপুর,
তাদের রঙিন শ্যাম শোভা তাই বিলাইছে সুমধুর।
আমি আর যুঁই দুই সখী মোরা জনম লভেছি যবে—
কোনো শোভা নাই, জনম বৃথাই, এ-জীবনে কিবা হবে!

শ্বেত গুণ্ঠনে ঢাকিয়াছি মুখ, বুকে ব্যথা-ভরা কথা—
কাহারে জানাব, দীনতায় মরি, শরমে মরমাহতা।
নাহি রূপ-রাশি, সুমধুর হাসি, শুধু আছে ভালবাসা!
শুধু সেইটুকু ভরিবে কি বুক, মিটিবে কি কারো আশা?
তাই সে রজনী-সখীর আঁধার-আঁচলে ঢাকিয়া মুখ
গোপনে নামায়ে বেদনার ভার, ভরি' লই মোর বুক।
ক্ষণিকের তরে চাঁদের আলোয় মোর বধুঁ প্রিয়তম—
ওরি পানে চাহি' জীবন লভিল প্রশান্তি অনুপম।
ওইটুকু মোর মধুরের ধ্যান, ওইটুকু সম্বল!
ওকি সখি, তুমি কাঁদিতেছ দুখে? নয়নে তোমার জল?

চকিতে মুছিনু নয়নের জল; মুখে ফুটিল না বাণী!
নতুন করিয়া শুনাইল ফুল আমারি যে এ-কাহিনী!
এই বুকে যত ছিল ভালবাসা, প্রাণে ছিল যত সাধ,
অর্পিয়া যারে নিঃস্ব ভুবনে—কোথা সে সুদূর চাঁদ?
নাহি রূপ-শোভা কোনো বৈভব, নহি সুন্দরী সাকী,
বুক ভরিয়াছে তাহারি ধেয়ানে, কি করি' আবরি' রাখি?
ও অতুল রূপ নিরমল হাসি স্বপন-সুষমা-মাখা
না চাহিয়া যত পাইয়াছি তারি স্মৃতি আছে বুকে আঁকা।
আজি সখি, তাই তোমার চাঁদের মধু-মধুরের ধ্যানে
আমারও নয়নে ঘনায় স্বপন, মন ভরে' ওঠে গানে।

চুমিয়া তাহারে নীরব রহিনু। কপোলে লুটায়ে রহি'
ঢালিছে গন্ধ রজনীগন্ধা! তাহারি গন্ধ বহি'
বাতাস ব্যাকুল অঙ্গে অঙ্গে মৃদুল পরশ দানি'
বহিয়া চলিল বন্ধুর মতো নয়নে নিঁদালি আনি'।

## কাজী মোতাহার হোসেন

### আসা-যাওয়া

মম মন-রঙ্গভূমে কত না রহস্য-মায়া,
এই আসে, এই যায়, ক্ষণ তরে স্থির নাহি রয় ;
যত চাই রাখি বেঁধে', ততই উতলা হ'য়ে আকাশে ছড়ায় ॥

এলে তুমি মোর প্রাণে। দেখিনু বিস্ময়ে চাহি'—
স্বপন-কল্পনা মায়া-মূর্ত্তি লভি' তোমাতে বিরাজে।
জনম সার্থক হ'ল অপূর্ব্ব এ পরিপূর্ণতায় ॥

মোরে ছাড়ি' চলি' গেলে। তবু যে মানসী-মূর্ত্তি
রেখে' গেলে চিত্ত জুড়ি,' ( সে যে গো আমারি সৃষ্টি ! )
আমারে প্লাবিত করি' ব্যাপ্ত হ'ল চরাচরময় ॥

---

## কাজী আকরম হোসেন

### শোণ নদীর বাঁধ

পাষাণ গাঁথিয়া বাঁধিয়াছে নদী, আছাড়ি' পড়িছে তায় ;
দুর্ব্বার স্রোত হুঙ্কার করি' উদ্দাম বেগে ধায়।
হেথা কুলুকুলু বাঁশরীতে সাধা নহে তটিনীর জল,
বজ্র গরজে চণ্ড আহবে মেতেছে সৈন্যদল।
নিশীথ শয়নে কেঁপে' উঠি শুনি' ক্রুদ্ধ ভীষণ নাদ,
এইবার বুঝি গুড়া হ'য়ে যায় পাহাড়ের মত বাঁধ।
সাগরে চলিছে তটিনীর জল, তাহাতে এতই বাধা ;
তাহার মাঝারে কাঁদে যেন কোন্ চির-বিরহিনী রাধা ॥

—নওরোজ

---

# সুফী মোতাহার হোসেন

## স্বপ্নাগতা

হিমাদ্রি-গিরির কন্যা, স্পর্শ যার তুষার-শীতল,
দেহ দুগ্ধফেনশুভ্র, হিমস্নাতা বিবসনা নারী ;
নয়নে ঠিকরে আলো, হাসিতে ঝলসে তরবারি,
কটিতে উরুতে বক্ষে গ্রীবাভঙ্গে নিটোল নির্ম্মল
নবীন যৌবন-লেখা, সাধনায় শান্ত অচঞ্চল,
আজন্ম তাপসী-সম দেহে মনে সুচির-কুমারী—
উদ্‌যাপে সে ব্রত কোন্ ? মনসিজ চতুর শিকারী
বাঁকাইয়া ফুল-ধনু নিত্য হেথা হয়েছে বিফল।

সেই নারী কৈলাশের গিরিপথ ত্যজি' সঙ্গোপনে
প্রথম পউষ-রাত্রে শিহরিয়া হিমেল্ হাওয়ায়
কাল সে আসিয়াছিল নিশীথের গাঢ় আবরণে।
সকুণ্ঠ পরশ তা'র লেগে' আছে চোখের পাতায়,
শিশিরের মালাগাছি ফেলি' গেছে আমারি অঙ্গনে,-
গোপন বেদনা তা'র ভাষা চাহে আমারি ভাষায় ॥

---

## মায়া-মৃগী

শ্রাবণ-বর্ষণ-স্নিগ্ধ ঘনশ্যাম তরু-বীথিকার
ঘন ঘোর ছায়া হতে দিগন্তের রেখা অনুসরি'
কোন্ এক মায়ামৃগী দিবানিশি ফিরিছে সঞ্চরি'
মেঘাচ্ছন্ন ধরাতলে—স্বপ্নসম গূঢ় চমৎকার।

যত তা'রে গাঢ় বর্ষা তীক্ষ্ণ শর হানে বারম্বার,
দ্রুত সে দুরন্ত মৃগী ছুটে চলে পক্ষ মুক্ত করি'—
চঞ্চল উল্লাস ভরে দিশে দিশে দিবস শর্ব্বরী
লঙ্ঘিয়া সাগর-গিরি অবহেলি' কানন-কান্তার।

সে মায়ামৃগীর কোন্ সকৌতুক কটাক্ষ-ঈক্ষণে
আমার মনের মৃগ মাতিয়াছে আজি বরষায়
অভিনব লীলারসে। কভু আলো কভু অন্ধকারে
কভু ঘন নীল মেঘে কভু স্নিগ্ধ গাঢ় বৃষ্টিধারে—
ছড়ায়ে কদম কভু লুণ্ঠি' বাস প্রলাপী কেয়ায়
সঘন রোমাঞ্চ-সুখে হিল্লোলিয়া ফিরে সে ভুবনে॥

---

## মঈনুদ্দীন

### রুবাইয়াৎ

মেহ্‌দী পাতার রঙ্ মেখে সই রাঙ্‌লে চরণ দু'টি,
বিশ্ব তোমার ঐ রাঙা পায় হয়ত পড়বে লুটি'।
ধার দিয়েছি মেহ্‌দী পাতায় কল্‌জে কাটি'—তাই
সোনার পায়ে সোনার মানুষ খাচ্ছে লুটোপুটি॥

ঈদের চাঁদে ভাঙি' সখি, গড়্‌লে তোমার নথ;
শিশির-ভেজা দুর্ব্বা-বনে রচ্‌লে কি সই পথ?
বন-হরিণীর চপল চোখে হান্‌লে কঠিন বাণ,
ভাব্‌ছ বুঝি এম্‌নি করেই পূর্‌বে মনোরথ?

---

## ফজলুর রহমান

### রিক্‌শওয়ালা

নিস্তব্ধ রজনী।
থেমে গেছে কল-কোলাহল
যন্ত্ররূঢ় নগরীর ক্লান্তি-অবসাদে।
পিচ-ঢালা রাজপথ ঘুমে অচেতন
বিরাট দৈত্যের মতো প্রসারিয়া কৃষ্ণ বক্ষস্থল ;
দিবসের দগ্ধ গ্লানি মুছে' গেছে ক্ষণকাল আগে
আষাঢ়ের ক্ষিপ্র বরিষণে ;
পাশে তা'র সারি সারি গ্যাসের আলোক
ম্লান করি' শুক্লতিথি সিক্ত জোছনায়
জ্বলিতেছে নিবু নিবু—
চিতা যেন
অর্দ্ধমৃত ধরণীর পাণ্ডুর শিয়রে।
নাট্যালয়গুলি হয়েছে নীরব।
হাসে সেথা মুখর কৌতুক
বিদ্রূপের হিম অন্ধকারে।
মাঝে মাঝে শোনা যায়
রক্তচক্ষু মোটরের বিকট চীৎকার ;
চমকিয়া ওঠে ধরা, মা'র বুকে শিশুটির মতো
স্বপ্ন-ভীতিকায় !
আধো-জাগা নীরবতা ভাঙি'
বাজে ঠুং ঠুং মৃদুগামী রিক্‌শ-ধ্বনি

ধরণীর মর্ম্মস্থল ছুঁয়ে' ;
কাঁদে যেন নির্ব্বাসিতা কোন্
সর্ব্বহারা ক্রন্দসীর বেদনার মতো।
তন্দ্রাতুর রাজপথ শিহরিয়া ওঠে,
গ্লানি-ক্ষুব্ধ দলিত বেদনা
কেঁপে' ওঠে মুহুর্মুহু পাষাণ-পঞ্জরে।
মন্থর-চরণ
নির্ব্বাক্ বাহক তা'র রিক্‌শখানি লয়ে'
শূন্যমনে চাহে চারিধার।
বহু জানা-মাঝে
খুঁজে সে যে অজানা জনেরে—
প্রিয় তা'র বাঞ্ছিত চালকে,
যার তরে শূন্যাসন লয়ে
ফিরে নিশিদিন,
প্রাণানন্দে যারে
নিয়ে যাবে বহে'।
শীর্ণ দু'টী জলধারা ঝরিতেছে লোল গণ্ডতলে—
দুটি ক্ষীণ স্রোতস্বিনী যেন
গতিহারা শুষ্কবারি তৃষ্ণাতুর মরুভূর 'পরে।

পুনঃ ওঠে বেজে'
ঠুং ঠুং মৃদুধ্বনি।
মনে হয় দূর ঝর্ণাতলে
যেন এক শুভ্র মেষ-শিশু
জল-কলকলে নাচিছে উল্লাসে

জ্যোস্নালোকে মুগ্ধ হয়ে ;
বেজে' ওঠে তার সাথে
গললগ্ন ঘুঙুরের মৃদু মিঠা ধ্বনি ;
দূরে বসে পাহাড়ের গায়ে
তুষার-বালিকা
যেন ডাকে তারে ঃ 'আয় ! আয় !' বলে'—
আরো নাচে স্নেহ-আহ্বানে
দোলে আরো গলার ঘুঙুর ।
ঠুং ঠুং মৃদুধ্বনি...
ফিরিয়া দাঁড়ায়
ধীরপদে রিক্‌শ'র বাহক
খুঁজে' কারে বাষ্পাকুল চোখে ॥

---

## আজহারুল ইস্‌লাম

### চৈত্র রজনী

চৈতী রাতের নীল গগনের গাঙে
তন্দ্রা-মগন পূর্ণিমা-চাঁদ চলে,
আলোর পরীরা চামর দোলায় তা'রে—
স্বপন ছড়ায় মুগ্ধ নয়ন-তলে ॥

* * * *

চৈতী রজনী বছরে বছরে আসে—
আসে না ক শুধু আমি যারে ভালবাসি ;
মিলন-পিপাসা থাকিয়া থাকিয়া মনে
তুলিছে তুফান সোনার স্বপন নাশি' ॥

---

# রেনজীর আহ্‌মদ

## সুবর্ণ মৃগের মায়া

সুবর্ণ মৃগের মায়া আর কত ভুলাবে তোমারে,
মাটির বনানী-বুকে কাঁদে মৃগ আঁখি-অভিরাম—
স্বর্গের দেবতা লাগি' বৃথা বন্ধু ভাসো অশ্রুধারে,
মর্ত্ত্যের মানব-শিশু হেথা আর্ত্ত ব্যর্থ-মনস্কাম।

ঊর্দ্ধের গগন-ছায়া মায়াময় যত নীলা হোক,
শুধু সে মায়াই বন্ধু,—কায়া নহে নীলিমা-সত্তার,
আঁখির বিভ্রমে জাগে শূন্যপথে রূপের আলোক
চিত্তের বিভ্রমে কত জাগে মায়া—কোথা অন্ত তা'র !

পুণ্যের পণ্যের আশে স্বর্গের দুয়ারে দাও হানা—
কেহ সে জানে না হেথা স্বর্গ আছে কোথা কোন্ ঠাই
শূন্যময় স্বপ্নলোকে মেলি' মুগ্ধ কল্পনার ডানা
তবুও ভাবিছ মনে স্বর্গ বুঝি পাই এই পাই !

বারম্বার আসে ফিরে বহি শুধু ব্যর্থতার দাহ,
কাম্যেরে পাওনি বলে' কামনার বহ্নি জ্বাল বুকে—
তৃষ্ণারে জাগালে বন্ধু, চিনিলে না অম্বুর প্রবাহ,
চিত্তের সত্যেরে ভুলি' মরিয়াছ দূর স্বপ্ন-সুখে।

মাটির মর্ত্ত্যের পানে একবার চাও ফিরে' চাও—
স্বপন-কামনা তব দেখো হেথা পাও খুঁজে' কি না,
সরিৎ-বনানী-ঘেরা ভুবনেরে ভুলি' কোথা যাও—
স্বরগ হেথাই আছে—শোন না কি নির্ঝরের বীণা ?

তাদের বেদনা-ব্যথা জীবনের যত হত আশা
হে বন্ধু, দেখো তো তুমি স্নেহ-করে পারোনি মুছাতে!
তুর্ব্বলেরে দাও বল, মূক-মখে দাও দেখি ভাষা,
সুবর্ণ মৃগেরে ছাড়ি' ফেরো পুনঃ বনমৃগ-সাথে।

---

# মোয়াহেদ বখ্‌ত্‌ চৌধুরী

## স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত

স্বপ্ন যদি সত্য হ'ত, আঁখি হ'ত স্বপন-মগন,
মিলন সে ক্ষণিকের শুধু, ভুলে-যাওয়া ভালবাসা,
অবহেলা, ফিরে পাওয়া, আজন্ম সে বৃথা অন্বেষণ,—
একটি স্বপন মাঝে সব তারা পে'ত যদি বাসা ;
মাতার করুণা-কণা দ্রবময়ী পীযুষের ধারা,
প্রিয়ার অধর-প্রান্তে মধুর সে স্নিগ্ধ হাসি-লেখা,
সন্তানের স্নেহ, সব স্বপনেতে হ'ত তবে হারা।
ফুরাইত নয়নের নেশা, বারে বারে ফিরে ফিরে দেখা
প্রয়োজন নাহি হ'ত। দেহ হ'ত আঁধারের কারা।
গোলাপ ফুটিয়া যদি ঝরে নাহি যেত, ফুল যদি
ফুটে র'ত স্বপনের প্রায়—ভ্রমর না হ'ত আত্মহারা।
প্রেম শুধু প্রলাপ হইত, প্রাণ না চাহিত নিরবধি।
শুষ্ক ধরণীর 'পরে ফুটিত না ফুল, নাহি হ'ত বারি বরিষণ ;
দিবানিশি নাহি হ'ত, জীবন সে হ'ত তুঃস্বপন ॥

---

# আজিজুর রহমান

## সহরের সন্ধ্যা

মহানগরীর ইট-কাঠ যায় কুয়াশা-কাফনে ছেয়ে'—
প্রেতিনীর মতো আসে বিশীর্ণা রাত্,
সন্ধ্যা ঘনায় ইলেক্ট্রিকের জোনাকী-পোকার সারি
ঝিক্‌মিক্ ক'রে উঠিল অকস্মাৎ।

গলিতে গলিতে চলিছে হল্লা, ব্যস্ততা কোলাহল,
চুণ-সুরকীতে জীবনের মুখরতা,
দিবসে যেখানে যায় না কো দেখা আলো
সেখানে বিজলী-আলোর উচ্ছলতা।

"আদম-সোয়ারী" শুনি রিক্‌শার ঠুং ঠুং ক্রমাগত—
শুনি ঠুং ঠাং ব্যথিত আর্ত্তনাদ ;
দেব ও দেবীর বাহন ক্রুহাম পথ ভুল ক'রে আসে—
রবার-টায়ারে চাবুকের অবসাদ।

আকাশ এখানে পর্দ্দানশীনা, বাতাস এখানে ভীতু,
ধরা-বাঁধা হেথা নিয়মিত প্রত্যহ ;
মুমূর্ষু ধরা উর্ম্মি-আঘাতে নগরীর উপকূলে,
বিপুল তৃষায় ঢেউ গোণে অহরহ।

শীতের সন্ধ্যা নর্দ্দমা-ধোয়া ভাপ্‌সা ঠাণ্ডা বায়
মন চাহে এক সুনিবিড় অবকাশ,
হাতুড়ী শাবল কোদালের আর কয়লা-ঝুড়ির চাপে
শ্রান্ত সহর করে যেন হাসফাঁস।

নেমে' এসো রাত, তুমি কী এনেছ দিবসের বিস্মৃতি—
এতটুকু গাঁজা এতটুকু ধেনো মদ!
জীবনের ফাঁক ঢেকে' দিতে চাই ছাতু আর চানাচুরে—
আগামী দিনের ওই হবে সম্পদ॥

---

## রিয়াজউদ্দিন চৌধুরী

### অমাবস্যা

শ্মশানের ভস্ম কেবা ছড়াইল নভে?
তমিস্রা-কুণ্ডলী তা'র স্ফুরিছে নাসায়।
সুচির শর্ব্বরী কাঁদে আলোর আশায়,
পেচক ডাকিয়া মরে আর্ত্ত কলরবে,
উগ্র তপে কে ভৈরবী মাগিছে ভৈরবে!
মৃত শব ধরি' কাঁপে ধরা ভয়াতুর।
গ্রহ চন্দ্র ঢাকে মুখ, যেন প্রেতপুর!
শ্বাস রোধি' বহে বায়ু মৃত্যুর আহবে।

অথবা সে আদি-ব্যথা: মৌন অন্ধকার,
বুকের মাঝারে দেবী রাখিয়া গোপন
জন্মান্ধ দয়িত লাগি' আলোক-সম্ভার
দেখিলে না পট্টবাসে বাঁধিয়া নয়ন।
বিষাদিনী প্রিয়া মোর নির্ব্বাক্ ক্রন্দসী—
কংশ-কারাকক্ষে তব জন্মে নব-শশী॥

---

# ইমাউল হক

## রাত ও প্রিয়া

কালো থম্‌থমে রাতের ভাষা কি শুনিতে পাও ?
অর্থ বুঝ কি তাহার নীরব ক্রন্দনের ?
দ্বার হ'তে তা'রে প্রতিদিন বুঝি ফিরায়ে দাও,—
বেদনা তাহার ভুলেও কখন পাও না টের ?

অভাগিনী রাত চুপ হয়ে' আছে মনের দুখে—
মলিন আনন সিক্ত অশ্রু-শিশির-জলে,
চাঁদের বিরহ লেগেছে ভীষণ তাহার বুকে,
পারে না সে হায় লুকাইতে তাহা মিথ্যা ছলে !

এলায়িত তা'র কুন্তলে হলো আঁধার ধরা,
দীর্ঘ নিশীথে দুলিয়া উঠিছে বকুল-বীথি ;
হিয়ার আকুল মিনতিতে নীল আকাশ ভরা—
কামনা তাহার তারা হয়ে সেথা ফুটিছে নিতি।

পরাণ আমার কাঁপিয়া উঠে সে অজানা ডরে,
গোপনে সেথায় ভীড় করে' আসে ভাবনা শত।
কে বলিবে বলো আমি-হীন এই একেলা ঘরে
তোমার দশাও হবে না একদা ইহারি মত !

বিবাগী রজনী অতিথি হয়েছে মোদের দ্বারে—
গানের অর্ঘ্যে লও তুমি তা'রে বরণ করি'।
সে-গানে জাগিয়া উঠুক করুণ কাহিনী, হাঁ রে !
সে-গানে বাজিয়া উঠুক বিরহ ভুবন ভরি' ॥

---

# আহসান হাবীব

## আজিকের কাব্য

ঘমন্ত অশ্বের বুকে আবার চাবুক হানো বীর,
দিনের সৈনিক পুনঃ ঊর্দ্ধ পানে তুলে' ধর তীর।
[illegible] স্বাপ্নিক রাতে অকস্মাৎ এসেছে লিখন—
বৈশাখ বহ্নির আবাহন।

নির্লজ্জ মাটির বুকে জাগে কোথা বণিক-পিপাসা,
কোথায় রক্তের রঙে স্বাক্ষরিত পাশবিক আশা—
অশ্ব-হ্রেষা সেথায় তোমার
আনুক উলঙ্গ ত্রাস, ক্রুর বক্ষে ক্ষুর-তরবার !

মৃত তৃষ্ণা জয়ী কোথা, বিজয়ীর বজ্রমুষ্টিতলে ;
অশান্ত আগুন-সম কোথায় জঠর-জ্বালা জ্বলে ?
বলদৃপ্ত হস্তে সেথা ঝলসিত হউক বল্লম—
বিদ্ধ হোক অহঙ্কার, চূর্ণ হোক হীন অতিক্রম !

বন্ধ্যা মৃত্তিকার বুকে তোমার নির্ম্মম কশাঘাতে,
জাগুক যৌবন-সেনা দুরন্ত আশাতে।
ধাতব পৃথ্বীর তলে কে অথর্ব্ব, প্রাণহীন শব,—
ওষ্ঠে তা'র তুলে' ধর নবজন্ম-মদির আসব !

অমৃত সিঞ্চন করো নিষ্প্রাণ মমীর বুক ভরি',
বাহিরে আসুক তা'রা অপ্রশস্ত প্রাচীর উত্তরি'।
চকিত মূষিক-সম অন্ধকারে যারা পলাতক,
তাদেরে দানুক আলো তব নগ্ন বর্শার ফলক।

আহসান হাবীব

কোথায় ক্লীবের দল নির্বিরোধ স্বপ্ন-রচনায়
লভিতেছে আত্মঘাত—দৃষ্টিকুণ্ঠ নয়ন-সীমায়,
কালপ্রেক্ষা অলিখিত। সেথায় কালের পরিচয়
আসুক তোমার দৃপ্ত হয় !

স্বর্ণপাত্রে লাল সুরা, অর্দ্ধনগ্ন নারীর নয়ন—
মানুষের মুক্তি যেথা আজিও যাপিছে নির্ব্বাসন,
হে বিজয়ী দুর্ব্বিনীত, স্পর্দ্ধিত শাবল সেথা তব
আসুক চেতনা অভিনব।

আবার চাবুক হানো, অশ্ব তব হউক চঞ্চল,
মৃত্যুর সীমান্ত ছাড়ি', হে দুর্জ্জয়, চল অবিরল।
অখ্যাত দ্বীপের দেশে দিকে দিকে পাঠাও এবার,
রাত্রির স্তিমিত বুকে দিনের নির্ম্মম অঙ্গীকার।

---

## হে বাঁশরী অসি হও

হে বাঁশরী, অসি হও তুমি !
কেননা স্বর্গের দ্বারে হানা দিল হায়নার নয়ন ;
কেননা উদ্যত আজ শাণিত নখর বহু
শিবিরের উলঙ্গ আকাশে—
অতএব হে বাঁশরী, অসি হও তুমি ;
অসি হও, এ-মোর প্রার্থনা !

মুমূর্ষু মাটির বুকে ভেঙেছে রাতের বহু নীড়,
লেলিহ তির্য্যক্ ফণা ছুঁয়েছে সহজ দিনগুলি ;
শীতল চোখের পাশে কালো ডানা ছায়া ফেলিয়াছে ;
অতএব হে বাঁশরী, অসি হও, অসি হও তুমি !

সুরের পেলব কুঁড়ি পেছনে উড়াও ;
এবার দিনের চূড়া আকাশে ঘুরাও ।
অরণ্য-স্বপন নয় এবার আরণ্য প্রতিরোধ ,
নির্ব্বিরোধ গুহাতলে অহিংসার গৌরব নিঃশেষ
[illegible]কাল—
এবার সূর্য্যের মুখোমুখি
স্বাক্ষরিত হোক তব সৈনাপত্য অঙ্গীকার-লিপি !

এবার প্রান্তর আর ধূলিম্লান পথ ডাকিতেছে,
এবার নীরব থাক বাতায়নে বলয়-বন্ধন ;
এবার বন্যার মতো আঁখিজল আনুক বিদ্রোহ ।
আসন্ন মৃত্যুর মুখে অগ্নিময় ঝলসি' উঠুক
বাঁচিবার পণ !

হে বাঁশরী, অসি হও তুমি !
কেননা গৃহের দ্বারে অহিংস বৌদ্ধের তরবারি
মৃত্তিকার পিপাসায় জ্বলে ।
( যদিও হাওয়ার দূত বহে আজো প্রীতি ও প্রত্যয়—
করোনা প্রত্যয় ;
পদ্মের ছলনা-তলে জেগে' আছে কেউটের কুণ্ডল !)
অতএব হে বাঁশরী, অসি হও তুমি !
অসি হও, এ মোর প্রার্থনা ॥

---

## শেখ মোহাম্মদ ইদরিস আলী

### আদর্শ বাঙ্গালী

মুক্তি লাভের যুক্তি করি, গাহ্মড় উড়াই কথার তেজে ;
কাজের সাথে নাই-ক দেখা, ভাঙ্গি তবু বিল্ নেতা সেজে ।
আমরা নব্য বঙ্গবাসী, শিক্ষাপথের অগ্রগামী ;
বি-এ এম্-এ পাশ্ যা করি, হয়ে কেবল দাস্যকামী ;
নারী-জাতির মান বুঝেছি, ধ্যান করেছি রাঙা চরণ ;
গোবর্দ্ধনের ধার ধারি না, শুধুই মানি বস্ত্রহরণ

—মর্ম্মবীণা।

---

## আবদুর রাজ্জাক

### আত্মকেন্দ্রিক

ঝড়ের দাপটে উড়ে' গেল কা'র চালের ক'খানা টিন,
ক'টা তরু হ'ল পতিত ধরণীতলে,
কা'র লেখনী সে-হিসাব কষিয়া চলে ?
কা'র হিয়াতলে গুমরিয়া ওঠে সমবেদনার বীণ ?

সুখের দুলাল মজলিস করে, সমুখে চা'য়ের বাটি ;
এলোমেলো শত কথার লহরী ওঠে ;
ওষ্ঠে ওষ্ঠে হাসির হর্‌রা ছোটে,—
জীবনে যা'দের চরণে লাগেনি পৃথিবীর ধুলো-মাটি !

এ'দের লাগিয়া জড়ো হয়ে আছে দারুণ ঝঞ্ঝাবাত—
নামিবে সহসা অমার স্বপন ল'য়ে ;
দশদিশে এরা নেহারিবে ভয়ে ভয়ে,
প্রলয়-আঁধার বহিয়া নামিছে মরণের কালো রাত !

—পথ-সন্ধানী

## ফররুখ আহমদ

### শিকার

বিদ্যুৎ-বন্যার ঝুঁকি বুকে নিয়ে' হাঙরের মত
মেঘেরা চলেছে ডুবে' আকাশের গহীন নদীতে
নিঃশব্দ সঞ্চারে, জ্বেলে' অগ্নিগর্ভ পাহাড়ের মত
বিপুল প্রত্যঙ্গ, আর অবরুদ্ধ কোটি ধমনীতে
জাগে এক চাপা ঝড় ঘনীভূত বাষ্পের ধোঁয়ায়।
তীরবেগে ছুটে' চলে দুর্নিবার সে-আগুন বুকে।
অতর্কিত আক্রমণে অকস্মাৎ দূরে শোনা যায়
অরণ্যের আর্ত্তভীতি হাঙরের লেলিহান মুখে।

সারা বন তোলপাড় করে সেই ভয়াল হাঙর,
বিদ্যুতের হিংস্র দাঁতে ছিঁড়ে' ফেলে অরণ্যের টুটি;
সবুজ বনানী স্বপ্নে তুলি' নগ্ন শাখার ভ্রূকুটি
তন্বী তমালীর দেশে টেনে' আনে কঙ্কালের ঘর।
জেগে' ওঠে সে-মুহূর্ত্তে শিরদাঁড়া-ভাঙা হাহাকার;
এ বনে শিকার-শেষে অন্য বনে খোঁজে সে শিকার।

---

### হে নিশানবাহী

নিশান কি ঝড়ে পড়ে' গেছে আজ মাটির 'পরে?
আধো চাঁদ-আঁকা সেই শাশ্বত জয়-নিশান?
বহু মৃত্যুর প্রলয়-আঘাতে, প্রবল ঝড়ে
নুয়ে' গেছে সেই প্রথম দিনের জয়-নিশান?

ফররুখ আহ্‌মদ

হামাগুড়ি দিয়ে কা'রা চলে ঐ পতাকী দল ?
কা'র ক্রন্দনে ভরেছে শূন্য জলস্থল ?
নিশান কি আজ পড়ে গেছে ভুঁয়ে,
নিশানবাহী কি চলে মাটী ছুঁয়ে,
শিয়রে কি তা'র কঠিন বাধার জগদ্দল,
বুক-চাপা-দেওয়া ঘন মিথ্যার জগদ্দল ?
হে নিশানবাহী ! আজো সম্মুখে রাত্রের সীমা
দৃষ্টি রোধে কি তিমিরাচলের ঘন ম্লানিমা ?
আজো সম্মুখে বন্ধুর পথ বালিয়াড়ির,
সঙ্গীবিহীন জনতা-মুখর সাগর-তীর ?

ঐ দেখো স্রোতে অরূপ আলোতে সূর্য্যতরী
তীক্ষ্ণ আলোর তুফানে ছিঁড়েছে এ-শর্ব্বরী,
এই কালো রাত জমাট-তুহিন্ হিম-অতল,
ছিঁড়ে' চলে' যায় আলোর ছোঁয়ায় গলানো জল।
পাওনি এখনো আলোর পরশ নবজীবন ?
মৃত শব হ'তে হয়নি কি আজো উজ্জীবন ;
এখনো সূর্য্য ভাঙেনি কি ঐ রাতের সীমা,
এখনো তোমার পথ ছেয়ে' আছে ঘন ম্লানিমা ?
হে নিশানবাহী ! তাই আছ নুয়ে' ?
তাই কি পতাকা আছে মাটি ছুঁয়ে, ?
তবু এই চলা জানি উদয়ের পূর্ব্বাভাষ,
কালো কুয়াশার পর্দ্দায় ঢাকা
তোমার সূর্য্য, আলো, আকাশ।
পায়ের তলায় প্রবল অশ্বখুরে
মরু-বালুকার স্ফুলিঙ্গ উঠে নিমিষে মিলায় দূরে।

ওড়ে বাতাসের শিখরে শিখরে মক্তি-লাল,
শ্বেত পতাকায় শান্তি-চিহ্ন—আল্‌হেলাল !
সেই উদ্দাম রণতুরঙ্গ মানে না বাধা,
পলকে পলকে জ্বলে তা'র খুরে অগ্নিশিখা।
আলোর প্লাবনে কে নিশানবাহী অগ্রগামী,
ঝড়ের দাপটে ভাঙে শতকের কুজ্ঝটিকা ?
আমাকে জাগাও তোমার পথের ধারে,
আমাকে জাগাও এ বিজন কান্তারে ;
আমাকে জাগাও যেখানে সেনানী ! মানে না বাঁধন নবী;
আমাকে জাগাও যেখানে দীপ্ত সে মদীনাতুন্নবী,
বিশ্ব-করুণা, মুক্তি-পদ্ম—বেদনা-লাল
বহিছে চিত্ত-সুরভিত-শ্বেত আল্‌হেলাল ॥ * * *

—সাত সাগরের মাঝি

---

## সাত সাগরের মাঝি

কত যে আঁধার পর্দা পারায়ে ভোর হ'ল জানি না তা'
নারাঙ্গী বনে কাঁপছে সবুজ পাতা।
দুয়ারে তোমার সাত সাগরের জোয়ার এনেছে ফেনা ;
তবু জাগ্‌লে না ? তবু তুমি জাগ্‌লে না ?

সাত সাগরের মাঝি চেয়ে' দেখো, দুয়ারে ডাকে জাহাজ
অচল ছবি সে ; তস্‌বির যেন দাঁড়ায়ে রয়েছে আজ।
হালে পানি নাই, পাল তা'র ওড়ে না কো,
হে নাবিক, তুমি মিনতি আমার রাখো !
তুমি উঠে এসো, তুমি উঠে এসো মাঝি-মাল্লার দলে,
দেখবে তোমার কিস্তী আবার ভেসেছে সাগর-জলে,—

নীল দরিয়ার যেন সে পূর্ণ চাঁদ,
মেঘ-তরঙ্গ কেটে' কেটে' চলে, ভেঙে' চলে সব বাঁধ।
তবে তুমি জাগো, কখন সকালে ঝরেছে হাস্‌নাহেনা,
এখনো তোমার ঘুম ভাঙলো না ? তবু তুমি জাগ্‌লে না ?

দুয়ারে সাপের গর্জ্জন শোনো না কি ?
কত অসংখ্য ক্ষুধিতের সেথা ভিড়,
হে মাঝি ! তোমার বেসাতি ছড়াও শোনো—
নইলে যে সব ভেঙে' হবে চৌচির !

তুমি দেখছো না, এরা চলে কোন্ আলেয়ার পিছে পিছে ?
চলে ক্রমাগত পথ ছেড়ে' আরো নীচে।
হে মাঝি ! তোমার তারকা নেভেনি, একথা জানো তো তুমি,
তোমার চাঁদনী-রাতের স্বপ্ন দেখছে এ মরুভূমি।
দেখো, জমা হ'ল লালা-রায়হান তোমার দিগন্তরে ;
তবু কেন তুমি ভয় পাও, কেন কাঁপো অজ্ঞাত ডরে ?
তুমি কি ভুলেছ লবঙ্গ-ফুল, এলাচের মৌসুমী,
যেখানে ধূলিতে কাঁকরে দিনের জাফ্‌রাণ খোলে কলি,
যেখানে মুগ্ধ ইয়াসমিনের শুভ্র ললাট চুমি'
পরীর দেশের স্বপ্ন-সহেলি জাগে গুলে-বকাওলী।
ভুলেছ কি সেই প্রথম সফর,—জাহাজ চলেছে ভেসে'
অজানা ফুলের দেশে ;
ভুলেছ কি সেই জম্‌রেদ-তোলা স্বপ্ন সবার চোখে
ঝলসে চন্দ্রালোকে ?
পাল তুলে' কোথা জাহাজ চলেছে কেটে' কেটে' লোনা পানি
অশ্রান্ত সন্ধানী,—

দিগন্ত নীল-পর্দা ফেলে সে ছিঁড়ে'—
সাত সাগরের ফেনা-মাখানি চিরে' চিরে'।

কে জানে কখন কেটেছে তোমার স্বপ্নমুগ্ধ রাত,
আজ্‌কে কঠিন ঝড়ের বাতাস দ্বারে করে কশাঘাত।
সর্প-চিক্কণ জিহ্বায় তা'র মৃত্যুর ইঙ্গিত ;
প্রবল পুচ্ছ-আঘাতে তোমার রঙীন মিনার ভাঙে।
হে মাঝি ! তবুও থেমো না দেখে' এ মৃত্যুর ইঙ্গিত,
তবুও জাহাজ ভাসাতে হ'বে এ শতকের মরা গাঙে।

এখানে এখন রাত্রি এসেছে নেমে',
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ।
এখানে এখন প্রবল ক্ষুধায় মানুষ উঠেছে কেঁপে'—
এখানে এখন অজস্র-ধারা উঠ্‌ছে দু'চোখ ছেপে' ;
তবু দেখা যায় দূরে বহু দূরে হেরার রাজতোরণ···

শাহী-দরজার সকল কপাট অনেক আগেই খোলা,
অনেক আগেই সেখানে দ্বাদশী জোছনা দিয়েছে দোলা,
তা' হ'লে কোরো না দেরী,
এবার তা' হ'লে বাজাও তোমার যাত্রার জয়ভেরী ;
আসুক যাত্রী পথিক। হে মাঝি, এবার কোরো না দেরী

সে-পথে যদিও পার হতে হ'বে মরু,
সে-পথে যদিও দরিয়ার নোনা পানি,
তবুও সে-পথে আছে মঞ্জিল, জানি, আছে ছায়াতরু,
পথে আছে মিঠে পানি।
তবে পাল খোলো, তবে নোঙ্গর তোলো
এবার অনেক পথশেষে, সন্ধানী !

হেরার তোরণ মিলবে সমুখে, জানি।
তবে নোঙ্গর তোলো
তবে তুমি পাল খোলো
তবে তুমি পাল খোলো ॥

---

## শামসুল হুদা

### 'হে ভারত'—

'হে ভারত' একদিন 'নৃপতিরে শিখাইলে তুমি
ত্যজিতে মুকুট দণ্ড', পাটরাণী, সিংহাসন, ভূমি,
ধরিতে দরিদ্র-বেশ, খুঁজিবারে নির্ম্মোহ নির্ব্বাণ,—
মানস-যক্ষ্মায় দেশ সে-অবধি ক্ষীণ-তনু-প্রাণ।
সেদিন ভোগেরে বাঁধি' অতিশয় সংযমের ডোরে
বঞ্চনা করেছ তুমি গৃহীজনে আপনার ঘরে ;
অনাহূত আত্মবলি বিশ্বপ্রেম শিখালে কর্ম্মীরে—
রণে পৃষ্ঠভঙ্গ দিয়ে সম্ভাষিলে অরি অতিথিরে।

সেই শিক্ষা আজ নহে। তব পদে এই ভিক্ষা মাগি :
আজিকার জনগণে করিয়ো না সংসার-বিরাগী,
বিষয়-বিমুখ। আত্মপ্রেমে, আত্মজ্ঞান-মহিমায়
বুঝিয়া লইতে দাও বর্জ্জিত ঐশ্বর্য্যে পুনরায় !
মিথ্যা ত্যাগ-আস্ফালন, নিঃসম্বল পরার্থ ধেয়ান,—
সত্য সে সঞ্চয়-সুখ, ভোগ-পুষ্ট সবল পরাণ ॥

---

# শওকত ওস্‌মান

## দিনের কবিতা

### খামারের দিন

ফাল্গুনের শেষে আজ চাষীদের কর্ম্ম-কোলাহল ; খড়ের উপরে
শুয়ে' শুয়ে' খামারের একধারে, জীবনের দিকে দিগন্তরে
কি কথা লিখিতে চাই, দিশা নাহি মেলে।
অন্ধকার রাত্রিশেষে শুকতারা-সম শুভ দীপ জ্বেলে'
আজ আর পৃথিবীকে দেখিবার কোনো সাধ নাই ॥

ধান-সারা শেষ হয়, বাতাসে ধানের কণা উড়িয়া বেড়ায় ;
কালো চুল ওড়ে তা'র কুলো-দোলা বাতাসের ঘন যাতায়াতে।
চুলের অরণ্যে স্বপ্ন দেখি, অন্ধকার তারা-ক্ষত রাতে
যে-স্বপ্ন মিলায়ে গেছে বিষন্ন বনের সন্নিকটে,
আজ যার চিহ্ন নেই,—খড় কুটো নেই কিছু তটে ॥

### বৃষ্টির দিন

আজকে প্রভাত হ'তে ঝরকে ঝরকে ঝরে বৃষ্টিধারা।
তর্জ্জনী ইঙ্গিত মাত্র খুলেছে কাহারা পশ্চিমের ধূসর দুয়ার।
পঞ্চাশৎ অশ্বদল ফেন-লেপা ক্লান্তি-ক্লিন্ন মুখে
নেপচুনের রথ টানে
বালুবেলা 'পরে বেগে সকৌতুকে,
সিন্ধুর দু'বাহু ব্যেপে' এলো যে জোয়ার ;
ফেন-দুর্গ সঞ্চরণে মত্ত হাহাকার।
বিরক্ত অরণ্যে মোর দক্ষিণায় সুললিত সাড়া
বহিয়া এনেছ আজ ঝরকে ঝরকে ঝরা নীল বৃষ্টিধারা ॥

অশ্রান্ত-বর্ষণ আকাশের নীচে কাঁপে বিষন্ন নগরী—
ধুসর পাণ্ডুর ক্লিষ্টমুখ সন্ধ্যা আজ নামে।
ট্রাফিকের আর্ত্তনাদ নেই। হাটে ধীর-পদ পুলিশ প্রহরী
নেই আজ মোটরের হাঁক দক্ষিণে ও বামে;
রাজপথে নেই আজ প্রাণভীতি প্রতি পদক্ষেপে।
সমগ্র এ নগরীর বৃষ্টিসিক্ত নীলাকাশ ব্যেপে'
আজ আর নেই-ক তারা-রা।
আজ শুধু ঝরকে ঝরকে জানালায় ঝরে বৃষ্টিধারা।

শার্সিরুদ্ধ মোর অন্ধকার ঘরে
শুনি আজ
বৃষ্টিধ্বনি-মুখর ট্রামের ঘণ্টার নিনাদ।
গ্যাস জ্বলে' জ্বলে' ওঠে। গলির অপর প্রান্তে
দৃষ্টি থেমে যায়। নগরীতে ক্লান্তি অবসাদ।
অরণ্য-মর্ম্মর শুনি, অরণ্যের স্বপ্নে যায় দিন,
বিচিত্রার স্পর্শে দিশাহারা।
গীর্জ্জার ক্রেস্ট্ ছুঁয়ে' ছুঁয়ে' সারা রাত্রি ঝরে বৃষ্টিধারা॥

---

## এ এফ্ এম্ আবদুল হক

### মিলন-কাঁদন

হাফিজ হইতে

বসিয়া ভ্রমর এক ফুল্ল কুসুম-দলে
করছিল ক্রন্দন ভাসিয়া চোখের জলে।
শুধালেম: 'কেন কাঁদ সুখের মিলন-কালে?'
বলিল: 'প্রিয়ার রূপ ভাসায় নয়ন-জলে॥'

---

## মতিউল ইস্‌লাম

### জোয়ার

বিদগ্ধ বিশ্লথ কোনো দুর্ব্বল রাত্রির অন্ধকারে
বাদুরের পক্ষধ্বনি কদর্য্য কলুষ ক্লিন্নতারে
যেখানে খণ্ডিত করে, অসমর্থ গৃহতরু শাখা
বাড়িতে পারে না বলে' কেবল গুটিয়ে চলে পাখা
শীতের দিনের মতো, সেথা কোন্ দুর্দ্দান্ত সারথি
এ জঘন্য হীনতায় দানিবে চরম অব্যাহতি ;
কোন্ পক্ষবান্ অশ্ব, ক্ষুরধার কোন্ চূর্ণ চাঁদ
গাহিবে এ ধূলিস্তূপে ফেনোচ্ছল মুক্তির সংবাদ।

জোয়ার এসেছে দৃঢ় জনতার বিশীর্ণ জঠরে,
এল ভাঙনের পালা রক্তাক্ত দৈত্যের কলেবরে।
ইঁদুরের সরু গর্ত্তে কখন ঢুকিয়া গেছে সাপ,—
উঁচুরা গড়ায় নীচে, নীচুদের অখণ্ড প্রতাপ।
বিভ্রান্ত বণিকী-সূর্য্য, 'বোমা', 'শেল্' উজ্জ্বল অম্লান,
অবজ্ঞাত জীর্ণ নীড়ে প্রাসাদের স্বপ্ন সুমহান্॥

---

## শামসুদ্দীন

এখানে আলোক নেই, শব ও শিবায় দ্বন্দ্ব ঘুমন্ত শহরে ;
চাঁদও ওঠেনা হেথা, সূর্য্য আজ অন্ধকারে লীন।
শঙ্কায় কাটিছে কাল। ইতিহাস লিখিছে সঙীন্
হাজারো যুগের পাতে জীবনের জয় মিথ্যাহীন
কালের বুকেতে শুধু অশ্রুঘন জ্বলন্ত অক্ষরে।

—কবিতা : ১৩৫০

---

## আবুল হোসেন

### ঘোড়সওয়ার

তারপর জান্‌লা দিয়ে দেখি ঃ একদল ঘোড়সওয়ার
ছুটে' গেলো পথ দিয়ে উল্কার মতো
বন্দুক হাতে সঙ্গিন উঁচিয়ে।
গাড়ীতে বোঝাই কামান গোলাগুলি বন্দুক,
ট্যাঙ্কগুলো ছুটেছে সম্মুখে,
মাথার উপর বোমারু বিমান।
আর তারও উর্দ্ধে মেঘাবৃত ক্ষীণ চাঁদ
ডাফ্‌রীনে মুমূর্ষু যে-কোন যে-কোন পাণ্ডুর প্রসূতির মতো

ওরা কী দেখেছে কেউ কখনো সেই স্তিমিত নীল আলো—
গর্ভের নিবিড় অন্ধকার কেটে যা বেরিয়ে আসে
অসহ্য ব্যথায় ; এই সব ঘোড়সওয়ারেরা ?

মনের দূরবীণ পেতে চেয়ে' দেখি ঃ ওরা চলেছে
বৈশাখ সূর্য্যের খররৌদ্রে লাল চষা জমির উপর দিয়ে,
পাথরের মতো শক্ত ছুঁচলো ঢেলা মাড়িয়ে,
খরস্রোতা পাহাড়িয়া নদী সাঁতার কেটে চলেছে ওরা—
ভিজেছে খাকী পোষাক,
পাহাড়িয়া শীত সাপের মতো ঢুকেছে ওদের শরীরে—
ওদের দেহের প্রতি অনুপরমাণুতে
ঢুকেছে ধারালো ছুরির মতো উলঙ্গ তীক্ষ্ণ শীত।

ওরা চলেছে কখনও মরুভূমির মধ্য দিয়ে
সীমাহীন নাম-না-জানা অদেখা বালুর উপর দিয়ে
আগুন-তাতা বালুর উপর দিয়ে।
কাছে কোথাও একটা গাছ নেই
খেজুর তাল আঙ্গুর গুল্মলতা—
এতটুকু জল নাই আশেপাশে—
নেই নেই নেই।

কেন তবে চলেছে ওরা এমন ক'রে ?
কিসের আশায় ? কোন্ প্রত্যাশায় ? কী, কী সেই বাঞ্ছিত ফল ?
ঘোড়সওয়ারেরা জানে না জবাব দিতে।

ওদের কামানগুলো যদি পারত
উড়িয়ে নিতে সব বালুকণা—
মরুভূমির অসংখ্য অগণ্য বালুরাশি ;
ওদের বোমাগুলি যদি পারতো মরুভূমির মাটি ফাটিয়ে
জলের উৎসধারা বের করতে ;
ওদের ট্যাঙ্কগুলো যদি চষে' ফেলতো সমস্ত মরুভূমি,
বেয়োনেটের আগায় মাটি খুঁড়ে' বুনতে পারতো ধান—
সবুজ কচি ধানের বীজ !
যদি পারত পারত পারত

—*— —

## তথাপিও

শুনেছি তোমার কথা সব ঃ
জানি জানি আমাদের দিনগুলি ক্ষীণায়ু স্থবির,
বাজে কাগজের ম্লান রাত
কুটি কুটি ছিঁড়ে যদি ফেলে দিতে চাও দিতে পারো,

## আবুল হোসেন

( আমি তুলিব না হাত )

সহস্র বসন্ত শেষে যদি তুমি দেখে থাকো আজ
সময় বিনিদ্র আঁখি কাটায় প্রহর
বসন্তের বীজাণু আচ্ছন্ন—
তবু আমি করিব না চুপ,
তবু আমি মানিব না কভু পরাজয়।

ফুলে ও মালায় মোরা জীবনেরে দিইনি গৌরব,
গাহি নাই জয়স্তুতি গান ;
নহি ত মরণ-জয়ী কেহ ;
তবু কেন আজি এই মৃত্যুর উল্লাস ?
কাপুরুষ, কাপুরুষ যত !

আমাদের ক্লেদাক্ত জীবন,
ঘূণ উই মূষিকের আবির্ভাবে ভয়ে জড়-সড়
সচকিত সঙ্কুচিত,
বারবার খুঁজিয়াছে নির্ভীক মার্জ্জার ;
স্বপ্ন সে দেখেছে প্রতিদিন
কালের পর্দ্দায় ঢাকা অমর আত্মার।
সহস্র ভাটার শেষে আসিবে জোয়ার সুনিশ্চিত,
প্রবল বন্যায়
ভেসে যাবে ইমারত, পাষাণ প্রাসাদ,
ভেঙে চুরে গুড়ো হ'য়ে পড়িবে কঙ্কাল
পথের ধূলায়
আগামী জেঙ্গীস নয় নাদিরের বজ্র-অভিযানে।

আমাদের শক হুন ইরাণী তাতারী উষ্ণ-রক্তে
লাগিয়াছে সুমেরু তুহিন ;
ঘুমায়ে সমুদ্র-গর্ভে কত না জাহাজ—
আর কত বাধা আছে বালুর চড়ায় ।
ঘুম, ঘুম, ঘুম—
ঘুমায়েছে ব্যাবিলন, পিরামিডগুলি,
প্রাচীন মিশর,
সহস্র মোহেঞ্জোদাড়ো,
সুলেমান, রিচার্ড, ক্রুসেড,
জেরুজালেম ।
ঘুম ঘুম ঘুম !
তবু তো আজিও স্বপ্ন দেখি,
তবু তো হৃদয় করে আজো টন্‌টন্‌
তবু তো শোণিতে জাগে অনিরুদ্ধ দুর্ব্বার প্লাবন ;
তবুও তবুও

---

# আবদুস্ সালাম

## বেদনার ঝড়

আজি বেদনার উঠিয়াছে ঝড় অন্তর-পারাবারে,
সুর-হাহাকার বাজিতেছে মোর ভগ্ন-বীণার তারে ।
আঁধার আকাশে কোথা মোর তারা কাঁদিছে কুয়াশা-মেঘে,
প্রাণে ঝরে তা'র অশ্রু-শিশির, বিজলী উঠিছে জেগে' ।
একক যাত্রী, দিশেহারা তরী, নাহি যায় পথ দেখা ;
তিমির গ্রাসিছে আলোর ভুবন, এ মোর ললাটে লেখা ॥

—আঁচড়

## ওহীদুল আলম

### বাদল-স্বপন

বিবাগী বৈশাখী !
আজিকে হেরিনু তব বিচঞ্চল আঁখি
ভয়াল মেঘের গায়ে বিক্ষুব্ধ উদাস।
যোগনিদ্রা ভাঙিয়াছে আজি তব শ্বাস,
উন্মাদ করেছে মোরে বিবাগীর সুরে—
পরাণ ছুটিতে চাহে দূর হতে দূরে।
আজি মনে হয়,
হৃদয়ের সঙ্কীর্ণতা সব হ'বে লয় !
তোমারি উত্তপ্ত কর দিয়াছে পরশ,
মৃত মোর জীবনেরে করেছে সরস ;
জীবনে জোয়ার আসি' ভেঙেছে বন্ধন
যত বাধা-নিষেধের। তোমার নর্ত্তন
হে বৈশাখী, আনিয়াছে বিপুল বারতা
আমার জীবন মাঝে। যত মোর ব্যথা
ধুইয়া মুছিয়া গেছে বারিধারে তব,
নয়নে জাগিছে মোর স্বপ্ন অভিনব।

---

## মুহম্মদ আবুবকর

### লোকপ্রেম

নাই কিছু ভাই, সৃষ্টির মাঝে মানুষের চেয়ে শ্রেয়ঃ,
দেবতা-ঠাকুর পূজে' মর সেই মানুষেরে জেনে হেয় !

মানুষে করিয়া হেলা
খোদারে পূজিলে, পূজা হয় না সে, হয় ছলনার খেলা।
পাপীর পুত্র বলিয়া কাহারে করিতেছ পরিহাস?
হয়ত সে সখা, করিবে উজল জগতের ইতিহাস।
দিদারে এলাহী, স্বর্গ যা বলো, মানবতা তা'র নাম;
নিজেরে চিনিলে চিনা যায় সখা আল্লার মহাধাম॥

—ভোরের আজান

---

# এ জেড্ নূর আহ্মদ

## সনেট

সুনীল আঁখির কোলে ভাসে যেই কথা
আমার হিয়ার বনে পড়ে তা'র ছায়া।
তোমার বুকের কোণে না ফুটিতে ব্যথা
আমার কবিতা ধীরে গড়ে তা'র কায়া।

রক্তিম জবার মতো রাঙা ঠোঁট দু'টি
একটি কথার লাগি' খোল যবে ধীরে,
পরাণ-চাতক মোর পড়ে হায় লুটি'
তোমার রঙিন সেই অধরের তীরে।

তোমাকে হেরিয়া সখি মনে জাগে ভয়;
কোন্ দিন পাখা মেলি' চলি' যাবে উড়ি'।
আমার কল্পনা-কুঞ্জ হ'বে মরুময়—
ঝরি' যাবে কবিতার যত ফুল-কুঁড়ি।

তুমি মোর ছন্দে-গাঁথা একটি কবিতা—
আমার মানস-লোকে সুশুভ্র সবিতা॥

—স্মৃতিদীপ

---

## গোলাম কুদ্দুস্

### করাতি

করাতের দাঁত আছে উদর নেই।
করাতির ছোট উদরেরা
পশ্চাতেই করে চলাফেরা
করাতকে ঘিরে রেখে সমাদরেই।
তারো পিছে বড় উদরেরা
বেঁধেছে কাঠের বহু ডেরা
ভেঙে তাহা পড়ে না ক ভূমিকম্পেই।
সঙ্গীন কামান ট্যাঙ্ক বোমারু বিমান,
তা'র পিছে খণ্ডকারীদের ঐক্যতান,
তারো পিছে স্বপ্ন আর স্বর্গের উদ্যান,—
'কাশীরাম দাস ভণে শোনে পুণ্যবান।'

করাতিরা কাঠ চের করাতে যখন
তখন কি তোমরা বধির,
শোন কি সঙ্গীত কিছু পাতিয়া শ্রবণ
মীড়ে মীড়ে অলস মদির।
লাবণ্য-ক্রন্দন কত এই কাষ্ঠ 'পরে
উঠেছিল পত্রপুষ্পে জ্বলি',
বসন্তের অগ্নিগান কাণ্ডের অন্তরে
এসেছিল বর্ণ হ'য়ে গলি'।
করাতিরা কাঠ চের তোমরা যখন
তখন কি একেবারে অন্ধ,

## গোলাম কুদ্দুস

কাঠে কি দেখিতে পাও মেলিয়া নয়ন
পরতে পরতে আঁকা ছন্দ।
কত বৎসরের কত পদচিহ্ন-রেখা
দেখেছ সোনালী স্তরে স্তরে,
পড়েছ কি ঝড়ঝঞ্ঝা বিদ্যুতের লেখা
আঁকাবাঁকা আঁশের অক্ষরে।
অরণ্য ফুরিয়ে এলো আফ্রিকার সাথে
ধার রাখা চাই তবু করাতের দাঁতে—
বসন্তেরে চিরে' চিরে' নির্বীর্য্য আন্দাজে
ঘরবাঁধা চাই তবু, অরণ্য-সীমাতে
নন্দনবাসীরা সব কিরাতের কাজে
এমনি বর্ব্বর। করাতির পিপাসা যে
জল-ফল-তরুহীন মরুর আঘাতে
ইস্পাত তরল করে সাহারার মাঝে।
'হলা পিয় সহি' নয়, ইস্পাত-পিপাসা
লেখে কণ্ঠে শতাব্দীর কুঞ্চিত ললাট,
মুখে লেখে দন্ত আর নখরের ভাষা—
তবু সামান্যই আছে চিরবার কাঠ,
কানে লেখে সীজারের শব্দের কুয়াশা;
বধিরের কাছে তাই মিছে নান্দিপাঠ।

সহজ কথাটা পিতামহরাই শিখিয়েছেন,
জীবদ্দশায় চাই কিছু জল, কিছু চাই তাজা অক্সিজেন,
আমাদের তাই বায়ু-ভরা আর মেঘ-ধরা কিছু পত্র চাই,
উদ্যান নয়, পল্লব-ঘন অরণ্য ছাড়া উপায় নাই।

করাতের ধার যাদের কিছু না [illegible]
করো তাহাদের অকুণ্ঠমনে জ্যোতির্ময়—
ভূমিকম্পের কবল-এড়ানো মরা কাঠে গড়া আজের ঘর
কেবল একটু আগুনের কণা, কেবল একটু রূপান্তর!
করাতটা ভেঙে কাস্তে বানাও এবার নীড়ের রক্তানলে
দাঁত কি তোমার কাস্তেরো নেই—ফসল হাসে যে দন্ত-তলে।

---

# সৈয়দ আলী আহ্‌সান

## হে অসি বাঁশরী হও

হে অসি, বাঁশরী হও, এ মোর প্রার্থনা।
কেননা অব্যক্ত ভয়ে মূক হ'ল ধরণীর শিশু—
নয়নের নীল রেখা মুছেছে রক্তিম টানে
এসেছে সংশয়,
তাই তুমি বাঁশী হও, আনো সুরে সমুদ্রের ঘ্রাণ।
দুঃসাহক সমুদ্রের উত্তাল মুহূর্ত্তগুলি
মোদের মুহূর্ত্তে দি'ক রক্তিমপ্রলয়;
উচ্ছ্বসিত করো প্রাণ বালুর বন্যায়;
উদ্দাম উল্লাস আনো
আনো আনো সমুদ্রের দোলা—
সাগরের নীল মৃত্যু আসুক জীবনে মোর তীর্য্যক্ রেখায়।
হে অসি, বাঁশরী হও, বাঁশী হও তুমি।
আর যে বাঁশরী ছিল, শ্রীরাধার নয়নেতে আনিত সে ঘুম,
প্রণয়ের অরুণিমা আনিত জীবনে তা'র স্বপনের আকাশ-কুসুম,

তাহার সুরেতে ছিল অসহ উচ্ছ্বাস।
আর তুমি, হে বাঁশরী, মৃত্যুরে জাগায়ে তোলো দুরন্ত খেলায়;
তব সুর-সঞ্জীবনে ফুলকলিদল
মুক্তি লাগি' মেলিবে পল্লব ;
তোমার সুরের টানে চলিবে মানবযাত্রী মৃত্যু-অভিসারে ;
কেননা তুমি তো শুধু বাঁশরীই নও—
তোমার সৃষ্টিতে আছে অসির নির্য্যাস—
তীক্ষ্ণতা এনেছে সুরে বাঁকা তলোয়ার,
ফ্যাকাশে জীবনে এলো রক্তের জোয়ার,
আকাশের মেঘ হ'তে বজ্র তুলি' ল'য়ে
দুঃস্বপ্নের খড়্গ তোলো বক্ষের উপর ;
শাণিত নখর যদি উদ্যত হয় সে আজ হিংস্র আকাঙ্ক্ষায়
লেলিহ বঙ্কিম ফণা ছুঁয়ে' যায় জীবনেরে মৃত্যুর রেখায়,
তখন তোমার সুর তুলিবে না বলয়-নিক্কণ,
আনিবে বিদ্রোহ—
সহজ দিনের ছায়া ম্লান হয়ে যাবে,
দূরের প্রান্তর-পথে ভাসাইয়া দিবে তুমি মৃত্যুর স্বাক্ষর।
তাই তুমি দীপ্ত অসি, বাঁশী হও আজ ;
আনো সুরে প্রলয়ের ঢেউ,
রক্তিম উৎসাহ আনো জীবনের পথে—
বিবর্ণ জীবন যেন কেঁপে' ওঠে প্রলয়-শিখায়।
হে অসি, বাঁশরী হও, এ মোর প্রার্থনা—
হে অসি, বাঁশরী হও, বাঁশী হও তুমি।

———

সমাপ্ত

# শব্দার্থ-প্রকাশ

## অ

অনাদ্য—আদিহীন, মূলহীন, স্বয়ম্ভু।

অফর-বেলা—অপরাহ্ণ।

অরুণ-তনয়া—সূর্য্যের কন্যা গঙ্গা, এখানে যমুনা।

অলখা—অলক্ষ্য।

অবহু—এখনও।

## আ

আউয়াল—আদি, আদ্য, প্রথম।

আওর—আর, এবং।

আওলিয়া—দর্‌বেশ, সন্ন্যাসী, সাধুগণ।

আক্‌বর—মহান্‌, শ্রেষ্ঠ।

আখের—শেষ, পরিণাম।

আগ্‌—আগুন।

আগম—তন্ত্র বা বেদাদি শাস্ত্র, আগমন।

আগাজ—আরম্ভ।

আঘন—অগ্রহায়ণ।

আজব—অদ্ভুত, অলৌকিক।

আজম—বড়; non-Arab country.

আজু—আজ।

আজদাহা—অজগর।

আজ্রাইল—যমরাজ, মালিক-উল্‌-মৌৎ।

আজাদ—মুক্ত।

আজাজিল—শয়তানের নাম।

আজি-তক্‌—আজ পর্য্যন্ত।

আঞ্জাম—আয়োজন।

আতশ—অগ্নি।

আতশী—আগ্নেয়, অগ্নিময়।

আদম-সোয়ারী—অশ্বারোহী।

আদ্য—আদিম, আদিভূত, প্রথম।

আনা-যানা—আসা-যাওয়া।

আঁপ—আপন, স্বয়ং, Self.

আফতাব—সূর্য্য।

আব—জল।

আবজোশ—উষ্ণ জল, পলান্ন রাঁধিবার প্রক্রিয়া বিঃ।

আব-জম্‌জম্‌—জমজম কূপের জল।

আবদুল্লা—হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতা।

আব্বাস্‌—হজরতের পিতৃব্য।

আমিনা—হজরত মোহাম্মদের (দঃ) জননী।

আরশ—আল্লার আসন।

আরজুল্লাহ্‌—আল্লার জমিন।

আরাস্তা—সুসজ্জিত।

আলম্‌—ব্রহ্মাণ্ড।

আলমপানা—বিশ্বত্রাতা।

আল্লাহ-আক্‌বর—আল্লাহ্ মহান ; God is Great.

আলেক্—খোদ্. স্বয়ং, self.

আশক—প্রেমিক, প্রণয়ী।

আষা—দণ্ড। হজরত মুসার হাতের লাঠি।

আসান—ত্রাণ, উদ্ধার, সহজ।

আসগর—ক্ষুদ্র; এমাম হোসেনের পুত্র।

আস্তর—আবরণ, প্রলেপ।

আসবাব—সাজ-সরঞ্জাম, Furnitures.

আস্‌মান—আকাশ।

আড়ি—১৮ সেরে এক আড়ি।

## ই

ইন্‌সান—মানুষ।

ইবলিস—শয়তান, অপদেবতা।

ইমান্—ধর্ম্মবিশ্বাস, Faith.

ইমাম্—এমাম—নায়ক ; ধর্ম্ম-নৈতিক নেতা।

ইয়ার—বন্ধু, সুহৃদ্।

ইয়াস্‌মিন—জুঁইফুল ; Jasmin.

ইস্‌রাফিল—প্রলয়-বিষাণ মুখে এক ফেরেস্তা।

## ঈ

ঈদ্—আনন্দ। ঈতুলফেত্‌র ও ঈতুজ্জোহা পর্ব্বদ্বয়।

ঈদ্‌গাহ—ঈদের নামাজ পড়িবার স্থান।

ঈশা—যীশুখ্রীষ্ট।

## উ

উনা—কম।

উনাইয়া—গলিয়া, দ্রবীভূত হইয়া।

উম্মিয়া-বংশ—Ommayad dynasty.

উল্‌ঝুল—এলোমেলো।

উস্তাদ—গুরু, শিক্ষক।

## এ

এজিদ—হজরত মোয়াবিয়ার পুত্র।

এফতার—রোজা (উপবাস) ভঙ্গ। Breaking a fast.

এয়্—ওগো।

এয়ছা-এয়ছাই—এরূপ।

এরাক-ইরাক—মেসোপটোমিয়া প্রদেশ।

এরাদা—অভিলাষ।

এলাহি—একমেবাদ্বিতীয়ম্, আল্লাহ্।

এলেম—বিদ্যা।

এস্‌মে-আজম—বড় নাম ; ঈশ্বর-প্রাপ্তির মন্ত্র।

এহি—এই।

## ও

ওক্ত—সময়।

ওজুদ—বপু, শরীর।

ওয্‌যা-হোবল—আরবের মূর্ত্তি-

পূজারীদের দুই প্রধান ঠাকুর।
ওয়াদা—প্রতিশ্রুতি।
ওয়ারেসিন—উত্তরাধিকারিগণ।
ওয়াকিফ্—অবগত, অভিজ্ঞ।
ওয়ে—ওগো।

## ক

কাইজা—ঝগড়া, বিবাদ।
কাচনি—কচ্ছ, কাছা।
কেচ্ছা—কাহিনী, উপকথা।
কতল্—হত্যা।
কুদরত্—অলৌকিক কার্য্য।
কান্দিল্—দীপাধার, প্রদীপ।
কাফন—মৃত ব্যক্তির দাফনের কাপড়।
কাফের—বিধর্ম্মী।
কুফরান্—বিধর্ম্মীগণ।
কুফা—সিরিয়া প্রদেশস্থ একটি শহর।
কবর-খানা—সমাধিস্থান।
কা'বা শরিফ—মক্কা-স্থিত পবিত্র মস্‌জিদ; খোদার ঘর।
কমি—অপূর্ণ, অল্পতা।
কমিনা—নীচাশয়।
করতার—করুণেওয়ালা, ঈশ্বর।
কারবালা—ইরাকের বিখ্যাত মরুভূমির প্রান্তর।
কারাভাঁ—কাফেলা; Caravan.
কুর্‌সি—কেদারা; আল্লার আসন।
কোরে—ক্রোড়ে, কোলে।
কালাম—বাণী, আল্লাহর পবিত্র বাক্য।
কুল্-মুল্লকে—সমগ্র রাজ্যে।
কেল্লা—দুর্গ।
কৈলুঁ—করিলুম, করিলাম।
কয়েদ—বন্দী।
কায়েম—বহাল, প্রতিষ্ঠিত।
কেয়ামত—মহাপ্রলয়।
কাসেম—এমাম হাসনের পুত্র।
কিস্তী—নৌকা।
ক্রুসেড্—ধর্ম্মযুদ্ধ, Crusade.
কাহার্‌বা—তালের নাম।

## খ

খাক্—মাটী।
খঞ্জর—অস্ত্র বিশেষ।
খত্—লিপি।
খাতের—আপ্যায়ন; অনুগ্রহ।
খোদা—স্বয়ম্ভু, ঈশ্বর।
খন্দক—গহ্বর, গিরিগুহা।
খানা-পিনা—পানাহার।
খান্‌দান—বংশ।
খুন্-জোশীতে—রক্ত-উত্তেজনায়।
খুনী—হত্যাকারী।
খুবসুরাত—সুশ্রী, সুরূপা।
খারেজিন—আরবের এক সম্প্রদায় বিশেষ।
খালেদ—হজরত ওমরের খেলাফত-সময়ের সৈন্যাধ্যক্ষ।

খোশবাগ—আনন্দ-উদ্যান।
নবাব সিরাজদ্দৌলার সমাধি স্থান।

খোশ-বু—সুগন্ধ।

খোশহাল—উত্তম অবস্থা, আনন্দিত।

খসম—ভর্ত্তা, স্বামী।

খাড়াক্-খাড়া—তাড়াতাড়ি।

## গ

গওর—মনোনিবেশ।

গওহর—মতি।

গোঙার—গোঁয়ার, বর্ব্বর।

গজব—অভিশাপ।

গাজী—ধর্ম্মযোদ্ধা।

গানা—গান।

গাব-গায়নি—গাব-ফলের রসের প্রলেপ।

গমি—দুঃখ।

গেরেফ্তার—বন্দী।

গুর্জ্জ, গোর্জ্জ, গুরুজ—অস্ত্র বিশেষ।

গর্দ্দান—ঘাড়, স্কন্ধ।

গের্দা, গির্দা—তাকিয়া; ঠেস-বালিস; বেষ্টনী।

গর্ম্মি—রৌদ্রতাপ, গ্রীষ্ম-ঋতু।

গালেব—বিজয়ী

গুল্জার—মাত্।

গুলশান—পুষ্পবাটিকা।

গুলরুখ—পুষ্পাবদন।

গুলে-বকাওলি—বকাওলি পরীর পুষ্প।

গোলফাম—গোলাবী রঙীন।

গোলাব-পাশ—গোলাব জল ছিটাইবার পাত্র বিশেষ।

গোলামী—দাসত্ব।

গোস্বা—ক্রোধ।

## ঘ

ঘোমট—ঘোমটা—অবগুণ্ঠন।

ঘিরিল—পতিত হইল।

## চ

চিজ—বস্তু; উপাদান।

চন্দ—চান্দ; চন্দ্র।

চোপদার—অগ্রবাদক।

চিল্লায়—চীৎকার করে।

## ছ

ছাতি—বক্ষদেশ; ছিনা।

ছিফর—ঢাল. Shield.

ছুরত-সুরত—সৌন্দর্য্য, মুখশ্রী।

## জ

জীউ—জীবন, বাঁচিয়া থাক।

জওয়াহের—মণিমুক্তা।

জাকাত—ধর্ম্মীয় কর বিঃ।

জেকের—উল্লেখ; স্মরণ।

জাঙ্গি—পাল বাঁধিবার বড় রশি।

জিঞ্জির—শৃঙ্খল।

জাদ—সুবর্ণ-খচিত ফিতা।

জান্‌—জীবন, প্রাণ।
জিনা—জীবিত।
জিন্দা পীর—জাগ্রত গুরু।
জিন্দান—কারাগার।
জীন্‌-জিন্‌—অগ্নিজাত দৈত্য; Genii.
জবাব—উত্তর।
জবানি—কথা, আলাপ।
জিব্রাইল—স্বর্গীয় বার্ত্তাবহ। এক ফেরেশ্‌তা।
জমরেদ—জমুরদ—মুক্তা।
জমায়েৎ—সমাবেশ।
জাম—পেয়ালা।
জার-জার—জর্জ্জরিত; অস্থির।
জারী-গান—কারবালা-বিষয়ক শোক-গীতি। মর্সিয়া।
জের—দুর্ব্বল, নত।
জেরা—বর্ম্ম।
জালা—ধানের চারাগাছ।
জিল্‌কি—বিদ্যুৎচ্ছটা।
জালিম—অত্যাচারী।
জুলুম—অত্যাচার।
জুল্‌ফিকার—হজরত আলীর তরবার।
জাহের—প্রকাশ।
জেহাদ্‌—ধর্ম্মযুদ্ধ।

ঝ

ঝাণ্ডা—নিশান; ধ্বজা।
ঝাপা—ঝাঁপা; পূর্ব্ববঙ্গে ঝাপরা; স্তবক।
ঝুঁট-সাঁচ—সত্য-মিথ্যা।

ড

ডুম্ব—ডুব।

ত

তক্‌দীর—ভাগ্য।
তঙ্গ্‌—সঙ্কীর্ণ; অসচ্ছল।
তাজ—মুকুট; তাজ-মহল; মমতাজ মহল।
তাজা—তরুণ; টাট্‌কা।
তাজি—দ্রুতগামী অশ্ব; আরবীয় অশ্ব।
তাঞ্জাম—সওয়ারী।
তন্‌—তনু; দেহ।
তাপাই—তাপ গ্রহণ করি।
তাবেঈন—আজ্ঞাবহ, তাঁবেদার।
তামাম—শেষ; সমস্ত।
তারিফ—প্রশংসা।
তেগ—তলোয়ার।
তুর—সিনাই পর্ব্বত শ্রেণীর একটি পর্ব্বত।
তুরমান—শীঘ্রগতি।
তালাক-নামা—বিবাহ-বিচ্ছেদের দলীল।
তোলবা-খানা—ছাত্রাবাস।
তস্‌লিম—প্রণাম। মানিয়া লওয়া।

তস্বীর—ছবি।

তুয়া—তব; তোমার।

তৌহিদ—একেশ্বরবাদ।

তাঁবেদার—আজ্ঞাবহ; অধীন; অনুগত।

থ

থানা—অবস্থান,

থোড়া—অল্প।

দ

দোওয়া—শুভাশীষ।

দেও—দেব, দৈত্য,

দোজখ—নরক; জাহান্নাম।

দিদার—মোলাকাত্; সাক্ষাৎকার।

দিদারে-এলাহি—ঈশ্বর-দর্শন।

দীন্-দ্বীন্——সত্যধর্ম্ম।

দীন্-ই-ইস্লামী—ইস্লাম ধর্ম্মীয়।

দীনেওয়ারা—বিত্ত।

দাম—একপ্রকার জলজ ঘাস।

দামাম—দামামা।

দামাল—ঘুটে; পচা খোর্ম্মা। এখানে অশান্ত।

দামেস্ক—আরবের বিখ্যাত শহর।

দরদী—হৃদয়বান; সমব্যথী; দীলদার।

দরিয়া—সাগর।

দারাজ-দস্ত—উদার হস্ত।

দীল্, দেল্—হৃদয়; অন্তর।

দিল্-কোঠা—হৃদয়-কক্ষ; অন্তর্দ্দেশ।

দলীল—প্রামাণ্য কাগজপত্র।

দুলিচা—দোদুল্যমান পর্দ্দা।

দুষ্মন—শত্রু; অরাতি।

দোস্ত—বন্ধু।

দোস্তি—বন্ধুত্ব।

ধ

ধাত্রি—ধাত্রী, দাসী।

ধবলী—শ্বেতবর্ণা গাভীর নাম।

ন

নৌ-জোয়ান—নব-যুবক, নব্য-তরুণ।

না-উম্মেদ—নিরাশ।

নকীব—অগ্রে সংবাদদাতা।

নিকশিল—বাহির হইল।

নিগম—তন্ত্র-শাস্ত্রবিশেষ; নির্গমন।

নিগূম—নিগূঢ়; গুহ্য।

নেখাবানি—দেখাশোনা করা।

নজর—দৃষ্টি; লক্ষ্য।

নাজুক—পেলব; কোমল।

নেজ্দ্—নাজ্দ্—সন্নিকট; আরবের একটি প্রদেশ।

নিদান—কষ্ট, সঙ্কট।

নিঁদ—নিদ্রা।

না-ফরমান—অবাধ্য।

নবরঙ্গ, নারাঙ্গী—কমলালেবু।

নমরুদ—ইরাকের জনৈক ঈশ্বর-দ্রোহী বাদ্‌শাহ্‌।

নর্ক—নরক।

নিরঞ্জন—নিষ্কলঙ্ক; নির্ম্মল; পরমাত্মা।

নারাঙ্গী—কমলালেবু।

নার্গিস—এক প্রকার ফুল, উহার আকৃতি আঁখির মতো।

নার্গিস-লালা—লাল ফুল বিশেষ।

নূর—আলোক; জ্যোতিঃ।

নিশানি—চিহ্ন।

নসীব—ভাগ্য; তক্‌দীর।

## প

পাক—পবিত্র।

পিকদান—থুতু ফেলিবার পাত্র।

পেঁকিয়া—পঙ্কময় করিয়া।

পাচনি—পাচনবাড়ি; গোরু তাড়াইবার লাঠি।

পুছি—জিজ্ঞাসা করি।

পাটন্ব—কৌশেয়; পাটের শাড়ি।

পান-দান—তাম্বুল-করঙ্ক, পানের বাটা।

পানি—জল; পানীয়।

পরখ—পরীক্ষা।

পরওয়ান—সত্য; ন্যায়; পরোয়ানা।

পরওয়ার—পালক, ঈশ্বর।

পরী—অপ্সরী, **Fairy.**

পরিপাট—পারিপাট্য; নৈপুণ্য; ছলনা।

পূরক—প্রাণায়ামের অঙ্গ (বায়ু গ্রহণ); গুণক।

পেয়া-বন—গুল্ম-বন।

পেরেশান—চিন্তিত, ক্লান্ত।

পর্দ্দানশীনা—অবরোধবাসিনী।

পশর—আলোকিত, প্রকাশ।

পয়গাম—সংবাদ, বাণী; প্রত্যাদেশ।

পয়গম্বর—ভাববাদী, আল্লাহ্‌র তত্ত্ববাহক।

পয়দা—সৃষ্টি; জন্ম।

পয়দায়েশ—জন্ম।

## ফ

ফেকের—চিন্তা, ভাবনা।

ফতে—জয়।

ফানা—নির্ব্বাণ।

ফরজ—অবশ্যকর্ত্তব্য।

ফরজন্দ—সন্তান।

ফরমান্‌—আদেশ; হুকুমনামা।

ফরমায়েছেন—আদেশ দিয়াছেন, বলিয়াছেন।

ফরহাদ- জনৈক ভাস্কর, শিঁরীর প্রণয়ী।

ফরিয়াদ—অভিযোগ।

ফারাগত্‌—প্রশস্ত; অবকাশ।

ফের—পুনরায়।

ফেরদৌস্—বেহেস্ত ; জান্নাত ; স্বর্গ।

ফেরেশতা—স্বর্গদূত।

ফেরাউন্—মিশরের ঈশ্বরদ্রোহী রাজা ; Pharaoh.

ফোরাত—তাইগ্রীস নদী।

ভ

ভানুশ্বর—ভানুর উদয়-স্থান।

ভিঙ্গা—ভিজা, সরসা।

ভেল—হইল।

ভেখ—বেশ ; ভিক্ষুক-বেশ ; বহুরূপ ; ছদ্মরূপ।

ভেড়ো—স্ত্রৈণ। যে ব্যক্তি স্ত্রী-লোকের রোজগারে জীবিকা নির্ব্বাহ করে।

ম

মওত্—মৃত্যু।

মওলা-জি—আল্লাজি।

মকান—গৃহ।

মোকাম—স্থান ; আড্ডা ; গৃহ।

মোকরর—নির্দ্দিষ্ট।

মিকাইল—এক ফেরেশ্তা।

মেথ—স্তম্ভ ; খুঁটী।

মজলিস—সভা।

মজনুঁ—উন্মাদ। লায়লীর প্রণয়ী।

মজলুম—অত্যাচারিত।

মুঝ্দা—সুসংবাদ।

মুঝে—আমাকে।

মুঞি—আমি।

মঞ্জিল—বিশ্রামস্থান।

মাতম্—শোকধ্বনি।

মোতালেব—হজরত মোহাম্মদের (দঃ) পিতামহ।

মোতিম-হারা—মোতিহার ; মুক্তামালা।

মাথাল—প্রান্ত, সীমা।

মদদ্—সাহায্য।

মদন-অসিক—মদনের অসিকে।

মাদী—স্ত্রী।

মনুরা—মন, আত্মা।

ম'ফিল, মহ্ফিল—সভা।

মাফিক—মোতাবেক্, অনুরূপ, মতন।

মমিন, মোমিন, মোমেন—ধার্ম্মিক, ধর্ম্মবিশ্বাসী।

মারওয়ান—এজিদের মন্ত্রী।

মারফত্—গুহ্য ধর্ম্ম, অধ্যাত্ম-বিদ্যা, মর্ম্মবাদ।

মারফতী—আধ্যাত্মিক ; গুহ্য বিষয়।

মার্হাবা—সাবাস্।

মৃতি—মৃত্যু।

মর্দ্দ, মর্দ্দানা—পুরুষ, বীরপুরুষ।

মুর্শীদ—পথপ্রদর্শক ; আধ্যাত্মিক গুরু।

মালিক-উল্-মওত্—যমরাজ ; আজ্রাইল্।

মুলুক—রাজ্য, ভূখণ্ড।

মৌলুদ—হজরতের জন্মবার্ষিকী।

মালামের—পদচিহ্নযুক্ত।

মস্তান—উন্মাদ, উদাসীন।

মুস্কিল—বিপদ্, কঠিন।

মৌসুমী—ঋতু : seasonal।

মহবুব—প্রিয়।

মোহর—শীল্‌মোহর, Seal.

মাহতাব—চন্দ্র

মুয়াজ্জিন—যে ব্যক্তি আজান দেয়।

## য

যতি, যতী—সন্ন্যাসী, মুনি।

## র

রোজ—দিন, প্রত্যহ।

রোজা—উপবাস, Fasting.

রুমী—রোমক ; Romans.

রব্বানা—ঈশ্বর, আল্লাহ্।

রব্বানি—ঐশ্বরিক, Godlike.

রসুল—প্রেরিত পুরুষ।

রসুলুল্লাহ্—আল্লাহ্‌র প্রেরিত পুরুষ ; হজরত মোহাম্মদ (দঃ)

রুহ—আত্মা।

রাহ—রাস্তা।

রহমত—করুণা, আশীর্ব্বাদ।

রোয়ে—কাঁদে।

## ল

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্—একমেবাদ্বিতীয়ম্।

লওহ্—কাষ্ঠফলক। Board.

ল্যাচার—অসহায়।

লৈংথৈং—কাজের ঝামেলা।

লাত্ মানাৎ—আরবা মূর্ত্তিপূজকদের ঠাকুরদের নাম।

লা-মকান—গৃহহীন।

লালা-রায়হান—ফুলের নাম।
রায়হান—সুগন্ধি গুল্ম বিঃ।

লালী—অরুণিমা।

লাশ—মৃতদেহ, শব।

লস্কর—সৈন্যবাহিনী।

লস্কর-নায়ক—সৈন্যাধ্যক্ষ।

লোহু—রুধির।

লক্ষ্মী মাস—লক্ষ্মীপূজার মাস।

লায়লা—রাত্রি। মজনুঁর প্রণয়িনী।

## ব

বাউরী, বাউলী—উদাস, চঞ্চল।

বাও—বায়ু, বাতাস।

বেটাবেটি পুত্র-কন্যা।

বে-করার্—অস্থির।

বে-খবর—অচেতন ; অজ্ঞাত।

বে-খেয়াল—অমনোযোগী, অসতর্ক।

বে-দরদ—নির্ম্মম, সহানুভূতিহীন।

বে-পরোয়া—ভ্রূক্ষেপহীন ; দুর্দ্দম।

বে-নিয়াজ—অসাবধান, প্রয়োজনহীন।

বেহুঁশ—অচৈতন্য, অজ্ঞান।
বে-শুমার—অসংখ্য, অগণন।
বেমান—বিশাল, Vast.
বিচে—মধ্যে।
বাজু—বাহু, ভুজ।
বাত—কথা; বাতাস।
বাতাইয়া—বুঝাইয়া, বিবৃত করিয়া।
বাতিন—গোপন, গুহ্য।
বেতাব—অস্থির।
বিদশা—দুর্দ্দশা।
বিধুন্তুদ—রাহু।
বণিজার—বণিক; প্রবাসী; প্রণয়ী।
বান্দা—গোলাম, দাস।
বরাবরি—সমীপে, বরাবরে।
বরখেলাফ—অমান্য, লঙ্ঘন।
বারিতা'লা—ঈশ্বর, আল্লাহ্।
বিরাণ—উষর।
বুরাই—মন্দ।
বেরি বেরি—বার বার।
বোর্‌রাক্—উচ্চৈঃশ্রবার মতো স্বর্গের শ্রেষ্ঠ অশ্ব।
বোর্‌হান—প্রমাণ।
বালাখানা—প্রাসাদ; হর্ম্ম্য।
বহাল—কায়েম; প্রতিষ্ঠিত।
বাহার—বসন্ত, সৌন্দর্য্য-সম্ভার; কবিতা; সমুদ্র।
বিহান—প্রত্যূষ।
বিহনে—বিহনে; বিনে।
বেহেস্ত—স্বর্গ, জান্নাত।
বিসমিল্লাহ্—আল্লাহর নামে আরম্ভ।
বোস্তান—ফুলবাগিচা।
বয়ান—বদন, বর্ণনা।
বয়তুল্লাহ—কা'বা বা আল্লাহ্‌র ঘর।
বয়তুল-মকাদ্দস—পবিত্র গৃহ। জেরুজালেম্।
বিয়া—বিবাহ, শাদী।

## শ

শাঙলী—শ্যামলী, গাভীর নাম।
শাদ্দাদ—বাগ্‌দাদের জনৈক ঈশ্বরদ্রোহী বাদ্‌শাহ্।
শাম—সিরিয়া প্রদেশ।
শামসোজ্জোহা-বদরুদ্দোজা-কমরোজ্জমা—হজরতের উপাধি-ভূষণ।
শরওয়ান্—পারস্যের দানশীল বাদশাহ নওশেরওয়াঁ।
শরাব—মদ্য।
শরিয়ত—ইস্‌লামিক ধর্ম্মবিধান।
শিরাজী—শিরাজের মদ্য।
শিরীণ, শিরীঁ—মধুর; ইরাণী কাব্যের এক নায়িকার নাম।

শের—বাঘ।
শোর-আওয়াজ—বিরাট ধ্বনি।
শহীদ—ধর্ম্মযুদ্ধে হত।
শাহ্জাদা—রাজপুত্র।

## স

সাঁই—সাঞি, স্বামী।
সওয়ারী—অশ্বারোহী।
সাকী—পানপাত্রবাহী।
সখিনা—এমাম হোসেনের কন্যা, কাসেমের স্ত্রী।
সাখি-সাক্ষি—সাক্ষ্য।
সাচ্চা—সত্য।
সঞে—সনে, সঙ্গে।
সেতারা—তারা, নক্ষত্র।
সেতাবী—জল্‌দি, শীঘ্র।
সিদ্ধিরস্তু—( সিদ্ধি + অস্তু ) জয় হউক।
সিনা, ছিনা—ছাতি, বক্ষঃদেশ।
সুন্নত্—হজরতের বিধান; লিঙ্গত্বকচ্ছেদ। Circumcision
সিপাহী—সৈনিক।
সপ্তবিংশ নবশত—৯২৭ হিজরী সন।
সফর—ভ্রমণ, Journey.
সব্জা—সবুজ্, হরিৎ।
সাবেঈন্—আরবের গ্রহ পূজকগণ।
সোবহান—পবিত্র; ঈশ্বর।
সমস্বর—সমান।
সামান, শামান্—সাজ-সরঞ্জাম।
সরওয়ারে কায়েনাত্—সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ।
সর্দ্দার—নেতা; সেনানায়ক।
সা'রা—হজরত্ ইব্রাহিমের স্ত্রী, ইস্‌হাকের জননী।
সুরথ—রক্তবর্ণ, লাল।
সুর্‌খী—লালিমা।
সুরাখ—ঝাঁঝরা।
সুরেশ্বরী-ধার—গঙ্গাধারা।
সুরত, ছুরত—চেহারা; আকৃতি; রূপ।
সালাম—শান্তি।
সালামত—নিরাপদ।
সাল্লাল্লাহু আলায়হি সাল্লাম—তাঁহার উপর আল্লাহর শান্তি ও করুণা বর্ষিত হউক।
সোলেমান—King Solomon.
সুষুম্না—শাস্ত্রোক্ত নাড়ী; অনেকের মতে Spinal chord.
সয়া, সইয়া, সাঁইয়া—সখা।
সয়াল—সমস্ত; সকল।
সেয়ানা—বয়স্ক; চতুর।
সোয়ার—আরোহী।

## হ

হইলুঁ—হইলুম, হইলাম।
হাওয়া—বাতাস।

হাঁক—আহ্বান, call.

হাজেরা—হজরত্ ইব্রাহিমের স্ত্রী; ইস্‌মাইলের জননী।

হিন্দ্—কালো। এখানে হিন্দুস্থানবাসী।

হবিব—বন্ধু।

হাফেজ—যে কোরান কণ্ঠস্থ করে।

হাম্‌জা—হজরত্ মোহাম্মদের পিতৃব্য।

হাম্‌লা—আক্রমণ; অভিযান।

হাম্মাম—স্নানাগার।

হামেশা—সর্ব্বদা।

হর, হরেক—প্রতি, প্রত্যেক।

হর্‌ওক্ত—সব সময়।

হর্‌দম—প্রতিক্ষণ।

হর্‌রা—হর্ষধ্বনি।

হারাম—অসিদ্ধ।

হারুন-অল্-রশাদ্—বাগদাদের ইতিহাস-প্রসিদ্ধ খলিফা।

হেরা—আরবের এক পর্ব্বত। ঐ পর্ব্বতের গুহায় হজরত্ মোহাম্মদ (দঃ) সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন।

হুর—অপ্সরা; কিন্নর-কিন্নরী।

হাল—অবস্থা

হালাক্—ধ্বংস।

হিস্সা—ভাগ, অংশ।

হয়রাণ—পেরেশান; শ্রান্ত।

হায়াত—আয়ু।

---

—আবদুল কাদির